জুল ভের্ণ রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড



অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ অদ্রীশ বর্ধন

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক :

ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

অজিত কুমার সামই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

দাম : ষোল টাকা

॥ জুল ভের্ন ॥

জন্ম নানতেস-য়ে, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সয়ে ; ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।

আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীকারের সবচাইতে চাঞ্চল্যকর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ··· বিজ্ঞান-সুবাসিত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী·· ফ্যানটাসটিক অ্যাডভেঞ্চার,···কল্পনারঙীন ভবিষ্যদর্শন···প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় বহুলক্ষ কপি বিক্রীত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, এমন কি পৃথিবীর বাইরেও দুঃসাহসিক অভিযানের বিস্ময়কর শ্বাসরোধী কাহিনী। পরিবারের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার মত, বারবার পড়ার মত অনুপম রচনা সংগ্রহ।

বিষয় সূচী

পৃথিবীটা ডুবে গেল !

[জুল ভের্ণের শেষ গল্প নাকি এইটাই। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। চোখে ছানি। নিজে লিখতে পারেন নি। মুখে বলে গিয়েছিলেন, অন্যে লিখে নিয়েছিল।

রোমাঞ্চকর এই কাহিনীতে পৃথিবীর ডুবে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছে ভের্ণ। ভীষণ জল-প্লাবনে ভেসে গেল স্থল ভাগ। কলিযুগ যেন ফুরিয়ে গেল। ঠিক যেভাবে আটলান্টিস তলিয়ে গিয়েছে, সেইভাবেই ফের সব কটা মহাদেশকে ভাসিয়ে দিল জলের দেবতা।

কিন্তু সেই কি শেষ ? আবার এল আদম, এল ইভ। সৃষ্টি হল নতুন মানব, নতুন মানবী।

আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক হয়েও ভের্ণ কিন্তু এই অকস্মাৎ মহাপ্লাবনের কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। অথচ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একটা ছিল। যেমন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ !

বৃটিশরা কিন্তু খুব খুশী এই গল্প পড়ে। প্রায় সব গল্পেই তাদের মুণ্ডপাত করেছেন ভের্ণ—এই গল্পে ছাড়া।]

দু' হাত পেছনে দিয়ে একা-একা পায়চারী করছেন জারটগ। মাথার মধ্যে চিন্তার তুফান। চিন্তা মানুষ-জাতটার অতীত নিয়ে।

ধাঁধায় পড়েছেন জারটগ। ভদ্রলোক মহা বিদ্বান। পৃথিবীর ইতিহাসটা গুলে খেয়েছেন। অনেক কিছুই জানেন। তবুও অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না।

তিনি যে সময়ের মানুষ, তার ইতিহাসটা তিনি জানেন। আট হাজার বছরের ইতিহাস। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের নিজেদের মধ্যে মারপিটের ইতিহাস। অল্প জায়গায় বেশী মানুষের গাদাগাদি হলে যা হয় আরকি।

এ যুগের হিসেবে বার্লিন থেকে কেপহর্ণ পর্যন্ত সামান্য এক চিলতে জায়গা নিয়ে গত আট হাজার বছর ধরে কম লড়াই হয়নি। ডাঙা বলতে তো ঐটুকুই। আর নেই। বাকীটা শুধু জল আর জল। সমুদ্র জুড়ে রয়েছে গোটা পৃথিবীকে।

তাই আট হাজার বছরের ইতিহাসে কেবল রক্ত ঝরার অজস্র কাহিনী। জারটগ যে সাম্রাজ্যের নাগরিক, তার একশ পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল অবশ্য এই সেদিন। সাম্রাজ্যের নামটিও বড় অদ্ভুত। 'চার সমুদ্রের দেশ'। মানে, এদেশের চারদিকেই সমুদ্র। ডাঙা আর কোথাও নেই।

আট হাজার বছর ধরে এইটুকু দেশে মানুষ-জাতটা লড়ে এসেছে এক-নাগাড়ে। প্রথমে দুজনে হাতাহাতি, তারপর দশজনে, পরিবারে পরিবারে, দেশে দেশে।

লড়াইয়ের এই ইতিহাসটাকে মোট চারভাগে ভাগ করা যায়। মোটামুটি তিনটে জাত মাথা চাড়া দিয়েছিল শেষের দিকে। তারপর একটা জাত প্রবল হল। বাকী দুটো জাতকে হারিয়ে দিলে।

সে আজ প্রায় দুশ বছর আগেকার কথা। রক্তে ভেসে গেছে ছোট্ট ভূখণ্ড। স্থাপিত হয়েছে জারটগদের একছত্র সাম্রাজ্য—'চার সমুদ্রের দেশ'।

জারটগ ভাবছেন কি ভাবে এই আট হাজার বছরে মানুষ-জাতটা কিভাবে এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে। প্রথমে লিখতে শিখল। তারপর প্রায় শ' পাঁচেক বছর আগে একরকম ছাঁচ তৈরী করে একই লেখার অনেক কপি করার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। এক চিন্তাকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শিখল মানুষ।

তারপর একে একে এল কয়লা, স্টীম, মেশিন।

বিদ্যুতের আবিষ্কার হল মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। আকাশের বজ্রকে হাতের গোলাম বানিয়ে ছাড়ল মানুষ—জারটগের বাপঠাকুর্দা।

কিন্তু মূল প্রশ্নের তো এখনো সমাধান হয়নি। মানুষই এই দুনিয়ার মালিক। কিন্তু কে এই মানুষ? কোত্থেকে আসে? যায় কোথায়?

ভূতত্ত্ব বিদ্যা দিয়ে কিছুটা উত্তর অবশ্য পাওয়া গিয়েছে। ভূত্বক পরীক্ষা করে জানা গেছে, পৃথিবীটার বয়স চারশ হাজার বছর। চার সমুদ্রের এই দেশ, মহাদেশ বললেও চলে, প্রথমে ছিল জলের তলায়। মাটির ধরন দেখেই বোঝা গেছে, সমুদ্রের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে "চার সমুদ্রের দেশ।" কিন্তু কিভাবে? কোন শক্তি অথই জলের তলা থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে এতবড় দেশকে? পাহাড়ের গায়ে সামুদ্রিক পলিমাটির পুরু স্তর পরীক্ষা করে জানা গেছে এমনি আরো অনেক অদ্ভুত তত্ত্ব।

যেমন, মানুষ, পশু, পাদপ—সব কিছুরই উৎপত্তি সমুদ্র থেকে। জল থেকে ডাঙায় উঠেই সামুদ্রিক গাছপালা ক্রমে ক্রমে মানিয়ে নিয়েছে ডাঙার মাটির সঙ্গে। নিজেরা বেঁচেছে, অন্যান্য প্রাণীকেও বাঁচতে দিয়েছে। কিন্তু কিছু

কিছু প্রাণী আর পাদপকে কোন মতেই সামুদ্রিক প্রাণী বা পাদপের সমগোত্রীয় বলা চলে না। এরা যেন সৃষ্টি ছাড়া—সমুদ্রের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

জারটগ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এই সমস্যা নিয়ে। এরা তাহলে এল কোত্থেকে?

আরও একটা খটমট প্রশ্ন খচখচ করছে মাথার মধ্যে। সে প্রশ্ন এই মানুষেরই পূর্ব-পুরুষকে নিয়ে। ভূতত্ত্ববিদরা বলেছেন, পৃথিবীর সব ডাঙাই নাকি এককালে জলের তলায় ছিল। জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। কিন্তু অদ্ভুত ঐ মাথার খুলিগুলো তাহলে এল কোত্থেকে? তারাও কি জলের তলায় ছিল?

মাটি খুঁড়তে গিয়ে খুলিগুলো দেখেছেন জারটগ। মানুষের খুলি সন্দেহ নেই। কিন্তু বিভিন্ন সাইজের খুলি। হাজার দু-তিন বছরের পুরোনো খুলিগুলো আকারে ছোট—ধড়ের কংকালটা সে তুলনায় বেশ বড়। কিন্তু আরও অতীতে গেলে খুলির সাইজ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠেছে। মানে, মস্তিষ্কের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়েছে। তার মানে, অতীতের মানুষ কি আজকের মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল?

না, কোনো সন্দেই-ই নেই। পুরাকালের মানুষরা সত্যিই অনেক বেশী ধীমান ছিল। জারটগরা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। বালখিল্য বললেই চলে।

ভাবী আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাহলে তো বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। পুরোনো খুলিগুলোর বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে সেগুলো পঞ্চাশ হাজার থেকে বিশ হাজারের বছর আগেকার। সেই সময়ে মানুষ কতখানি সভ্য হয়েছিল, সে ইতিহাস তো কোথাও নেই!

বিশ হাজার বছরের কথা ধরলেও মাথা ঘুরে যায়। বিশ হাজার বছর আগেকার মানুষ জ্ঞানে-গুণে জারটগদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল, একথা শুনলেও যে লোকে হাসবে।

কিন্তু কোথায় গেল সেই সভ্যতা! চল্লিশ হাজার বছর আগে যারা পৃথিবী জুড়ে দাপিয়েছে, কোথায় গেল তাদের দাপাদাপির চিহ্ন? কোথায় সেই ইমারত, কলকব্জা, উন্নত সভ্যতার নিদর্শন? নিশ্চিহ্ন হয়েছে কী? সেই কারণেই কি জারটগের পূর্বপুরুষরা নতুন করে লিখতে শিখেছে, বাষ্প চালিত মেশিন আবিষ্কার করেছে, বিদ্যুৎকে কারখানায় বানিয়েছে? সভ্যতার শুরু হয়েছে নতুন করে এই সেদিন থেকে?

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! বরং অলৌকিক শক্তিতত্ত্বকে বিশ্বাস করা যায় আরও সহজে। প্রচণ্ড একটা শক্তি, যে শক্তির দাস এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আট হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেছিল প্রথম মানব 'হেডম'* আর প্রথম মানবী 'হিভা'কে*। তাদের বংশধররাই আজ এই পৃথিবীর বাসিন্দা।

কিন্তু, হেডম আর হিভা শব্দ দুটো এল কোত্থেকে? জারটগদের ভাষায় তো এ শব্দ নেই?

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এমনি কত বিস্ময়ই না ধরা পড়েছে। সামুদ্রিক মাটির স্তরে স্তরে সঞ্চিত যুগযুগান্তরের বিস্ময় মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছে জারটগদের। এক এক যুগে এক-একরম সভ্যতার নিদর্শন উঠে এসেছে ভূগর্ভ থেকে। একি করে সম্ভব? একই জায়গায় এতগুলি সভ্যতার উত্থান-পতন সৃষ্টি-লয় সম্ভব হয় কি করে? প্রকাণ্ড স্তম্ভ, সুদৃশ্য মর্মর মূর্তি, কারুকার্য করা পাথর, অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র, বিচিত্র হরফ—অতি-উন্নত সভ্যতার অতি-স্পষ্ট নিদর্শন উঠে এসেছে পাথরের স্তরের তলা থেকে। বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এই মাটিতেই তাহলে মানুষ সভ্যতার তুঙ্গে উঠে বসেছিল। কিন্তু এদেশ তো ছিল জলের তলায়। তাহলে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল জারটগের। দিনের আলো এখনো যায় নি। হাঁটতে হাঁটতে এল বাগানের পেছন দিকে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে এখানে। আজ ছুটির দিন। মজুররা তাই নেই। দুদিন পরেই মস্ত বাড়ী উঠবে এখানে। জারটগের বর্তমান ল্যাবোরেটরীর দুগুণ বড় ল্যাবোরেটরী বসবে সেই বাড়ীর মধ্যে।

এলোমেলো ছড়ানো রাজমিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতিদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জারটগ। ভাবছিলেন, কাজ শেষ হবে কদ্দিনে। এমন সময়ে পড়ন্ত রোদে একটা গহ্বর চোখে পড়ল।

উৎসুক হলেন জারটগ। গহ্বর দেখে নয়। গর্তের মধ্যে আধখানা মাটি-চাপা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে।

গর্তে নেমে বস্তুটাকে মাটি থেকে টেনে আনলেন জারটগ। দেখলেন, জিনিসটা একটা আধার। বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরী। এ-ধাতুর চেহারাও কখনো দেখেন নি। ধোঁয়াটে রঙ। দানা-দানা চেহারা। অনেকদিন মাটি চাপা থাকার ফলে ততটা চেকনাই আর নেই। যা আছে তাতেই রক্ষে নেই। এক জায়গায় খানিকটা চিড় খেয়ে গেছে। ফাটা জায়গা দিয়ে ভেতরে

* হেডম আর হিভা হল আদম আর ইভ-য়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণ

দেখা যাচ্ছে আর একটা আধার। যেন কৌটোর মধ্যে কৌটো পুরে রাখা হয়েছে।

জোর করে খুলতে গেলেন জারটগ। হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গেল অজ্ঞাত-ধাতুর খোলস। বহু বছরের পুরোনো তো। ধাতুর আর কিছু ছিল না।

ভেতরের কৌটো থেকে বেরোলো কিম্ভূতকিমাকার একটা জিনিস। কৌটোবন্দী থাকার ফলে জিনিসটা অক্ষত রয়েছে। অনেকগুলো পাতলা জিনিস রোল করে পাকানো। খুদে খুদে হরফে সুন্দরভাবে আঁকিবুঁকি কাটা পাতলা জিনিসটার ওপর। সারিবন্দী আঁকিবুঁকি দেখে মনে হয় পাগলের খেয়াল নয়—কি যেন লেখা হয়েছে। হরফটা অদ্ভুত। জারটগ জীবনে দেখেন নি।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন জারটগ। কাঁপতে কাঁপতেই ফিরে এলেন ল্যাবোরেটরীতে। মূল্যবান দলিলটা বিছিয়ে বসলেন টেবিলে।

বেশ বুঝলেন, পাতার পর পাতা জুড়ে কে যেন অনেক কথা লিখেছে। কিন্তু এ-ভাষা তো মানুষ কোনোদিন দেখেনি ?

শুরু হল জারটগের গবেষণা। এক বছর· ·দু'বছর করে কেটে গেল অনেকগুলি বছর। সাধনায় কিনা হয়। জারটগের একাগ্র সাধনাও বৃথা গেল না। অতীতের ভাষার মূল সূত্রটা ধরে ফেললেন জারটগ।

তারপর থেকেই সহজ হয়ে গেল কাজটা। দলিল পড়তে আর কোনো অসুবিধে হল না। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হলেন না জারটগ। অনুবাদ করে গেলেন নিজের ভাষায়।

এই সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী !

*   *   *   *

২৪শে মে, ২······সাল, রোজারিও

কিভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। ঘটনার শুরু তো অনেক আগে থেকেই। এতদিন মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়েছিল। এখন ঠিক করছি লিখে রাখব। কিন্তু কি ভাবে ? রোজনামচার কায়দায় বরং লেখা যাক।

লিখব কি ভাষায়, এই নিয়েই দ্বন্দ্ব লেগেছিল মনের মধ্যে। ইংরেজী আর স্প্যানিস বলতে পারি গড়গড় করে। কিন্তু এ-কাহিনী মাতৃভাষায় লেখাই ভাল। মানে, ফরাসী ভাষায়।

হ্যাঁ, আমি জাতে ফরাসী।—কিন্তু টাকা রোজগার করতে এসেছি মেক্সিকোতে। একটা রুপোর খনির মালিক আমি। দেদার টাকা কামিয়েছি। ইচ্ছে আছে, ধনভাণ্ডার নিয়ে বুড়ো বয়েসে স্বদেশ গিয়েই থাকব।

রোজারিও জায়গাটা সমুদ্রের ধারে। পাহাড়ের গায়ে আমার ভিলা।

ভারী সুন্দর ভিলা। ছবির মত সাজানো। আমার আঙুরের বাগান ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। একশ গজ উঁচু একটা খাড়াই পাথরের মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। একশ গজ নীচে দামাল সমুদ্রকে দেখতে বড় ভাল লাগে ওপরে দাঁড়িয়ে।

ভিলার পেছনেও পাহাড় উঠে গেছে দেড় হাজার গজ ওপরে। বাঁধানো রাস্তা আছে চূড়ো পর্যন্ত। মোটরে চেপে ফুলস্পীডে কতবার চূড়োয় উঠেছি। দামী মোটর তো। পঁয়ত্রিশ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন। ফ্রেঞ্চ মোটর। এ-মোটরে চড়ার আমেজই আলাদা।

ভিলায় থাকি আমার পঁচিশ বছরের ছেলে জঁ, পালিতা কন্যা হেলেন আর দাসদাসী নিয়ে। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, হেলেনকে পুত্রবধূ করব যথা সময়ে।

চব্বিশ তারিখে আড্ডা মারছিলাম বাগানে বসে। ঝলমল করছে চারিদিক ইলেক্‌ট্রোজেনিক আলোর ছটায়। মান্যগণ্য অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন কিছু অ্যাংলো স্যাক্সন এবং কিছু মেক্সিকান। মোট পাঁচজন অতিথি।

ডক্টর বাথুর্স্ট প্রথম দলে পড়েন, মানে অ্যাংলো স্যাক্সন। ডক্টর মোরেনো দ্বিতীয় দলের, মানে মেক্সিকান। দুজনের মধ্যে মনের মিল দারুণ। কিন্তু কথায় মিল নেই একদম।

সেদিনও তর্ক লেগেছে দুই পণ্ডিতে। ডক্টর বাথুর্স্ট ধার্মিক মানুষ। বলছেন, ঈশ্বরই আদম আর ঈভকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন। বাদবাকী মানুষের সৃষ্টি ঐ দুজন থেকে। ভদ্রলোকের আড়ষ্ট জিভে অবশ্য আদম কে এদেম মনে হল—ঈভ-কে 'ইভা'।

ডক্টর মোরেনো যথারীতি টিটকিরি ছাড়লেন বন্ধুর কুসংস্কার শুনে। ডক্টর বাথুর্স্ট রেগে টং হয়ে বললেন—"বিজ্ঞান যত উন্নতিই করুক না কেন, মহান শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য আজকের পৃথিবী দেখলে ট্যারা হয়ে যেত এদেম আর ইভা, তাহলেই নন্দনকানন-কে টেক্কা মারা যেত কী?"

পাছে, সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে যায় কথার ঝড়ে, আমি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম অন্যদিকে। শুরু হল বিজ্ঞানের প্রগতি নিয়ে মুখরোচক গুলতানি। মশগুল হয়ে গেলাম বিজ্ঞানের জয়-জয়কার নিয়ে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ জাতটা ভাবতেও পারেনি, এত উন্নতি করবে। চরম উন্নতি বুঝি একেই বলে।

গম্ভীরভাবে বললেন প্রেসিডেণ্ট মেনডোজা—"কথাটা ঠিক নয়। চরম উন্নতি এর আগেও ঘটেছিল। লোপ পেয়ে গেছে।"

"যথা?" সবাই উন্মুখ হলেন জবাব শুনতে।

"ব্যাবিলন!"

"হেসে গড়িয়ে পড়লেন বাদবাকী সকলে। ব্যাবিলনের সভ্যতার সঙ্গে দুহাজার সালের সভ্যতার তুলনা চলে নাকি?

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নাছোড়বান্দা। বললেন—"মিশরীয়রাও কম যায় নি।"

আরো জোরে হেসে উঠলাম আমরা।

এবার শেষ উদাহরণটি ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট।

বললেন—"আটলান্টিয়ানদের কাহিনীকে কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়াটা কিন্তু ভুল। আটলান্টিস যেমন সভ্যতার শিখরে উঠে আটলান্টিকের তলায় সমাধিস্থ হয়েছে, কে জানে যুগ যুগ ধরে এমনি আরো কত সভ্যতা চরম উন্নতি করেও মাটির তলায় হারিয়ে গেছে কিনা? কেউ কারো খবর রাখে না। জানি না বলেই কি তাদেব ইতিহাসকে উড়িয়ে দিতে হবে?"

"অসম্ভব!" গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর বাথুর্স্ট। "আজকের সভ্যতাব কথাই ধরুন না কেন। গোটা পৃথিবীটা জলের তলায তলিয়ে না গেলে এ-সভ্যতা কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, সভ্যতাব চিহ্ন থেকে যাবেই। অতীতেও যদি সে বকম সভ্যতা থাকত, চিহ্ন থাকতই।"

মহাপ্রলযের শুরু হল ঠিক সেই মুহূর্তে।

* * * *

ডক্টব বাথুর্স্টেব জবাব শুনে দমে গেছিলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা।

কিন্তু হারবার পাত্র নন তিনি। তাই গম্ভীর গলায় বললেন—"গোটা পৃথিবীটাই হঠাৎ জলের তলায ডুবে যাবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। অসম্ভবও সম্ভব হয়।"

আমবা যেই সমস্বরে 'বাজে কথা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছি, ভীষণ আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক তখনি। থর থর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার জমি। মাটি যেন দেবে গেল। ভিলাটা পর্যন্ত টলমল করে উঠল সেই ধাক্কায়।

ঘাবড়ে গেলাম সকলেই। উঠে দাঁড়িযে ভাবছি, এ আবার কি ব্যাপার, এমন সময়ে গোটা ভিলাটা ভেঙে পডল হুড়মুড় করে। এমনই কপাল, ভাঙা ভিলার ইট কাঠ পাথরের তলায চাপা পড়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা স্বয়ং এবং আমার খাস চাকর জার্মেন।

পরক্ষণেই শুনলাম তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আমার মালি র‍্যালে—"সমুদ্র! সমুদ্র!"

ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই ভয়ংকর দৃশ্য। সমুদ্র উঠে এসেছে বাগানে।

একশ গজ উঁচু খাড়া পাথরটা তলিয়ে গেছে জলের তলায়। দেখতে দেখতে জল গ্রাস করল মালির কুঁড়ে। বউ আর মেয়ে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে লাগল র‍্যালে—"সমুদ্র উঠে আসছে! সমুদ্র উঠে আসছে।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একী দৃশ্য দেখছি? আচম্বিতে চারদিকের সব দৃশ্যই যেন পালটে গিয়েছে। হু-হু করে ধেয়ে আসছে সমুদ্র!

কিন্তু সত্যিই কি সমুদ্র এগোচ্ছে? ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। সমুদ্র কিন্তু স্থির, নিস্তরঙ্গ বললেই চলে। কিন্তু বিপুল বেগে বাগান নেমে যাচ্ছে জলের তলায়।

চকিতে বুঝলাম কি সর্বনাশ হতে চলেছে। সমুদ্র ওঠে নি, ডাঙা ডুবছে। ঐ জন্যেই পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছিল। গোটা ভূখণ্ডটাই ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। মুহুর্মুহু তটরেখা পালটে যাচ্ছে। শান্ত জলরাশিতে সামান্য চাঞ্চল্য ছাড়া আর কোনো অশান্তি দেখা যাচ্ছে না। জল এগোচ্ছে সেকেণ্ডে ছ'ফুট। অর্থাৎ ঘণ্টায় চার পাঁচ মাইল। তার মানে আর মাত্র তিন মিনিট হাতে আছে। তার পরেই জল এসে পড়বে আমাদের ওপর।

চক্ষের পলকে ভেবে নিলাম কি করব। হেঁকে উঠলাম জোর গলায়—"গাড়ী বার করো!"

মুহূর্তে বুঝল সবাই কি মতলব আমার। চোখের পলক ফেলার আগে তাই গ্যারেজ থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনল গাড়ীটা, পেট্রল ভর্তি করা হল ট্যাঙ্কে এবং লাফ দিয়ে সবাই উঠে বসতে না। বসতেই চালু হযে গেল গাড়ী। বাগানের গেট খুলে দিয়ে লাফ দিয়ে পেছনের স্প্রিং ধরে ঝুলতে লাগল র‍্যালে।

শুরু হল আগুয়ান জলের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা। জল চায় আমাদের ছুঁতে, আমরা চাই জলের বাইরে থাকতে। ঢাল বেযে তীরবেগে ছুটল গাড়ী। তা সত্ত্বেও মনে হল যেন দাঁড়িয়ে আছি। কেন না, সমুদ্রও উঠে আসছে সমান বেগে। অত লোক নিযে উঁচুতে ওঠাও সহজ কথা নয়। দামী গাড়ী বলেই উঠছিল কোন মতে।

আচম্বিতে রাস্তার একটা পাথরে লেগে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ীটা। দম ফুরিয়েও এসেছিল বোধ হয় অতখানি পথ একটানা ছুটে আসায়। একঘণ্টা এক নাগাড়ে ওপরে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা?

দেখতে দেখতে জল পৌছে গেল পেছনে। পরক্ষণেই ফেণায় ডুবে গেল চাকার আধখানা। ভাবলাম এই শেষ।

কিন্তু ঠিক তখনি ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে লাফিয়ে গেল গাড়ী।

কারণটা বুঝলাম, র‍্যালের স্ত্রী অ্যানের চীৎকারে।

র‍্যালে পেছন থেকে খসে পড়ে গেছে জলের মধ্যে। হঠাৎ ওজন কমে যাওয়ায় তাই লাফিয়ে উঠে ফের ছুটেছে গাড়ী।

মেয়েদের কান্নাকাটির মধ্যেই ছুটল গাড়ী। ড্রাইভার সিমোনাট পাকা লোক। আরও ঘণ্টাখানেক এই ভাবে ছুটলে চুড়োয় পৌঁছোব। তারপর?

আচম্বিতে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ী।

"কী হল? ইঞ্জিন খারাপ?" হেঁকে উঠলাম আমি।

নীরবে আঙুল তুলে সামনে দেখাল সিমোনাট। দেখলাম, গজদশেক দূরে রাস্তা বলে আর কিছু নেই। যেন ছুরী দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে নেওয়া রাস্তার ওদিকে বাদবাকী জমি। নিঃসীম শূন্যতা সেখানে।

পেছনে জল কিন্তু তেড়ে আসছে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করলাম।

সহসা ফের কেঁপে উঠল মাটি। একই সঙ্গে থেমে গেল পেছনের জলোচ্ছ্বাস। জল আর উঠছে না। জীবন্ত ডুবে মরতেও হচ্ছে না। সামনে খাদ, পেছনে জল, মাঝে আমরা ক'জন।

বুঝলাম। নামতে নামতে অবশেষে ভূগর্ভে কোথাও ঠোক্কর খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ভূখণ্ড। তাই সমুদ্র আর উঠছে না। আমাদের গাড়ীটাও স্টীম ইঞ্জিনের মত হুস্-হুস্ করে হাঁপাচ্ছে এতখানি দৌড়ের পর।

জানি না কপালে কি আছে। ঘাসের ওপর শুয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়ে।

* * * *

রাত্রে

আচম্বিতে ভীষণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সীমাহীন সেই শূন্যতা থেকে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন মাথা কোটাকুটি চলছে। ফেণা আর জলের স্প্রে ভিজিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল·· নিবিড় নৈঃশব্দ চেপে বসল দিগ্‌বিদিকে···আকাশ ফর্সা হয়ে এল···ভোর হল।

* * * *

২৫শে মে

ভোরের আলোয় আগে দেখলাম কাছের দৃশ্য। একটু একটু করে আলো ছড়িয়ে গেল আরো দূরে।

আমরা ছোট্ট একটা দ্বীপে বন্দী। লম্বায় দেড় হাজার গজ আর চওড়ায় পাঁচশ গজ—এই হল দ্বীপের মাপ। এক সময়ে উত্তর পশ্চিম আর দক্ষিণে

পাহাড় ছাড়া কিছু দেখা যেত না। এখন জল ছাড়া কিছুই নেই। পুবদিকের দৃশ্য আরো ভয়ানক। গতকালও সেখানে পাহাড় শ্রেণীর ওদিকে মেক্সিকোকে দেখেছি। একরাতেই সে দৃশ্য মুছে গেছে। এখন সেখানে শুধু জল আর জল।

ক্ষিদে আর তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এখন এল মনভরা হতাশা। খাবার নেই, পানীয় জল নেই, বাঁচবার কোনো পথও নেই। মরতেই হবে তাহলে?

* * * *

৪ঠা জুন, 'ভার্জিনিয়া'র ডেক

ভার্জিনিয়া জাহাজটা মেলবোর্ণ থেকে জলযাত্রা শুরু করেছিল মাসখানেক আগে। চব্বিশে মে রাত্রে হঠাৎ বড় বড় ঢেউ দেখতে পায় ক্যাপ্টেন। তার বেশী কিছু না। বুঝতেও পারেনি কি কাণ্ড ঘটে গেল সারা পৃথিবীতে ঠিক সেই মুহূর্তে।

মেক্সিকোর কাছে এসে দেখল শুধু জল আর জল। মাঝে একটা পুঁচকে দ্বীপ। রোজারিও নেই, মেক্সিকোও নেই।

ছোট্ট দ্বীপে পড়ে এগারোটি নিথর দেহ। দুজন মারা গেছে ক্ষিদে আর তেষ্টায়। বাকী নজন মৃতপ্রায়।

এই দশটা দিন কিভাবে কেটেছে ঈশ্বর জানেন। উইলিয়াম আর বোলিং মারা গেছে। ন'জন বেঁচে গেছি স্রেফ আগু ছিল বলে।

ক্যাপ্টেন আমাদের তুলে নিলে ভার্জিনিয়াব ডেকে।

* * * *

ডাঙা—জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী

আট মাস জলে ভাসছি। সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছি। জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী সঠিক বলতে পারছি না। মাসের হিসেব রেখেই বা আর করব কি?

ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজে তুলে নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন মেক্সিকোর সন্ধান। কিন্তু পুবদিকে বহুদূর পর্যন্ত পুরোদমে গিয়েও মেক্সিকোকে দেখতে পায়নি। জল ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

তারপরেও অব্যাহত থেকেছে যাত্রা। কিন্তু এক সময়ে কয়লাও ফুরিয়ে গেল। চোদ্দই জুলাই পাল তুলে দিতে হল জাহাজে।

খাবার-দাবারও পাছে ফুরিয়ে যায়, তাই কম করে খেতে হচ্ছে প্রত্যেককেই।

তারপরেই ঝড়ের কবলে পড়লাম। একটানা পঁয়ত্রিশ দিন পাগলা ঝড়

উড়িয়ে নিয়ে চলল আমাদের। উনিশে অগাস্ট আকাশে রোদ হেসে উঠতেই কম্পাস নিয়ে বসল ক্যাপ্টেন। দ্রাঘিমা আর লঘিমা বের করে যা বললে, শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আমাদের।

আমরা যেখানে ভাসছি, এককালে সেখানে ছিল পিকিং!

তার মানে, এশিয়ার হালও আমেরিকার মত হয়েছে? দুটি মহাদেশই তলিয়ে গেছে জলতলে?

আরও দক্ষিণ পশ্চিমে এগোতে প্রমাণ পেলাম। তিব্বত নেই, হিমালয় নেই, ভারত নেই। তাথৈ তাথৈ নাচছে কেবল উত্তাল জলরাশি!

তবুও ভেসে চললাম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিসের আশায় ছুটে চলেছি জানিনা। মহাদেশের পর মহাদেশের অতল সমাধি দেখেও আর চমকে উঠছি না। সব সয়ে গেছে। তাই উরাল পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন দেখে বুঝলাম, আফ্রিকাও এখন জলের তলায়!

ক্রমে ভীষণ সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল কিন্তু গা-সওয়া দৃশ্য দেখে আর আঁৎকে উঠতাম না। আর বলতাম না, এইখানেই ছিল মস্কো…ওয়ারশ… বার্লিন ·ভিয়েনা·· রোম·· টিম্বাকটু· সেন্টলুই· মাদ্রিদ। ট্র্যাজেডী বেশী হলে আর ট্র্যাজেডী বলে মনে হয় না। গোটা ইউরোপটাই যদি তলিয়ে যায় তো আমার কী?

কিন্তু সহ্যশক্তিও একদিন ভাঙল যেদিন প্যারিসের ওপর এসে পৌঁছোলো ভার্জিনিয়া। অনুভব করলাম, অনেক নীচে জলের তলায় ডুবে রয়েছে আমার মাতৃভূমি। সিমোনাট কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

চারদিন পর দেখলাম এডিনবরাও নেই। নেই লণ্ডন।

তারপরেই ফুরিয়ে গেল জাহাজের খাবারের ভাঁড়ার। বিস্কুট পর্যন্ত আর নেই।

শুরু হল অনাহার। সাত মাস পর ফের অনুভব করলাম অনাহারের জ্বালা কি সাংঘাতিক। জাহাজশুদ্ধ লোক নেতিয়ে পড়ল ক্ষিদের জ্বালায়। খুব সম্ভব আটুই জানুয়ারী হঠাৎ ডাঙার মত আবছা কি যেন দেখলাম পশ্চিমে।

আমার ভাঙা গলার চীৎকার শুনে লাফ দিয়ে উঠল মৃতপ্রায় যাত্রীরা। ছুটে এল ডেকে।

কিন্তু একী দৃশ্য দেখছি! অথই আটলান্টিকের মাঝখানে এ ডাঙা তো কোনোকালে ছিল না!

আরও কাছে গেলাম। নামেই ডাঙা, প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও।

সবুজ-শ্যাওলা পর্যন্ত নেই, নেই সবুজ ঘাস। রুক্ষ কালো পাহাড় মাথা তুলে আছে হেথায়-সেথায়। এ হেন ঊষর দৃশ্য যে চোখেও দেখা যায় না!

উপকূলের ফাঁকে সরু পথ পেলাম অবশেষে। ভেতরে ঢুকল জাহাজ। জল সেখানে নিস্তরঙ্গ। প্রকৃতির তৈরী বন্দর।

ডাঙায় নেমে দেখলাম, ছোট ছোট হ্রদ রয়েছে বিস্তর। কিন্তু কোনো জলই সুপেয় নয়—নোনতা।

জমিতে এককালে পুরু কাদা ছিল। এখন শুকিয়ে ফেটে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে।

তার মানে, এ জমি আগে আটলান্টিকের তলায় ছিল। তাই ডাঙার জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও।

জলজ প্রাণী পেলাম বিস্তর। পাথরের খাঁজে খাঁজে অগুন্তি কচ্ছপ আর শামুক আস্তানা নিয়েছে। চিংড়ি আর কাঁকড়ারও শেষ নেই। মাছ তো লাখে লাখে।

আর যাই হোক, না খেয়ে মরতে হবে না এখানে।

জাহাজের নোঙর পড়ল অবশেষে—দীর্ঘ আটমাস পরে। জাহাজের সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে আনলাম ডাঙায়। শুরু হল মুষ্টিমেয় ক'টি মানুষের নতুন করে বাঁচার পালা।

জানিনা, এইটুকু জায়গায় শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারব কিনা। তবুও লিখে রাখছি সব কথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। কিন্তু আদৌ তারা আসবে কী?

* * * *

এই পর্যন্ত পড়বার পর থামতে হল জারটগকে। ধাতুর কৌটোয় সযত্নে পুরে রাখা সত্ত্বেও আর্দ্রতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে অনেকখানি পাণ্ডুলিপি। পাতার পর পাতা বিবর্ণ হয়ে খসে গিয়েছে। যা আছে, তাও ছাড়া ছাড়া। অনেকটা এইরকম:

* * * *

…সয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কদ্দিন নেমেছি পাণ্ডব বর্জিত এই দেশে, সে হিসেবও আর মনে নেই। ডক্টর মোরেনো অবশ্য আন্দাজে বললেন—"মাস ছয়েক তো বটেই।"

ছমাস! কম সময় নয়! ছটা মাস কেটে গেল জনপ্রাণী হীন এই পাথুরে দেশে।

এই ছ'টা মাস ব্যস্ত থেকেছি কেবল পেটের চিন্তায়। উদয়াস্ত হন্যে হয়ে ঘুরেছি খাবারের সন্ধানে। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি বেদম ক্লান্ত হয়ে। মাছ

দেদার আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। ধরা মুস্কিল। কচ্ছপের ডিম আর সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে আছি কোনমতে।

ভার্জিনিয়ার পালটা খুলে এনে একটা তাঁবু বানিয়েছি। পরে আরো ভাল ছাউনি তৈরী করব।

মাঝে মাঝে গুলি করে পাখী মেরে খাই। প্রথমে একটা পাখীও দেখা যায়নি। আস্তে আস্তে যাযাবর পাখীরা উড়ে এল আমাদের মত ক্ষিদের জ্বালায়। উইলো অ্যালবেট্রস ইত্যাদি বারো রকম পাখী দিনরাত ডানা ঝটপটিয়ে উড়ত আমাদের তাঁবু ঘিরে। হাত দিয়েও ধরা যেত। কিছু পাখী অনাহারে মরে যেত। মরা পাখীই খেয়ে নিয়েছি সবাই মিলে। বন্দুকের গুলি তো বাঁচছে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। জাহাজের খোলে একবস্তা গম পাওয়া গিয়েছে। সবাই চেয়েছিল, পুরো বস্তাটাই রুটি তৈরীর জন্যে সরিয়ে রাখা হোক। আমরা ক'জন রাজী হইনি। বস্তার অর্ধেক গম দিয়ে গমের চাষ আরম্ভ করেছি। জানিনা কপালে কি আছে। প্রথমদিকে মাটিতে নুন ছিল খুবই। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির পর ওপরের নুন ধুয়ে গেছে। খানাখন্দে বৃষ্টির জল জমে মিষ্টি জলের লেক-ও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নদীর জলে এখনো নুন রয়েছে। মাটির তলায় যে নুন রয়েছে। নদীতে মিশে যাচ্ছে সেই নুন।

দোআঁশলা মাটিতে বালি থাকলেও শেষ পযন্ত গম চাষ সার্থক হবে বলে মনে হয়। দেখি

* * * *

·· ভার্জিনিয়া'তে গিয়েছিলাম। দুজোড়া খরগোস পালিয়েছে ডাঙায়। খাবার খুঁজে পেয়েছে মনে হচ্ছে। তাহলে অনুর্বর জমিতে ঘাসপাতাও জন্মাচ্ছে? তাই যদি··

* * * *

···দু'বছর হয়ে গেল। গমের ফলন ভালই হয়েছে। পাখীর সংখ্যাও বেড়েছে। ওরাও খেয়ে বাঁচছে।

* * * *

···"কজন মারা গেছে আগেই লিখেছি। কিন্তু আমাদের সংখ্যা কমেনি। বরং বেড়েছে। আমার ছেলে আর হেলেনের বাচ্ছাকাচ্চাই তো তিনজন। আরও তিনটে সংসারেও বাচ্ছার সংখ্যা ঐরকমই। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কচিকাচার মুখ দেখে ভাবি, সংখ্যায় কমে এসেছি বলেই কি মানুষ জাতটার মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে এল?···

* * * *

··দশ বছর হয়ে গেল, অথচ নতুন মহাদেশের চেহারাও দেখা হয়নি। কুঁড়ে হয়ে গেছি। অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা মরে গিয়েছিল। খুঁচিয়ে জাগালেন বাথুর্স্ট। তাঁরই ঠেলায় জাহাজ মেরামত করা হল। তারপর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম দেশ দর্শনে।

ভেতর দিকে ঢুকে আগ্নেয়গিরি দুটোকে দেখতে পাব ভেবেছিলাম। অ্যাজোরস আর ম্যাডিরা এককালে কম উৎপাত করেনি আটলান্টিকের তলায়। আগুন বমি করে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছে আটলান্টিককে। এখন যখন সাগরতল জল ছেড়ে উঠে এসেছে, আশা করেছিলাম ওদের দেখতে পাবো। কিন্তু দেখলাম কেবল জমাট লাভার স্তর।

আগ্নেয়গিরির চিহ্ন নেই—আছে শুধু আগ্নেয়শিলা। দেখলেই বোঝা যায়, আগুন-পাহাড় দারুণ দাপাদাপি করেছে সেখানে।

আশ্চর্য আবিষ্কারটা ঘটল এইখানেই। অ্যাজোরস আগুন-পাহাড় যে অক্ষাংশে থাকার কথা, সেইখানে পেলাম অনেক থাম, থালা-বাসন এবং প্রস্তর মূর্তি। বেশ বুঝলাম, অতীতের লুপ্ত সভ্যতা। কিন্তু এ সভ্যতা আমাদের সভ্যতা নয়। তারও আগের। লস্ট আটলান্টিস!

হ্যাঁ, ডক্টর মোরেনো ঠিক ধরেছেন। সুদূর অতীতের সেই আশ্চর্য মহাদেশ আটলান্টিস জলতলে নিমজ্জিত হয়েও ফের ঠেলে উঠেছে জল থেকে! বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! একই ভূমিখণ্ডে বিভিন্ন মানুষ জাতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কি অদ্ভুত ইতিহাস!

আটলান্টিসের কিংবদন্তী তাহলে অলীক নয়? সংহার দেবতাই টেনে নিয়েছিল সেই মহাদেশকে জলের তলায়। অ্যাজোরেসের অগ্ন্যুৎপাতে ফের উঠে এসেছে জল থেকে ওপরে?

কিন্তু অতীত নিয়ে খামোকা ভেবে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা এখন বাঁচতে চাই। বাঁচার তাগিদেই এগিয়ে চললাম। অবাক হলাম সবুজের চিহ্ন দেখে। আগে কিছুই ছিল না। খুব সম্ভব পাখীরা বীজ এনে ফেলেছিল মাটিতে। সেই বীজই এখন গাছ হয়ে ছেয়ে ফেলেছে ভূখণ্ড! প্রাণীকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এসব গাছপালার চেহারাও তো কোনোকালে দেখিনি। যে কোনো অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে নামগোত্রহীন এই উদ্ভিদগুলোর। এককালে ছিল হয়তো জলের তলায়। জল থেকে ওঠার পর মরে গিয়েছিল রোদের তেজে। তারপর বৃষ্টির জল জমেছে। পুকুর, হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। অদ্ভুতভাবে নতুন নতুন জলজ উদ্ভিদ তরতাজা চেহারা নিয়ে

ছড়িয়ে পড়ছে। জল থেকে ডাঙায় উঁকি দিচ্ছে। ডাঙায় উঠে আরও ভেতরে এগোচ্ছে। তারপর একেবারেই জলছাড়া হয়ে ডাঙার গাছ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনটা ঘটছে খুব দ্রুত। প্রথমে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে কুঁড়ি, ফুটছে নতুন পাতা। তারপরেই ভয় ঝেড়ে ফেলে মানিয়ে নিচ্ছে নতুন জলহাওয়া মাটির সঙ্গে!

শুধু পাদপরাজ্য নয়। একই পরিবর্তন দেখছি প্রাণী-রাজ্যেও। জলের মাছের এখন ডানা গজিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে উড়ন্ত মাছেরা ডাঙার ওপর। মাছ না বলে তাদের পাখী বলাই উচিত……

* * * *

শেষ পাতা ক'টা অটুট রয়েছে। শেষ রোমাঞ্চ পড়তে পড়তে কণ্টকিত হলেন জারটগ।

* * * *

·· সবাই বুড়ো। ক্যাপ্টেন মরিস মারা গেল আজকে। দিন গুনছি আমরা বুড়োরা। আমি আটষট্টি। ডক্টর বাথুর্স্ট পঁয়ষট্টি। ডক্টর মোরেনো ষাট। মরবার আগে হাতের কাজ শেষ করতেই হবে, যে ভাবেই হোক।

কিন্তু কি করব এত লিখে? কে দেখবে? বংশধররা? হায়রে!

এ-দৃশ্যও দেখতে হল আমাদের! ছেলেমেয়েরা তো পিল পিল করছে গোটা তল্লাটে। একে স্বাস্থ্যকর জায়গা, তায় বুনো জানোয়ার নেই সুতরাং জরায় মৃত্যু ছাড়া মরণও নেই। বছর বছর সংখ্যা বেড়ে চলেছে আমাদের কলোনীর।

কিন্তু এ-রকম বংশধর তো আমরা চাইনি! আমরা, এই কজন বুড়ো, এখনো প্রাণপণে ধীশক্তিকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করছি। আমরা ভুলতে চাই না আমরা কি ছিলাম। এ চেষ্টা সব চেয়ে বেশী মাত্রায় ছিল ক্যাপ্টেন মরিসের মধ্যে। কিন্তু আজ তাকে হারালাম।

এ-কলোনীতে শিক্ষিত মানুষ বলতে আমরা এই কজন। মানে, আমি আর আমার ছেলে, ডক্টর বাথুর্স্ট আর ডক্টর মোরেনো। কিন্তু আমরাও ঘুম থেকে উঠছি খিদে নিয়ে। সারাদিন ঘুরছি খিদের জ্বালা মেটাতে। দিনের শেষে বেদম ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি অঘোরে। পেট ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই মগজে।

হায়রে! সভ্যতা-গর্বিত মানুষ জাতটার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছি আমরা ক'জন মাত্র। কিন্তু আমরাও আস্তে আস্তে পশু অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি। পশু থেকে মানুষের সৃষ্টি—এখন দেখছি ঠিক উল্টোটা ঘটছে। মস্তিষ্কের চর্চা

আমাদেরও আর নেই। খালাসীদের কথা আর নাই বা বললাম। চিরকালই ওরা অশিক্ষিত, রুক্ষ, পাশবিক। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওদের সেই পাশবিক সত্তা আরো বেড়েছে! আমরাও মাথা খাটাই না। মগজের মৃত্যু ঘটছে আস্তে আস্তে—বেঁচে রয়েছে কেবল উদর। ডক্টর মোরেনো আর বুখার্স্ট'ও মস্তিষ্ককে শিকেয় তুলে রেখেছেন!

ভাগ্যিস বহু বছর আগে মহাদেশ পর্যটন করে এসেছিলাম। এখন সে সাহসও আর নেই। 'ভার্জিনিয়া'ও ভেঙে পড়েছে।

প্রথম প্রথম দু'চারজনে দু'একটা ঘর বানিয়েছিলাম। আর বানাই না। যেগুলো খাড়া করেছিলাম, সেগুলোও ভেঙে পড়েছে।

আমরা ঘুমোই খোলা জায়গায়—আকাশের তলাই—সব ঋতুই আমাদের কাছে এখন গা-সওয়া।

জাহাজ থেকে যে জামাকাপড় পরে নেমেছিলাম, সেগুলো ছিঁড়ে যাবার পর সামুদ্রিক শৈবাল জুড়ে কাপড় বানিয়েছিলাম। এখন তাও আর ভাল লাগে না। আমরা উদোম ল্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াই নির্বিকারভাবে। ঠিক যেন বর্বর অসভ্য।

কাজ শুধু একটাই। খাওয়া। খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ বুঝিনা। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদরকে শান্ত রাখা।

উদর প্রধান হয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকেই। এর মধ্যেই পুরোনো স্নেহভালবাসা এখনো টিম টিম করছে দুজনের মধ্যে! আমার ছেলে জন এখন নাতি-পুতি নিয়ে ঠাকুর্দা বনে গেছে। সে আমাকে বাবা বলে মানে। আর মানে আমায় প্রাক্তন-ড্রাইভার সিমোনার্ট।

সোজা কথায়, মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে আমাদের মধ্যে। এখনই যদি এই অবস্থা, এরপর যারা আসবে, তারা তো একেবারেই পশু হয়ে জন্মাবে। চোখের সামনে বাচ্ছাকাচ্চাদের দেখছি বুনো হয়ে বেড়ে উঠছে। না জানে লিখতো না জানে পড়তে। ভালভাবে কথাও বলতে পারেন না। দাঁত চোখা চোখা। শুধু জানে খেতে। পশুর ঠিক আগের অবস্থা। এরপর চিন্তা-স্মৃতি সবই লোপ পাবে। কেউ জানবে না তাদের পূর্বপুরুষরা এই পৃথিবীর বুকেই বিজ্ঞানের ভেল্কী দেখিয়েছিল!

সারা গায়ে ওদের বড় বড় লোম গজাবে। বাক্‌শক্তি লোপ পাবে। মগজ কমে আসবে। বনেজঙ্গলে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরবে খাদ্যের সন্ধানে।

কিন্তু আমরা, বুড়োরা, চেষ্টা করব ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এই লিপি রেখে যেতে। মগজ স্থবির হবার আগেই লিখে রাখব মানুষের ইতিহাস,

প্রগতির ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস। তাই এই প্রচেষ্টা। জাহাজ থেকে কালি-কলম কাগজ এনেছিলাম। সেই দিয়ে লিখলাম এই পাণ্ডুলিপি।

*　　　*　　　*　　　*

পনেরো বছর পর ফের লিখতে বসেছি। ডক্টর মোরেনো মারা গেছেন। ডক্টর বাথুর্স্টও নেই। একা আমি মৃত্যুর দিন গুনছি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর দেরী নেই।

জাহাজ থেকে একটা লোহার সিন্দুক এনে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। মানুষ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে, তার প্রায় সবটাই লিখে সাজিয়ে রেখেছি তার মধ্যে। এই পাণ্ডুলিপিটা তার পাশেই পুঁতে রাখব একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে।

বিদায়, মানুষ, বিদায়!

*　　　*　　　*　　　*

থ হয়ে বসে রইলেন জারটগ।

মিস্ত্রীরা বাড়ীর ভিত খুঁড়তে গিয়ে মাটি তোলপাড় করে ফেলেছিল। কিন্তু লোহার সিন্দুক কোথাও পায়নি। তার মানে, এত বছরে তা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। লোহা, জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে সেই অমূল্য সম্পদ—মানুষ-জাতটার জ্ঞানবিজ্ঞানের সারাংশ।

নষ্ট হয়নি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো! তাই টিঁকে গেছে এই পাণ্ডুলিপি!

স্তম্ভিত হয়ে রইলেন জারটগ। তাঁর অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়। পাথুরে স্তরের ফাঁকে ফাঁকে অতীত সভ্যতার নিদর্শন দেখে তিনি আঁচ করেছিলেন, অনেক বছর আগে এই থাম, অট্টালিকা, মূর্তি যারা তৈরী করেছিল, নিশ্চয় তারা মানুষ। অতি উন্নত সভ্য মানুষ।

পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লেখা রয়েছে তারা কারা। আটলান্টিয়ানরা। ডুবে যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিসের মানুষরা!

আজ সেখানে জারটগদের বাসিন্দা নগরী গড়ে উঠেছে। সুদূর অতীতে এইখানেই জাহাজ থেকে নেমেছিলেন আর একটা ডুবে যাওয়া সভ্যতার অবশিষ্ট মানুষরা!

'হেদম' শব্দটা নিয়ে কত কথাই না শোনা গিয়েছিল জারটগদের মধ্যে। 'হেদম' তাঁদের ভাষা নয়। নামটা তাহলে এল কোত্থেকে। এই নিয়ে কত কথা কাটাকাটিই না হয়ে গেছে।

এখন বোঝা গেল 'হেদম' নামের রহস্য। 'হেদম' এসেছে 'এদেম' থেকে। 'এদেম' এসেছে 'আদম' থেকে।

আদম! ডুবে যাওয়া সভ্যতার প্রথম মানুষ—আদম!

আদম—এদেম—হেদম! কল্পকল্পান্তরে এক-একটা মানুষ জাতির প্রথম মানুষের নাম। কে জানে, 'আদম' নামটাও ঐভাবে এসেছে কিনা ঠিক তার আগের ডুবে যাওয়া সভ্যতা থেকে। সে সভ্যতার মানুষ জাতটার প্রথম মানুষ ছিল বোধহয় 'উদম'। তারও আগে আরও একটা সভ্যতাও যে ঐভাবে তলিয়ে যায় নি। কে তা বলতে পারে?

শিউরে উঠলেন জারটগ। বেশ বুঝলেন, কল্পকল্পান্তরে চলছে এই একই খেলা। সৃষ্টি—স্থিতি—লয়! মানুষ আসছে। সভ্যতার শীর্ষে উঠছে, তারপর মুছে যাচ্ছে।

এ-খেলা চিরন্তন খেলা! শুরুর পরেই শেষ। শেষের পরেই শুরু!

এমনি করে একদিন জারটগদের 'চার সমুদ্রের দেশ'ও কি ডুব দেবে অতলে? আর এক ইতিহাস চাপা পড়বে জলের তলায়? জারটগদের তুলনায় পাণ্ডুলিপি লেখকের সভ্যতা ছিল অতি মানুষের সভ্যতা। তারা যদি নিশ্চিহ্ন হয় তো জারটগরাও হবে না কেন?

ঝুলন্ত পল্লী

[ভিলেজ ইন দি ট্রি-টপস]

....

[ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে তখন পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন মতের ঝড় বইছে। জুল ভের্ণ ধর্মভীরু হলেও বিজ্ঞান-সচেতন। তাই আশ্চর্য তত্ত্বকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। লিখলেন অত্যাশ্চর্য এই কাহিনী। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাঠক-পাঠিকার ওপর—নিজে কিছু বললেন না।

নর বানর সরাসরি নর হয়নি। মাঝে আর একটা ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া সেই প্রজাতি-রহস্য নিয়েই লেখা হয়েছে চাঞ্চল্যকর এই উপাখ্যান]

. ...

[হাতীর দাঁতের খোঁজে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েছিল দু'জন ইউরোপীয়··· হাতীর তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়ল অজ্ঞাত এক অরণ্যে গভীর রাতে সেখানকার গাছের আগায় আর তলায় রহস্যজনক আলো নাচানাচি করে বানর-শিশু মানুষের ভাষায় মা-কে ডাকে আশ্চর্য আলো সারাদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ·· রাত হলে মিলিয়ে যায় গহন অরণ্যে এ-কোন রহস্যের পেছনে ধেয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা ?]

১॥ অনেক পথ পেরিয়ে

মস্তপাথরে চাকা লাগতেই লাফিয়ে উঠল চারচাকার গাড়ীটা। ছটা ষাঁড় একটু থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই হ্যাঁচকা টানে গাড্ডা থেকে তুলে আনল গাড়ীর চাকা। ফের গাড়ী চলল সামনে।

এইভাবেই চলছে গত তিন মাস ধরে যেতে হবে আরো ন'দশ সপ্তাহ। গাড়ীটা অত্যন্ত মজবুত। কাঠের তৈরী। পাশের দিকে ঘুলঘুলির মত জানলা। পেছনে দরজা। দুটো কামরা গাড়ীর মধ্যে। সামনের কামরায় রয়েছে উর্দা—পর্তুগীজ রেনিয়া। পঞ্চাশ বছরের শক্ত সমর্থ প্রৌঢ়। আর আছে খামিশ। পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান নিগ্রো। ঝোপঝাড় কেটে পথ সাফ করে।

পেছনের কামরায় বকর বকর করছে পঁচিশ বছরের দুজন নওজোয়ান। একজন আমেরিকান। নাম, জন কর্ট। আরেকজন ফরাসী নাম, ম্যাক্স হিউবার।

তিন মাস আগে এরা বেরিয়েছে ফ্রেঞ্চ কঙ্গোর রাজধানী লিবার ভিল থেকে। বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে হাতী শিকার করেছে এন্তার। এত হস্তীদন্ত সংগ্রহ করেছে যে দুনিয়ার সব পিয়ানো-রীড তৈরী হয়ে যাবে তা দিয়ে। পেছন পেছন একদল কুলী মাথায় করে নিয়ে আসছে হাতীর দাঁতের বোঝা।

বছর দশেকের একটি ছেলেও নেচে কুঁদে ছুটে আসছে পেছনে। এর নাম লাঙ্গা। নিগ্রো হলেও নিগ্রোদের মত দেখতে নয়। ঠোঁট পুরু নয়। নাক মোটা নয়। চোখে বুদ্ধির ছাপ আছে। ছেলেটি ম্যাক্স আর জন-য়ের পালিত পুত্র বলা চলে। নরখাদক অসভ্যদের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনা ছেলে। শুধু নরখাদক নয়—বাচ্ছা খেকো। মানে, নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই খেয়ে নেয় ক্ষিদে পেলে। না পেলে খায় বড়দের মাংস।

হাতীর দাঁত অনেক পাওয়া গেছে। এবার ফেরার পালা। আরো ন'দশ সপ্তাহ লাগবে।

এমন সময়ে সামনে পড়ল একটা বিশাল জঙ্গল। উর্দা বললে—"এ জঙ্গল ঘুরে যেতে হবে। মাঝ দিয়ে যাওয়া চলবে না।"

ম্যাক্স বললে—"সেকী কথা। সোজা গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে তো।"

"তা যাবে। দিন পনেরো আগে পৌঁছোনো যাবে।"

"তা সত্ত্বেও যাবে না?"

"যাওয়া যায় না বলেই যাবো না। কেউ যায় নি আজ পর্যন্ত।"

"যাওয়ার চেষ্টাও করেনি?"

"আজ্ঞে না। পা ফেলার জায়গা নেই ও জঙ্গলে। গাছ আর ঝোপের দেওয়াল ঠেলে এগোনো মানুষের সাধ্য নয়।"

জন কর্ট বলে উঠল—"কি দরকার গাছের গোলক ধাঁধায় ঢুকে?"

"ভেতরে কি আছে জানতেও মন চায় না?" বললে ম্যাক্স।

"জেনে কি করবে? জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চই অজানা দেশ, অদ্ভুত শহর, পৌরাণিক কেল্লা, বিদঘুটে জানোয়ার আর তিন ঠ্যাংওলা মানুষ নেই।"

"জন, দেখতেও তো ইচ্ছা যায়?"

এই নিয়ে আসবার সময়ও কথা কাটাকাটি চলেছে দুজনের মধ্যে। ম্যাক্স বলেছিল, "অ্যাদ্দিনের জঙ্গল ভ্রমণেও নতুন কিছু দেখা গেল না, এ তো বড়

আপশোষের কথা। আশ্চর্য কিছু আবিষ্কার না করলেই নয়। লোকের কাছে ফলাও করে বলার মত অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার।"

জন বলেছিল—"তুমি বুঝি বনজঙ্গলের মধ্যেও আশ্চর্য কিছু দেখবার স্বপ্ন দেখছ?"

ম্যাক্স বলেছিল—"শুধু আশ্চয নয় হে, অসাধারণ কিছু।"

দুর্ভেদ্য অরণ্যের সামনে এসেও আগের কথার ধুয়ো ধরে ম্যাক্স চাইল সোজাসুজি বনে ঢুকতে। পথও কমবে। নতুন অভিজ্ঞতাও হবে কিন্তু উর্দাভা চায় না। জন-ও বেঁকে বসল। এদিকে সাতটা বাজে। এ অঞ্চলের সাতটা মানে বিলকুল অন্ধকার। সুতরাং যাত্রা স্থগিত রাখতে হল সেদিনের মত। কুলিরা হাতীর দাঁতের পাহাড় সাজিয়ে ফেলল গাড়ীর সামনে। মাংস সেঁকা হল আগুনের ওপর। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুম।

জন আর ম্যাক্স দুজনেই স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল খোলা জায়গায়। লাঙ্গা শুল পাশে। উর্দা আর খামিশ শ্যেনদৃষ্টি মেলে ঘুরে দেখে এল চারিদিক। আগুন নিভিয়ে দিল ভাল করে। একটা ফুলকি থেকেও শুকনো ঘাসে আগুন লাগতে পারে। দাবানল জ্বললে আব রক্ষে নেই।

সাবাদিনেব পথশ্রমের পর পেট ভবে খেলে চোখে ঘুম তো নামবেই। অকাতরে ঘুমোতে লাগল অভিযাত্রীরা। রাত দশটা নাগাদ কেউ চোখ মেলে দেখলোও না আশ্চর্য অরণ্যের গভীরে সন্দেহজনক কতকগুলো আগুন জ্বলে উঠল। নড়ে নড়ে চলতে লাগল বনের কিনারায়।

২ ॥ চলন্ত অগ্নিশিখা

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভাঙল লাঙগার। ঘুম জড়ানো প্রায়-বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিযে দেখল অতি ক্ষীণ একটা আলোর কণা দূরের অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ঘুম। পুরোপুরি খুলে গেল দু'চোখের পাতা। দেখল, মাইল দেড়েক দূরে বনের কিনারায় সত্যিই কতকগুলো অগ্নিশিখা ছুটোছুটি করছে, নাচানাচি করছে, এঁকেবেঁকে চলছে।

মানুষখেকো অসভ্য নাকি? আফ্রিকার গহণ অরণ্যে এদের চাইতে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। অস্ট্রেলিয়ার নরখাদক বা সাউথ সী আয়ল্যাণ্ডের আদিবাসীরা এদের তুলনায় শিশু বললেই চলে। দশ থেকে পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মাংস পেলে আর কিছু খেতে চায় না। কথায় কথায় চাকর-বাকরদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় মোড়লদের হুকুমে।

বনের কিনারায় তারাই এসে জড়ো হয়নি তো? সংখ্যায় অবশ্য বেশী নয়। প্রায় দশটা অগ্নিশিখা শান্ত হাওয়ায় বেশ জোরেই জ্বলছে। প্রায় দুশ গজ জায়গা জুড়ে আগুনগুলো ঘুরছে। কেন? জড়ো হচ্ছে নাকি? ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করছে?

লাব্জা টুঁ শব্দটি করল না। বেড়ালের মত নিঃশব্দ চরণে লাফিয়ে উঠল কাঠের গাড়ীর ওপর। ডেকে তুলল উর্দাকে।

উর্দা চলন্ত আগুন দেখেই চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল প্রত্যেকেরই! রক্ষীরা ঘুমোচ্ছিল কেন, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলল না।

অবাক বিস্ময়ে সবাই চেয়ে রইল দূরের রহস্যজনক অগ্নিশিখাগুলোর দিকে। সংখ্যায় বেড়েই চলেছে আগুনগুলো। এখন প্রায় গোটা পঞ্চাশ জ্বলন্ত শিখা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে অরণ্য-প্রান্তে।

কিসের আগুন ওগুলো? ধাঁধায় পড়ল ম্যাক্স আর জন। আলেয়ার আলো? না, ভূতের আলো? ইলেকট্রিক মেঘের ফুলকি? না অন্য কিছু?

আলেয়ার আলো নয় মোটেই। এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে হলদে ধোঁয়া। শোনা যাচ্ছে পট-পট শব্দ।

জন বললে "রজনের মশাল নিশ্চয়।"

ম্যাক্স বললে—"ঠিক ধরেছো। কিন্তু ওরা তেড়ে আসছে না কেন বুঝছি না।"

এভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা নিরাপদ নয় মোটেই। গুলি বারুদের অভাব নেই কাঠের গাড়ীতে। বন্দুক-পিস্তল আছে গোটা বারো। চক্ষের পলকে প্রত্যেকে তৈরী হল হাতিয়ার নিয়ে। হঠাৎ আক্রমণ শুরু হয়ে গেলে যেন ঠেকানো যায়।

পুব-পশ্চিম-উত্তর দিকে নিঃসীম অন্ধকার। অগ্নিশিখা চলে চলে বেড়াচ্ছে কেবল দক্ষিণ দিকে।

এগারোটা নাগাদ ম্যাক্স বললে—"এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। আমি দেখে আসতে চাই।"

উর্দা বললে—"হুজুর ঠিক বলেছেন।"

ঠিক হল খামিশকে নিয়ে ম্যাক্স এগোবে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে। হাতে বন্দুক থাকবে। কিন্তু দরকার না পড়লে ছোঁড়া হবে না।

এগোলো ম্যাক্স। সঙ্গে খামিশ। কিছু দূর গিয়ে দেখল বুনো বেড়ালের মত লাব্জাও এসেছে পেছন পেছন। ম্যাক্সকে বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে

নিরাপদে থাকতে রাজী নয় সে। রাতে বেড়ালের মত দেখতে পায় লাম্বা। সঙ্গে থাকলে অনেক উপকারে লাগবে।

ফের শুরু হল এগিয়ে চলা। আগুনের শিখাগুলো এখনো নড়ছে, চলছে, লাফাচ্ছে। মাঝে মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। ফের দেখা দিচ্ছে। ঘন ঘাসপাতা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে যেন, দৃশ্যমান হচ্ছে পরক্ষণেই।

প্রায় শ'দুই গজ দূরে এসেও নতুন কিছু দেখতে পেল না ওরা। আগুন জ্বলছে ঠিকই। কিন্তু মশাল নিয়ে কারা অমন ছুটোছুটি করছে, তা দেখা যাচ্ছে না। ঈষৎ ছায়ার আভাস রয়েছে—কিন্তু তা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

অধীর কণ্ঠে ম্যাক্স বললে—"আমি যাই আরো এগিয়ে—"

মশালগুলো তবুও নড়ছে। সহসা দেখা গেল আরো গোটা কুড়ি অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। এবার আর মাটির ওপর নয়। মাটি থেকে দেড়শ ফুট ওপরে—গাছের ডগায়!

সব চাইতে আশ্চর্য, শূন্যপথে অগ্নিশিখাগুলো দুলে দুলে কি যেন বলতে চাইছে মাটির ওপরকার অগ্নিশিখাগুলোকে। মাটির মশালগুলোও দুলে দুলে জবাব দিচ্ছে!

ম্যাক্সকে আর ধরে রাখা গেল না। ঠিকরে গেল সামনে।

আচমকা কে যেন দানবিক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল সব কটা আগুন। এক পলকে গাঢ় তমিস্রায় ঢেকে গেল দক্ষিণ দিক।

আওয়াজটা শোনা গেল পরক্ষণেই।

যেন সহস্র কণ্ঠে চাপা গজরানি শোনা গেল, সহস্র নাসিকায় অর্গান বেজে উঠল। নাকের মধ্যে গর্জে উঠলে, চাপা গলায় হুংকার ছাড়লে এমনি আওয়াজই শোনা যায়।

শব্দটা ভেসে এল বহু দূর থেকে। ঝড়ের আওয়াজ নয়তো? আফ্রিকার অরণ্যে ঝড়ের দামামা বাজলে জন্তুর ডাক বলে মনে হয়।

কিন্তু না। এ আওয়াজ ঝড়ের আওয়াজ নয়। আকাশে ইলেকট্রিক মেঘ নেই। বাতাসে ঝড়ের শ্বাস নেই! এ আওয়াজের উৎস খুবই রহস্যজনক। এ শব্দ আকাশ থেকে নামছে না মাটির ওপর দিয়ে ধেয়ে আসছে।

শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। দূরায়ত ঘর্ঘর ধ্বনি ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে।

উৎকণ্ঠিত হল ম্যাক্স—"ও কিসের শব্দ?"

রুদ্ধশ্বাসে বললে খামিশ—"পালান!"

কান পেতে শুনল ম্যাক্স। অনেক দূরে যেন ঢাক বাজাচ্ছে গুর-গুর করে।

তীব্র বংশীধ্বনিও শোনা যাচ্ছে রেলের বাঁশীর মত। সব মিলিয়ে একটা গুরুগম্ভীর শব্দ এগিয়ে আসছে···আসছে···আসছে!

"আর এক সেকেণ্ডও নয়। দৌড়োন!" দম আটকানো স্বরে বলেই পেছন ফিরে ছুটতে লাগল খামিশ।

৩॥ ছত্রভঙ্গ

দেড় মাইল পথ এক নিঃশ্বাসে ছুটে এল তিনজনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে উর্দা—"হাতীর দল!"

খামিশ বললে—"হ্যাঁ, হাতীর দল! পালান! এখুনি!"

কুলীরা আগেই ভেগেছে। শুধু হাতে নয়। হাতীর দাঁতের বোঝা মাথায় নিয়ে চম্পট দিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। এদিকে আর সময় নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে পড়ল বলে হাতীর পাল।

মাইল দেড়েক দূরে দেখা গেল তারা আসছে। সচল পাহাড় যেন ছুটে আসছে! সংখ্যায় কত? পাঁচশ? সাতাশ? হাজার?

মাটি কাঁপছে থরথর করে গোদা পায়েব ঘায়ে। বাতাস ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে বৃংহিত ধ্বনিতে।

আর সময় নেই। উর্দা চেঁচিয়ে উঠল পাগলের মত—"গাড়ীটাকে লুকিয়ে রাখুন গাছের আড়ালে।"

কিন্তু ষাঁড়গুলোও পালিয়েছে বাঁধন ছিঁড়ে। একটা ষাঁড়ের মরণ চীৎকার ভেসে এল দূর থেকে। হাতীরা তাকে চটকাচ্ছে মাটির সঙ্গে।

"গাছে উঠুন। চটপট," বললে খামিশ।

পড়ে রইল কাঠের গাড়ী। দৌড়ে পালানোরও সময় নেই। ছুটে গিয়ে গুঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল ওরা। আসবার সময়ে গাড়ী থেকে বন্দুক আর গুলি নিল সঙ্গে। গুঁড়িগুলো বেশ মোটা। তলার দিকে পরিধি পাঁচ সাত ফুট তো বটেই। ওপর দিকে শাখায় শাখায় জটলা। ডাল বেয়ে পালানো যাবে এক গাছ থেকে আরেক গাছে।

এসে গেছে হাতীব পাল। টুকরো টুকরো করে ফেলেছে মজবুত কাঠের গাড়ীটাকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গাছের ওপর।

তিরিশ ফুট ওপরে নাগাল পেল না ম্যাক্স, জন, উর্দা, খামিশ আর লাজার। কিন্তু আক্রমণ শুরু হল গুঁড়ির ওপর। অত মোটা গুঁড়িও ভেঙে পড়বে মনে হল।

হঠাৎ যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল উর্দার। গুলির পর গুলি ছুঁড়ে চলল হাতীদের লক্ষ্য করে। খামিশ বাধা দিলে। হাত ধরে টানল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ম্যাক্স, জন আর লাঙ্গাকে নিয়ে খামিশ ডাল বেয়ে চলে এল পাশের গাছে।

ঠিক তখনি আগের গাছটা উপড়ে পড়ল মাটিতে। শোনা গেল উর্দার মরণ চীৎকার।

হাতীরা এবার এ-গাছের দিকেও ফিরেছে। শুরু হয়েছে ধাক্কার পর ধাক্কা। গাছ হেলে পড়ছে আস্তে আস্তে। ঝাঁকড়া ডালপালাগুলো মাটি ছুঁতেই সেদিক থেকে সরে দাঁড়াল হাতীরা।

সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল খামিশ—"জঙ্গলের দিকে ছুটুন।"

বলেই লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। ছুটল জঙ্গল লক্ষ্য করে। লাঙ্গাকে টপ করে কাঁধে তুলে নিল ম্যাক্স।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল হাতীর দল। তারপর শুরু হল পেছন নেওয়া। ম্যাক্স পেছিয়ে পড়ল লাঙ্গা কাঁধে থাকার দরুন। একটা হাতী এসে গেল একদম পেছনে। এদিকে জঙ্গলও মাত্র কয়েক হাত দূরে।

হাতীটার শুঁড় থেকে নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগল ম্যাক্সের গায়ে। মাটি কাঁপছে থর থর করে।

আচম্বিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জন। বন্দুক তুলে গুলি করল হাতীটার দু'চোখের মাঝখানে।

অব্যর্থ লক্ষ্য। পাহাড়ের মত আছড়ে পড়ল সামনের হাতী। পথ জোড়া দেখে তাকে ঘুরে আসতে একটু সময় নিল পেছনের হাতীরা। সেই ফাঁকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢুকে আছড়ে পড়ল ওরা।

মোটা মোটা গাছ পাশাপাশি উঠে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। গাছের গুঁড়িই যেন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছে আশ্চর্য অরণ্যকে। মানুষ গলতে পারে—হাতী পারে না। ধাক্কা দিয়েও পাশাপাশি লাগোয়া এ-গাছ ভাঙাও সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তাই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রণে ভঙ্গ দিল হাতীর দল।

নিঃসাড়ে পড়ে রইল চারজন।

রাতের আগন্তুকদের কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। কোথায় সেই নরখাদক জংলীরা? কোথায় তাদের মশাল? কোথায় তাদের রহস্য-সংকেত?

৪ ॥ নদীর সন্ধানে অজ্ঞাত অরণ্যে

সারারাত কাটল অধীর প্রতীক্ষায়। জঙ্গলের বাইরে হাতী আর জঙ্গলের ভেতরে জংলী—এ অবস্থায় কেউ ঘুমোতে পারে? হাতীদের তবুও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মশালবাহী জংলীরা তো এখনো অদৃশ্য। অন্তরাল থেকে হয়ত চোখে-চোখে রেখেছে। ঘুমে ঢলে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মশাল জ্বালানোর চিহ্ন দেখা গেল গাছের তলায়। ছাই রয়েছে। তখনো ধোঁয়া উঠছে পোড়া কাঠ থেকে। কিন্তু নিশাচর আগন্তুকরা দেখা দিচ্ছে না। কোথায় তারা? গাছের ওপর? না, গুঁড়ির আড়ালে?

এইভাবেই ভোর হল। গাছের তলায় আরো ছাই আরো পোড়া কাঠ দেখা গেল। সত্যিই কালরাতে জংলীরা এখানে ছিল। কিন্তু এখন নেই। কোথাও নেই। হাতীর তাড়া খেয়ে বোধহয় চম্পট দিয়েছে নিজেদের ডেরায়।

হাতীরা কিন্তু যায়নি। এখনো ঘুরঘুর করছে বনের বাইরে। কেউ কেউ গুঁতোও মারছে মোটা মোটা গুঁড়িতে। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। দেড় মাইল দূরে ছোট পাহাড়টার তলায় ভাঙা কাঠের গাড়ী ঘিরেও টহল দিচ্ছে পালে পালে হাতী।

এ অবস্থায় ইচ্ছে থাকলেও ওখানে যাওয়া চলে না। যাওয়ার দরকার ছিল যদিও। উর্দা বেচারীকে কবর দেওয়া দরকার। ভাঙা গাড়ীর মধ্যে থেকে আরো কিছু গুলি-বারুদ, খাবার-দাবার নেওয়া দরকার। কিন্তু সচল পাহাড়ের মত রুদ্রমূর্তি ঐ হাতীদের সামনে কে যাবে?

সুতরাং শুরু হল পরামর্শ। কোন পথে যাওয়া হবে এখন? উদাই এতদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ওদের। ব্যবসাদার তো, হাতীর দাঁত খুঁজতে বহুবার এসেছে এ-অঞ্চলে। পথঘাট নখদর্পণে। সেই উদাই এখন নেই। হাতীর দাঁতের বোঝা নিয়ে কুলীদের উধাও হতে দেখে আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি। নইলে হাতীর পাল কে গুলি করে রুখতে যায়?

উর্দা কিন্তু পইপই করে বারণ করেছিল এ জঙ্গলে যেন ঢোকা না হয়। তিনমাস আগে তার ভরসাতেই অভিযানে বেরিয়েছিল ম্যাক্স আর জন। লিবারভিলে একটা আমেরিকান কারখানায় ওদের টাকাকড়ি খাটছে। ওদের মানে জন আর ম্যাক্সের বাবাদের। হাতে পয়সা আছে, সময়ও আছে। তাইতো হাতীর দাঁতের সন্ধানে অভিযাত্রীদল উবাঙ্গীর জঙ্গলে যাচ্ছে শুনে সঙ্গ নিয়েছিল দুজনে।

জন আর ম্যাক্স হরিহর আত্মা হলেও প্রকৃতিতে দু'ধরনের। জন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। গদ্যময়। কল্পনার ধার ধারে না। ম্যাক্স ঠিক তার উল্টো। কবিত্বময়। বড্ড বেশী কল্পনাপ্রবণ। বোস্টনে জন্মালে কি হবে, জন কর্ট অনেক ইয়াঙ্কিকে টেক্কা মারতে পারে গুণপনার দিক দিয়ে। ভূগোল, নৃতত্ত্ববিদ্যা তার প্রিয় বিষয়। ম্যাক্সও কম যায় না। কিন্তু ফরাসী তো। ভাবের সাগরে ডুবে থাকতে ভালবাসে।

তাই সমস্যা হল দুজনকে নিয়ে। কোন পথে যাওয়া উচিত? অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে অজ্ঞাত অরণ্যে প্রবেশ করা কি ঠিক হবে? না, ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌছোনোর জন্যে জঙ্গল ঘুরে গেলে মঙ্গল হবে? জঙ্গলের আয়তন নিতান্ত কম নয়। ফ্রান্সের দুগুণ। ফ্রেঞ্চ-কঙ্গোর দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত এ-জঙ্গলে কোনো অভিযাত্রী ঢুকতে সাহস পায়নি। উর্দা ঐ কারণেই ঘুরে যেতে চেয়েছিল।

খামিশ কিন্তু সোজা কথা বলে দিলে—"জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাবো হুজুর। তাতে তাড়াতাড়ি পৌছোনো যাবে। ভয় কিসের? জন্তুজানোয়ারকে জখম করতে পাবব। জংলী? এ জঙ্গলে ঢোকে না ওরা। সে সাহস ওদের নেই।"

"কিন্তু পথ চিনবে কি করে?"

"এতবড় জঙ্গলে নিশ্চয় নদীর স্রোত পাব। সে নদী নিশ্চয় উবাঙ্গীতে গিয়ে মিশেছে। আমরা যদি বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে থাকি আর পথে যদি সেরকম এক া নদী পাই। তাহলে উবাঙ্গী পৌছে যাবো সহজেই।"

"কিন্তু আফ্রিকার নদীতে নৌকো ভাসানো চাট্টিখানি কথা নয়!" বললে জন কর্ট।

মুখিয়ে উঠল ম্যাক্স হিউবার—"তোমার সব তাতেই ভয়।"

শেষ পযন্ত খামিশের যুক্তি মেনে নিতে হল জন-কে। জঙ্গলের বাইরে বিপদ বেশী। সমতল ভূমিতে জংলীর ভয় আছে, রোদের জ্বালা আছে, হাতীর আক্রমণ আছে। কিন্তু বিশাল এই অরণ্যের সবুজ চাঁদোয়ার নীচে রোদ নেই—শুধু ছায়া। হাতীর ক্ষমতা নেই এ জঙ্গলে ঢোকার। জংলীরাও নিশ্চয় এখানে আসে না। গাছে গাছে নির্ভীক পাখী আর ল্যাজঝোলা বাঁদরদের দেখেই তা মালুম হচ্ছে।

সুতরাং সায় দিল জন। বলল—"ঠিক আছে, নদীর পাড় বরাবর পৌছে যাব'খন উবাঙ্গীতে।"

"চলো সামনে!" সোল্লাসে হেঁকে উঠল ম্যাক্স।

গাছে গাছে পাখীদের নাচানাচি আর শাখামৃগদের অবাক চাহনি দেখতে দেখতে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করল চারজনে। সত্যিই এ-জঙ্গলে মানুষ ঢোকেনি কখনো। ঢুকলে ওদের দেখে ভয় পেত গাছের প্রাণীরা। দূরে সরে যেত। অমনভাবে কাছে এসে উৎসুক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত না।

ক্ষিদের জ্বালায় একটা হরিণ শিকার করা হল। শিককাবাব মন্দ লাগল না। বিস্কুট নেই, রুটি নেই। শুধু শিককাবাব খেয়েই ক্ষিদে মেটাতে হল।

রাত নামল। প্রকাণ্ড দুটো গাছের শেকড়ের আড়ালে শুয়ে পড়ল সবাই। পালা করে রাত জাগল প্রত্যেকেই। প্রথম প্রহরে পালা ছিল ম্যাক্সের। বন্দুক হাতে ঠায় বসে কত কল্পনাই না করল মনে মনে। নামকরা পর্যটক স্ট্যানলী আফ্রিকার গহন অরণ্যে ঢুকে তিন ফুট উঁচু বামন মানুষদের দেখা পেয়েছিলেন। পিগমি তাদের নাম। ওজনে মাত্র আশী পাউণ্ড, বুদ্ধিতে শক্তিতে সভ্য মানুষের চাইতে কম যায় না। দেখতে শুনতেও ভাল। তবুও থাকে গাছের ডালে। ম্যাক্সও যদি এই রকম অত্যাশ্চর্য প্রাণীদের আবিষ্কার করতে পারে কি মজাই না হবে তাহলে। পৌরাণিক সাইক্লোপদের মত একচক্ষু জীব অথবা ল্যাজওলা মানুষ অথবা হাতীর শুঁড়ের মত নাকওলা অদ্ভুত প্রাণী যদি দেখা যেত অজ্ঞাত এই অরণ্যে। হৈ-হৈ পড়ে যাবে সভ্যজগতে।

কল্পনারঙীন ভাবনা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকায় রক্ষীর কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল ম্যাক্স। তাই কাঁধের ওপর আচমকা হাত পড়তেই চমকে উঠল ভূত দেখার মত—"কে? কে?"

হেসে উঠে জন বললে—"আমি। এবার আমার জাগবার পালা।"

পরদিন এগারোই মার্চ। সারারাত ঘুমিয়ে শরীর ঝরঝরে প্রত্যেকেরই। হরিণের ঠাণ্ডা মাংস খেয়ে নিয়ে শুরু হল পদযাত্রা। দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হণ্টন। দুর্ভেদ্য অরণ্যের ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে দিচ্ছে খামিশ। পেছন পেছন আসছে জন, ম্যাক্স, লাঙগা।

পথে নদীর সন্ধান এখনো মেলে নি। সূর্য দেখে নিশানা ঠিক রাখতে হচ্ছে। দক্ষিণ পশ্চিমেই এগোচ্ছে চারজনে।

মাথার ওপরে আরো অদ্ভুত বাঁদর চোখে পড়ছে। কেউ রেড ইণ্ডিয়ানদের মত লাল, কেউ আরবদের মত হলদে, কেউ কাফ্রীদের মত কালো। পাখী উড়ছে বিস্তর। হরেকরকম বাহার তাদের।

রাত্রে জলহস্তীর ডাক শোনা গেল। জলের ধারা কি তাহলে কাছেই?

পরদিন ছুটে বাস্টার্ড পাখী মেরে ঝলসে নেওয়া হল আগুনের আঁচে বৃষ্টি হচ্ছে না কদিন। কিন্তু গাছের খাঁজে, মাটিতে, পাথরে বৃষ্টির জমা জল দিয়ে তেষ্টা মিটছে। ঝমাঝম বৃষ্টি নামলে অবশ্য পথচলা মুস্কিল হবে। এখন দিব্বি যাওয়া যাচ্ছে পাতা চাঁদোয়ার তলা দিয়ে।

দুটো গণ্ডারের পাল্লায় পড়েছিল ওরা। মস্ত একটা বাওবাব গাছ সামনে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ডালে ওঠারও সময় ছিল না। দমাদম গুলি চলল। কিন্তু গণ্ডারের চামড়া তো। ঘায়েল করা গেল না। দুদিক থেকে দুটো গণ্ডারের খড়্গের গুঁতোয় সেদিন কেউই প্রাণে বাঁচত না।

কিন্তু বিধাতার সে ইচ্ছে নয়। তাই বাওয়াবের গুঁড়ির ফাটলে খড়্গ আটকে গেল একটা গণ্ডারের। ঠেলাঠেলির ফলে শিং আরো ঠুকে গেল— থরথর করে কাঁপতে লাগল অতবড় গাছটা।

সুযোগ নষ্ট করল না খামিশ। হেঁকে বললে—"দৌড়ান!"

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড়ালো চারজনে—আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে। কাহিল গণ্ডারটাকে নিয়েই তখন ব্যস্ত অন্য গণ্ডারটা। তাই তাড়া খেতে হল না পেছন থেকে।

দৌড়াতে দৌড়াতে খামিশ লক্ষ্য করলে মাটির চেহারা পালটে যাচ্ছে। জলা জায়গার মত স্যাঁৎসেঁতে মাটি। মাঝেমাঝে কাদা। জমা জল। জোঁক কিলবিল করছে।

সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেল নদীটা। বেশ চওড়া নদী। এক-একজায়গায় চল্লিশ গজ পর্যন্ত চওড়া। স্রোতের টান আছে। ভেলা ভাসিয়ে নিলে উবাঙ্গী পৌঁছানো যাবে সহজেই। কুমীর? জলহস্তী? আফ্রিকার সব নদীতেই তাদের উপদ্রব। তাই বলে নদীপথে যাতায়াত বন্ধ রাখতে হবে?

ঠিক হল, সকালের আলোয় সব দিক দেখেশুনে তারপর অভিযানের ব্যবস্থা করা যাবে। খুঁজেপেতে একটা গুহা বার করল খামিশ রাত কাটাবার জন্যে।

রাত নামল। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। একা বন্দুক কাঁধে জেগে রইল জনকর্ট।

গভীর রাতে একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনল সে। কচিগলায় কে যেন ডাকছে "আঙগোরা···আঙগোরা!"

এ দেশের ভাষায় আঙগোরা মানে মা। কিন্তু জনকর্ট নিশ্চয় ভুল শুনেছিল। ঘুম পাচ্ছিল বোধহয়। তাই উল্টোপাল্টা কল্পনা করেছে। যে জঙ্গলে মানুষ ঢোকেনি, সেখানে মা-কে ডাকবে কোন শিশু?

৫ ॥ খালি খাঁচা

গুহাটা ছিল বলেই রক্ষে। নইলে নদীর তীরে খোলা জায়গায় থাকা যেত না। রোদের তাতে অ্যাদ্দিন গায়ে ফোস্কা পড়েনি গাছের তলা দিয়ে হাঁটার দরুন। নদীর তীরে মাথার ওপর খোলা আকাশ। রোদ এবং বৃষ্টি—দুটি থেকেই নিরাপদে থাকার জায়গা এই গুহাটা। মেঝেতে বালি ছড়ানো। দেওয়াল দিব্বি শুকনো খটখটে। ভেলা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আরামে থাকা যাবে এখানে।

সকাল হতেই জন কর্ট আশপাশ দেখে এসেছিল। কাল রাতে মা-কে যে ডেকেছিল, তাকে কিন্তু দেখতে পেল না। অর্থাৎ ভুল শুনেছে জন। মনের দ্বন্দ্ব মিটে যেতেই দেখল নদীর চেহারা! শ' পাঁচেক গজ দূরে হঠাৎ মোড় নিয়েছে। ঘন গাছপালা সেখানে।

খাবারের ভাঁড়ার ফুরিয়ে এসেছে। ম্যাক্স বন্দুক নিয়ে বেরোলো শিকারের সন্ধানে। সঙ্গে গেল লাঙ্গা। জন আর খামিশ খোঁজ করতে লাগল ডাল-পালার। ভেলা বানাতে হবে তো। হাতিয়ার বলতে একটা কুঠার আর খানকয়েক ছুরী। তা দিয়ে এত মোটা গুঁড়ি কাটা সম্ভব নয়। অথচ ভেলা ছাড়া নদীপথে যাওয়া যাবে না। একবার ভেলা ভাসাতে পারলে তরতর করে আড়াইশ মাইল পেরিয়ে পৌঁছোনো যাবে উবাঙ্গীতে।

খামিশ তাই ঠিক করলে দূরের জলা জায়গায় গিয়ে মাটি থেকে কুড়িয়ে নেবে ভাঙা ডাল। লতা দিয়ে একসঙ্গে বাঁধবে। ওপরে ঘাস আর পাতার ডেক তৈরী হবে। চওড়ায় আট ফুট আর লম্বায় বারো ফুট হলেই যথেষ্ট।

কাঠকুটো কুড়োচ্ছে দুজনে। দূর থেকে বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল। অর্থাৎ ম্যাক্স মনের আনন্দে শিকার করছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হাঁকডাক শোনা গেল নদীতীর থেকে। ম্যাক্স আর লাঙ্গা গলা ছেড়ে ডাকছে ওদের। ভয়ের চীৎকার নয়! যেন অবাক হয়েছে।

গুহার ছাদে তরতরিয়ে উঠে গেল জন আর খামিশ। দেখলে কিছু দূরে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে ওদের ডাকাডাকি করছে ম্যাক্স আর লাঙ্গা।

ছুটে গেল জন আর খামিশ। উত্তেজিতভাবে বললে ম্যাক্স—"ওহে জন, তোমার অনেক কষ্ট কমিয়ে দিলাম। ভেলা বানাতে হবে না। পাওয়া গেছে।"

"ভেলা পাওয়া গেছে! বলছো কী?"

"ঐ দেখো।"

চমকে উঠল জন। সত্যিই তো! নদীতীরে খোঁটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ভাঙা ভেলা। কাঠ পচে গেছে। দড়িগুলোও আধপচা। কয়েক জায়গায় ভেঙেও গেছে। তবুও ভেলাই বটে!

নিশ্চয় কেউ এসেছিল বিজন অরণ্যে! এ ভেলা তারই।

লাম্বা লাফাতে লাফাতে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এল তীরবেগে। হাতে একটা জিনিস।

জিনিসটা আর কিছুই নয়। একটা তালা। চাবী নেই। মরচে ধরা। অকেজো। কিন্তু তবুও সেটা তালাই বটে। লোহার তালা! অজ্ঞাত অরণ্যে ভেলা আছে। তালা আছে! ব্যাপারটা কী? সভ্য মানুষের পা পড়েছে মনে হচ্ছে?

ঠিক হল। একটু এগিয়ে দেখে আসা যাক সত্যিই আরো কিছু নিশানা পাওয়া যায় কিনা। উজান বেয়ে সন্তর্পনে এগিয়ে চলল চারজনে, গাছের সারি শুরু হতেই বাঁদরের কিচিমিচি শোনা গেল মাথার ওপর। এখানকার বাঁদররা মানুষ দেখেছে মনে হল। অবাক হল না। ছুটে পালিয়ে গেল।

ম্যাক্স-ই প্রথমে দেখতে পেল খাঁচাটা। শ' দুই গজ দূরে বনের কিনারায় একটা অদ্ভুত খাঁচা ঘর। কুঁড়ে বলা চলে, খাঁচাও বলা চলে।

জন অবশ্য বলেছিল—"ভুল দেখছ। এখানে আবার কুঁড়ে কোথায়? নিশ্চয় উইয়ের ঢিপি।"

কিন্তু থামিশও বললে—"না হুজুর। খাঁচাই বটে!"

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ওরা আরো কাছে। হলদে ঘাসের বিবর্ণ চাল। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী তিনটে দেওয়াল। সামনের দেওয়ালে লোহার গরাদ। ঠিক যেমনটি চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। গরাদের বাইরে থাকে দর্শক। ভেতরে জন্তু।

দরজাটা গরাদেরই গায়ে। খোলা। বেগে ঢুকে পড়ল ম্যাক্স। ময়লা ধরা কিছু বাসনপত্র রয়েছে। একটা পোকায় খাওয়া কম্বল। ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি। একটা সসপ্যান, মগ, কাপ। দুটো তিনটে ভাঙা বোতল, চশমার খাপ, মরচে ধরা কুড়ুল।

এক কোণে একটা তামার বাক্স। ডালাটা ভীষণভাবে এঁটে গেছে। ফাঁক দিয়ে ছুরী ঢুকিয়ে চাড় মেরে খুলতে হল। ভেতরে পাওয়া গেল একটা খাতা।

খাতার পাতায় পোকা লাগেনি, জলও লাগেনি তামার বাক্সে বন্ধ থাকার দরুন। মলাটে লেখা শুধু একটি নাম: ডক্টর জোহেন্সেন।

৬॥ ডক্টর জোহৌসেন

ম্যাক্স, জন, এমন কি খামিশও লাফিয়ে উঠল ডক্টর জোহৌসেনের নাম শুনে! বেশী অবাক হলে মানুষ কথা বলতে পারে না। এই তিনজনেও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে—টুঁ-শব্দটি বেরোলো না মুখ দিয়ে।

ডক্টর জোহৌসেন! এ নাম কি ভোলবার? এ নামের আগে আর একটা নাম অবশ্য আছে। একটা ইতিহাসও আছে। সেই নাম আর সেই ইতিহাস ভীড় করে এল মনের মধ্যে।

প্রফেসর গার্ণার ছিলেন আমেরিকান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে সব জীব মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, তারা প্রত্যেকেই কথা বলতে পারে।

ওয়াশিংটন চিড়িয়াখানায় বাঁদরদের খাঁচায় ফোনোগ্রাফ বসিয়ে তিনি বাঁদরদের কথাবার্তা রেকর্ড করেছিলেন। গবেষণা করে দেখেছিলেন। কুকুর বাঁদরদের স্বরযন্ত্র বলতে গেলে মানুষের মতই। মানুষ ভাবতে পারে বলে গড় গড় করে কথা বলতে পারে। ইতর প্রাণীরা ভাবতে পারে না—তাই সেভাবে কথাও বলতে পারে না। ভাবনা ছাড়া কথা আসবে কেন? মনের ভাবনাকে বাইরে প্রকাশ করার জন্যেই তো কথার সৃষ্টি। বিধাতা ইতর প্রাণীদের চিন্তা-শক্তি দেন নি। কাকাতুয়া শেখানো বুলি কপচায়—বানিয়ে কথা বলতে পারে না।

তাই প্রফেসর গার্ণার ঠিক করলেন আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে বাঁদরদের সঙ্গে থাকবেন। গরিলা আর শিম্পাঞ্জীদের কথা টুকে নেবেন। আমেরিকায় ফিরে এসে বাঁদরভাষার একটা ডিক্সনারী আর গ্রামার লিখবেন।

১৮৯২ সালে আমেরিকা থেকে কঙ্গো এলেন প্রফেসর। বারোই অক্টোবর উঠলেন লিবারভিলের কারখানা বাড়ীতে। তারপর জাহাজে চেপে গেলেন জঙ্গলের ভেতরে একটা ক্যাথোলিক মঠে। সঙ্গে করে একটা লোহার খাঁচা এনেছিলেন। খাঁচাটা বসালেন মঠের কাছেই। হেঁটে গেলে মিনিট কুড়ি লাগত। কিন্তু কয়েক রাত খাঁচায় কাটানোর পরেই অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এলেন মশার কামড়ের জ্বালায়।

বাঁদর ভাষার অভিধান আর ব্যাকরণ তৈরীর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল ঐভাবে। বাঁদরদের কয়েকটা শব্দ অবশ্য জানতে পেরেছিলেন প্রফেসর। যেমন, 'হৌবা' মানে 'খাবার', 'চেনি' মানে 'পানীয়', 'লেগ্‌ক' মানে 'ছাখো'।

ফোনোগ্রাফ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, বাঁদররা হাত কি জিনিস তা বলতে পারে, সময় সম্বন্ধেও কথা বলতে পারে। সব মিলিয়ে ন'দশটা শব্দ। শব্দও ঠিক নয়। রকমারি উচ্চারণ। গলা দিয়ে আওয়াজ বার করার রকমফের। ঐভাবেই নাকি মানুষের এই পূর্বপুরুষরা ব্যক্ত করে মনের কথা।

গবেষণা শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

তখন এগিয়ে এলেন ডক্টর জোহৌসেন। জাতে জার্মান। কিন্তু থাকতেন আফ্রিকায়। নেশায় বৈজ্ঞানিক। জীবতত্ত্ব তাঁর বিষয়। বয়স হলেও স্বাস্থ্য ভাল। ইংরেজী আর ফরাসী বলতে পারেন মাতৃভাষার মত। বিয়ে-থা করেন নি। দেদার টাকা—খাবার কেউ নেই। আত্মীয়স্বজনও নেই। একজন নিগ্রো অনুচর তার নিত্য সঙ্গী।

জার্মান থেকে একটা খাঁচা বানিয়ে আনলেন। তারপর অনেক কাণ্ড-কারখানা করে খাঁচা নিয়ে গেলেন উবাঙ্গীর পাড়ে। সেখানে লোকজন দিয়ে ভেলা বানালেন। লোকজনকে বিদায় দিলেন। একমাত্র অনুচরকে নিয়ে ভেসে পড়লেন উবাঙ্গীর জলে।

কোথায় গেলেন, কেউ তা জানে না।

সেই মানুষটারই নাম খাতার ওপর দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ম্যাক্স, জন আর খামিশ। তিনজনেই জানত ডক্টরের অভিযান কাহিনী। কিন্তু তারপরের কাহিনী জানা ছিল না।

জানা গেল এখন। ডক্টর জোহৌসেন উবাঙ্গীর শাখায় ভেলা ভাসিয়ে এসেছিলেন নির্জন এই নদীতীরে। খাঁচা বসিয়ে বাঁদরদের ভাষা শেখবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তারপর গেলেন কোথায়? খাঁচার দরজা খোলা কেন? উনি সঙ্গে একটা অর্গান এনেছিলেন গান শুনিয়ে বাঁদরদের পোষ মানানোর জন্যে। সে অর্গানটাই বা গেল কোথায়? ডক্টর জোহৌসেনের মাথায় যে ছিট আছে, সবাই তা জানত। কিন্তু অর্গান নিয়ে খাঁচা ফেলে উধাও হওয়ার মত ছিটগ্রস্ত তো ছিলেন না!

খাতা খুলে পড়া হল। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় ডাইরী লিখেছেন ডক্টর। পরের পাতাগুলো সাদা।

ডাইরী শুরু হয়েছে উনত্রিশে জুলাই, ১৮৯৬ সাল থেকে। শেষ হয়েছে পঁচিশে অগাস্ট। মাত্র সাতাশ দিনের কথা অতি সংক্ষেপে লিখেছেন। কাজের কথা তেমন কিছু নেই। ভেলা বানিয়েছেন, জলে ভেসেছেন। সাতদিন পরে মনের মত জায়গায় ভেলা বেঁধেছেন। চারিদিকে মেলা বাঁদর। শিম্পাঞ্জী, গরিলাও আছে। জংলী একদম নেই। নদীতে মাছ বিস্তর। খাবারের অভাব হবে না।

পঁচিশে আগস্ট লিখেছেন ; অনেক জলহস্তী দেখলাম···বিস্তর বাঁদর কাছে এসেছে···কি যেন বলাবলি করছে·· মনে হচ্ছে সত্যিই কথা বলতে পারে··· একটা শব্দ স্পষ্ট বুঝতে পারছি···আঙগোরা···আঙগোরা·· এদেশের ভাষায় তার মানে—মা।

চমকে উঠল জন কর্ট। কাল রাতে আঙগোরা শব্দটাই তো সে শুনেছে। কানের ভুল তাহলে নয়।

লাঙ্গাও বললে, হ্যাঁ, আঙগোরা মানে মা।

খাঁচার আশেপাশে অনেক খোঁজা হল। ডক্টরের হাড়গোড় পাওয়া গেল না।

খাঁচার ভেতরে তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে একটা আংটা পাওয়া গেল। মাটির মধ্যে অর্ধেক পোঁতা। মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে একটা টিনের বাক্স।

টিনের বাক্স! তবে কি ডক্টর জোহৌসেনের হারিয়ে যাওয়ার রহস্য ঐ টিনের বাক্সের মধ্যেই পাওয়া যাবে?

খামিশ তক্ষুনি চাড়া মেরে ভেঙে ফেলল বাক্সের ডালা। ভেতর থেকে পাওয়া গেল একশটা বন্দুকের গুলি!

কম কথা নয়! হাতীর তাড়া খেয়ে গুলির ভাঁড়ার ফেলে আসতে হয়েছে। পকেটের গুলি একদিন ফুরোবেই। হঠাৎ পাওয়া এই একশটা বুলেট পেয়ে তাই আনন্দে নেচে উঠল চারজনেই।

এবার শুরু হল ভাঙা ভেলা মেরামতের পালা। খাঁচার দেওয়াল থেকে থেকে নড়বড়ে, গোড়া-পচা তক্তাগুলো খুলে নিয়ে গেল খামিশ। তাই দিয়েই জোড়াতালা দিয়ে ভেলা মেরামত সাঙ্গ হল সন্ধ্যে নাগাদ।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গিয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছে। ম্যাক্স বললে—"মাংস পোড়া খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে। আজ খাবো মাংস সেদ্ধ। সসপ্যান যখন পাওয়া গেছে—"

খামিশ তখুনি বসে গেল মাংস সেদ্ধ করতে। নুন নেই, মশলা নেই—তাহলেও সেদ্ধ তো! অমৃত মনে হল অভিযাত্রীদের মুখে।

খেয়ে দেয়ে ঘুমোনোর আগে ম্যাক্স বললে—"ওহে জন, ডক্টর জোহৌসেনের নামটা অমর করে রাখতে চাই।"

"কিভাবে?"

"এই নদীর নাম ওঁর নামে দিয়ে।"

"সাবাস!"

সেইদিন থেকে আফ্রিকার অজ্ঞাত অরণ্যের অজ্ঞাত সেই নদীর নাম হয়ে গেল "রিও জোহোসেন"।

৭॥ রিও জোহোসেনের স্রোতে

পরের দিন সকালে ভেলায় চেপে বসল সবাই। সঙ্গে রইল গুলির বাক্স, বন্দুক, সসপ্যান, মগ, কাপ। একধারে কাটকুটো ঘাস সাজানো রইল, দরকার হলে ধুনি জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে নেওয়া যাবে।

ঘণ্টায় আধ মাইল বেগে ভেসে চলল ভেলা। একটা লম্বা কাঠ কেটে লগি বানিয়ে নিয়েছিল খামিশ। এইভাবে গেলে ২৫০ মাইল পথ যেতে লাগবে ২০ থেকে ৩০ দিন।

দুপাশের জঙ্গলে শিকারের অভাব নেই। একটা হরিণ মারা হল ভেলা থেকে গুলি ছুঁড়ে। দড়িতে কাঁটা লাগিয়ে জলে ফেলতে আট-ন পাউণ্ড ওজনের একটা পেল্লায় মাছও ধরা পড়ল।

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া চলছে ভেলার ওপরেই। বৃষ্টিতে ভিজতেও হচ্ছে। বৃষ্টি থামলে চড়া রোদে গা শুকিয়ে নিতে হচ্ছে।

সন্ধ্যে হল। তীরে উঠে এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দিল অভিযাত্রীরা। চার প্রহরে পাহারা দিল চারজনে পালা করে।

পরের দিন সেই একঘেয়ে যাত্রা। বৃষ্টি, রোদ, বন আর বাঁদরের কিচি-মিচি। দুপাশের জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে। গাছের আকারও বড় হচ্ছে। দানবিক চেহারার বিরাট বিরাট গাছ নদীর ওপর দিয়ে রাক্ষুসে ডালপালা মেলে ধরেছে। জলের ওপর দিয়ে রাক্ষুসে হাতের মত ডালপালা এগিয়ে এসেছে মাঝ বরাবর। ওদিক থেকেও এসেছে রাক্ষুসে ডালপালা। মাঝখানে যেন হাতে হাত মিলিয়েছে গাছেরা। ডালে ডালে জড়িয়ে গেছে, লতায় পাতায় মজবুত সাঁকো তৈরী হয়ে গেছে। রাশি রাশি বাঁদর ছুটোছুটি করছে সেখান দিয়ে এপাড় থেকে ওপাড়ে।

আশ্চর্য সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। নদী এখানে খুব চওড়া নয়—বড় জোর পঞ্চাশ গজ। মাথার ওপর সবুজ চাঁদোয়া আর বাঁদরের নাচানাচি।

বাঁদরের সংখ্যাও বাড়ছে। শুধু সংখ্যা নয়, আকার এবং প্রকারও। শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ম্যাণ্ড্রিল, বেবুন, গিবন—সবই দেখা যাচ্ছে। বিশাল চওড়া বুক বাজিয়ে হাঁক ডাক ছাড়ছে। পাড় বরাবর ছুটে চলেছে। চেঁচামেচি শুনে আরো বানর ছুটে আসছে নদীর পাড়ে। বাঁদরে ছেয়ে গেছে দুপাড়। এত বাঁদর বুঝি এই মধ্য আফ্রিকাতেই দেখা যায়। আর কোথাও নয়।

কানে তালা লেগে যাচ্ছে বাঁদরের চীৎকারে। তীক্ষ্ণ চীৎকার আর লম্ফঝম্প দেখে শংকিত হল খামিশ। লোমশ ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শুধু বললে—"হুঁশিয়ার থাকুন।"

হঠাৎ শুরু হল আক্রমণ। হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে বাঁদররা ছুঁড়তে লাগল ভেলার দিকে। মাটি, পাথর, ডাল, এমন কি গাছের ফলও। আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। বৃষ্টির মত দমাদম শব্দে এসে পড়ছে পাথর ফল-গাছ। কপাল ভাল, মারাত্মক চোট লাগছে না। কিন্তু অসম্ভব গায়ের জোর বটে নরবানরদের। অতদূর থেকেই শূন্য পথে ধেয়ে আসছে পাথরগুলো ভেলার দিকে।

ম্যাক্সের গুলিতে একটা গরিলা শুয়ে পড়তেই ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল বানরের দল। আর গুলিকরা সঙ্গত নয়। গুলির ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু বানর ফুরোবে না।

হঠাৎ দেখা গেল দূরে নদী আবার সরু হয়ে এসেছে। আবার গাছে গাছে জটলা জুড়েছে মাথার ওপর চন্দ্রাতপের আকারে। চারটে বড় আকারের গরিলা ওৎ পেতে বসে আছে সেখানে ভেলায় লাফিয়ে পড়ার জন্যে।

"চালান গুলি!" হেঁকে উঠল খামিশ।

তিন জনের তিনটে বুলেটে তিনটে গরিলা ঘায়েল হয়ে পড়ে গেল জলে। বিকট চেঁচিয়ে ছুটে এল আরো বিশটা গরিলা। গাছের ওপর তাদের রুদ্রমূর্তি দেখে বুক কেঁপে উঠল অভিযাত্রীদের।

ভেলা তখন গাছের তলায় এল বলে। দমাদম গুলি চালাল তিনজনে। বেশ কতকগুলো লাশ পড়ল জলে। বাকী গরিলারা পালিয়ে গেল ডাঙায়। নির্বিঘ্নে সাঁকোর তলা দিয়ে চলে এল ভেলা।

আর একটা বিপদ আবির্ভূত হল সামনে। জল চাকার মত ঘুরছে। ঘূর্ণিপাক। মাঝে পড়লে ভেলা উলটোবেই।

লগি দিয়ে প্রাণপনে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করতে লাগল খামিশ। ডাঙায় বাঁদর। জলে ঘূর্ণিপাক। একী বিপদ!

হঠাৎ মেঘ ডেকে উঠল। কড়কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল। আকাশের বিদ্যুৎ দেখলে ইতর প্রাণী মাত্রই শিউরে ওঠে। কালো মেঘের বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই তাই নদীর দুপাশ ফাঁকা হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। চোঁ-চাঁ দৌড় দিল বাঁদর বাহিনী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

হু-হু করে ভেসে চলল ভেলা।

৮ ॥ আঙগোরা !

বাঁদরদের ভয়ে ডানদিকের তীর ঘেঁসে যাওয়া যাচ্ছিল না। ঘূর্ণিপাককে পাশ কাটাতে গেলে ঐ দিকেই একমাত্র পথ। ঈশ্বর তাই মুখ তুলে চাইলে। আচমকা ঝড়-বাদলা-বিদ্যুৎ বজ্রপাত দিয়ে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন পাজী বাঁদরগুলোকে।

পথ পরিষ্কার। ভেলা স্রোতের টানে বিপুল বেগে ধেয়ে চলেছে। ঝড়-বাদলা থামল রাত তিনটের সময়ে। ডাঙায় উঠল অভিযাত্রীরা। ভয় হয়েছিল বোধ হয় বাঁদরগুলো ফের হামলা জুড়বে। কিন্তু ওরা আর এল না। নিশ্চিন্তে রাত কাটাল সবাই।

সকাল বেলাও শাখামৃগদের ল্যাজের ডগা পর্যন্ত দেখা গেল না।

ফেব শুরু হল জলযাত্রা। অপলকা ভেলায় চড়ে খরস্রোতা নদী বেয়ে বিপদ সংকুল অভিযান। পথে হরিণ শিকার করা হল মাংসের ভাঁড়ার খালি হয়ে এসেছিল বলে। তারপরেই জুটল আরেক উৎপাত।

দুপুর নাগাদ সহসা সামনে দেখা গেল জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জলকণা শূন্যে উঠে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার টানে।

"কি ব্যাপার ? আবার ঘূর্ণি নাকি ?" বলল ম্যাক্স।

"মোটেই না।" বলল খামিশ।

আচমকা দুটো জলের ফোয়ারা তেড়ে উঠল দশ ফুট ওপরে।

আঁৎকে উঠল ম্যাক্স—"স রে সর্বনাশ ! আফ্রিকার নদীতে তিমি থাকে নাকি ?"

"তিমি নয়" গম্ভীর ভাবে বলল খামিশ।

জিনিসটা কি, তা দেখা গেল পরক্ষণেই। একটা প্রকাণ্ড মাথা উঠে এল জলের ওপর। রাক্ষুসে হাঁ-য়ের মধ্যে দাঁতের সারি পর্যন্ত দেখা গেল দূর থেকে।

"জলহস্তী ! জলহস্তী !"

হ্যাঁ। জলের বিপদ জলহস্তী আবির্ভূত হয়েছে সামনে। এমনিতে এরা নিরীহ। কিন্তু একবার চটে গেলে আর রক্ষে নেই !

খামিশ বললে—"হুজুররা সটান শুয়ে পড়ুন। জলহস্তী যেন আমাদের দেখতে না পায়।"

বন্দুকবাজি করা সম্ভব নয়। জলে ভেসে জলহস্তীর সঙ্গে পাল্লা কষার মত মজবুত জলযান তো এটা নয়। সুতরাং সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ভেলায়। বেগতিক দেখলেই জলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যেও তৈরী হয়ে রইল।

স্রোতের টানে ভেলা এসে পড়ল জলহস্তীর পাশে। গায়ে গরম নিশ্বাস পর্যন্ত লাগল। কিন্তু জলক্রীড়া নিয়েই তন্ময় হয়ে রইল জলের হাতী—ফিরেও তাকাল না।

সন্ধ্যে নামল। সাতটা নাগাদ ডাঙায় উঠে শোবার আয়োজন করছে সবাই ঘাসের বিছানা বিছিয়ে, এমন সময়ে ডালপালা সমেত একটা মস্ত গাছকে ভেসে আসতে দেখা গেল নদীর জলে। কালকের ঝড়ে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে জলে পড়েছে গাছটা। ডালপালার মধ্যে একটা ক্ষুদে প্রাণীর ছটফটানিও দেখা যাচ্ছে।

ভাসতে ভাসতে উপড়োনো গাছটা পাড়ে বাঁধা ভেলার দিকেই আসছিল। হঠাৎ আরেকটা স্রোতের টানে সরে গেল দূরে। চীৎকারটা শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আর্তকণ্ঠে বিষম হতাশায় কে যেন ককিয়ে উঠল। চীৎকারটা এল ভাসমান গাছের দিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদে প্রাণীটা ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। বেশ বোঝা গেল—লক্ষ্য ডাঙার দিকে।

কিন্তু স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে ডাঙা থেকে দূরে। খাবি খাওয়ার গব্‌গব্‌ শব্দ শোনা গেল। বার কয়েক ডুবে গিয়েও ফের ভেসে উঠল ডুবন্ত জীবটা।

লাঙ্গা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—"আমি যাই…ছেলেটা যে ডুবে যাবে!"

ছেলেটা! দুর্গম আফ্রিকার নদীতে ছেলে আসবে কোত্থেকে?

লাঙ্গা কিন্তু ততক্ষণে লাফিয়ে পড়েছে জলে। সাঁতরে গিয়ে জীবটাকে কোলে করে উঠে এল ডাঙায়।

দেখা গেল, ছেলে নয়—একটা বাঁদরের বাচ্ছা। আসবার পথে যারা হানা দিয়েছিল—তাদের খোকা।

কারও কথা শুনল না লাঙ্গা। আঁকড়ে রইল খোকা বাঁদরকে। সব কথার উত্তরে বলল একটাই কথা—"ছেলে মানুষ—··· দেখতে পাচ্ছেন না?"

রাত এগারোটার সময়ে খোকা-বাঁদরের গলায় স্বর ফুটল। অস্ফুট স্বরে বলল—"আঙগোরা! আঙগোরা!"

মা'কে ডাকছে বাঁদরের বাচ্ছা!

৯॥ উনিশে মার্চ

লাঙ্গা খবরটা কাউকে বলল না। তারও তো মনের ভুল হতে পারে। সত্যি সত্যিই বাঁদর কথা বলতে পারে কিনা, তা না জেনে কাউকে কিছু না বলাই ভাল।

পরদিন সকাল থেকে আবার শুরু হল জলযাত্রা। আজ তেমন কষ্ট হল না। ভেলার ওপরেই একটা ছাউনি তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। জ্বরে অচেতন বাঁদর ছানাকে কোলে নিয়ে লাঙ্গা বসে রইল সেখানে। ঘাসে ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল দিল মুখে। তখন যেন একটু চাঙা হল বাঁদরটা। চোখ বুজেই আবার ডাকল মা'কে—"আঙগোরা! আঙগোরা!"

এবার আর ভুল হল না লাঙ্গার। সত্যিই কথা বলছে বাঁদর ছানা। 'র' অক্ষরটা যেন ঘুরপাক খেয়ে জিভের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ম্যাক্স উঁকি মেরে বললে—"কি হে লাঙ্গা, তোমার বাঁদরের খবর কী?"

"ও তো বাঁদর নয়।"

"তবে কী?"

চুপ করে রইল লাঙ্গা। তারপর বললে—"কাল রাত থেকে ও মা'কে ডাকছে। বলছে, 'আঙগোবা! আঙগোরো!'"

চমকে উঠল জন কর্ট। এই ডাকটাই কিছুদিন আগে রাত্রে শুনেছিল সে। কৌতূহলী হয়ে ভাল করে দেখল বাঁদরছানাকে। দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল দুই বন্ধুর।

এ কি রকম বাঁদব? এর কানেব লতি যে মানুষেব মতই—মাংসল, থলথলে। নাকের পাটাও তাই। মাথায় ভেড়ার লোমের মত বা কাফ্রীদের চুলের মত কোঁকড়নো কুঁচকোনো চুল। মুখে লোম নেই—বেশ চকচকে হাল্কা রঙ। লোম আছে কেবল বুকে, ঊরুতে আর বাহুতে। পায়ের পাতা মানুষের মত যেন ᐟ'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে—বাঁদরের মত নয়। বয়স খুব জোর পাঁচ-ছ বছর। কিন্তু বাঁদরের মত গড়ন নয় মোটেই।

আপশোষ হল চোখ-জোড়া তখনো বন্ধ থাকার জন্যে। চোখ খোলা থাকলেই বোঝা যেত, চাহনির মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে কিনা। মানুষের মত ভাবনার ক্ষমতা আছে কিনা।

জন কর্ট স্তম্ভিত হল একটা সিল্কের সুতো দেখে। গলা ঘিরে বাঁধা সিল্কের সুতোটা থেকে ঝুলছে একটা পয়সার মত নিকেলের মেডেল। মেডেলে লেখা ডক্টর জোহোসেনের নাম। তাঁর ছবিও রয়েছে মেডেলের অপর পিঠে।

ঠিক সেই সময়ে অজ্ঞান অবস্থায় ফের কাৎরে উঠল বাঁদর ছানা—"আঙগোরা! আঙগোরা!"

হতভম্ব হয়ে গেল ম্যাক্স আর জন। শূন্য খাঁচা থেকে ডক্টর জোহোসেনের মেডেল লুঠ করা এক কথা, কিন্তু সেটাকে গলায় বেঁধে রাখা আরেক ব্যাপার। এ কাজ কার? ডক্টরের, না, কথা-কইয়ে বাঁদরের?

আচমকা দূর থেকে শোনা গেল জল নির্ঘোষ। প্রায় পাঁচশ হাত দূরে জলধারা জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে।

দেখতে দেখতে খড়কুটোর মত ভেলা গিয়ে আছড়ে পড়ল প্রকৃতির তৈরী বাঁধের মত একসারি কালো পাথরের ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ভেলা।

শেষ মুহূর্তেও কার্তুজের বাক্স আর বাসনকোসনগুলো বাঁচানোর চেষ্টা করল খামিশ। দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল পাথরের ওপর।

তারপরেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে তলিয়ে গেল ভেলা। যাত্রীরাও ভেসে গেল জলের তোড়ে—লাঙ্গা কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে বাঁদর-বাচ্চাকে আঁকড়ে রাখল বুকের কাছে।

১০ ॥ গাছের তলায়

অন্ধকার নিঃসীম অন্ধকার। রাত কি দিন বোঝা যায় না। মাথার ওপর গাছপালার জমাট বুনুনী– নিশ্ছিদ্র চাঁদোয়া—আকাশের আলোর সাধ্য নেই সেই চাঁদোয়া ফুঁড়ে মাটি ছোঁওয়ার।

গাছ তলায় ঘাসের ওপর লম্বমান তিনটে দেহ। জন ম্যাক্স আর খামিশ মড়ার মত পড়ে আছে। অসীম ক্লান্তিতে তিনজনেই প্রায়-বেহুঁশ। পাশে আগুনের ধুনী জ্বলছে। তারপাশে খানিকটা মোষের মাংস। গতকাল মোষটাকে মেরেছিল ওরা। জল খাচ্ছিল বেচারী। ভেলা থেকে দমদম গুলি চালিয়ে তাকে শুইয়ে দিয়েছিল জন কর্ট। খামিশ নেমে গিয়ে ছাল ছাড়িয়ে অনেকটা মাংস তুলে এনেছিল ভেলায় রেখে-রেখে খাওয়ার জন্যে।

সেই মাংসটাই রয়েছে পাশে। আর কিছু নেই। বন্দুক, গুলি, বাসন-কোসন কিছু নেই। এমন কি নিত্য-সহচর লাঙ্গা-ও নেই। তার বাঁদর বাচ্চাও নেই। তবে কি জলে তলিয়ে গিয়েছে লাঙ্গা? কিন্তু এরা তিনজনে বাঁচল কি করে? কে ওদের জল থেকে তুলে বনের পথে এতদূর নিয়ে এল? সূর্য এখন কোনদিকে? পথ কোথায় বনের মধ্যে? ঘন ঝোপের মধ্যে পায়ে চলা পথ তো দেখা যাচ্ছে না? জঙ্গলের মধ্যে এমন গাঢ় অন্ধকারই বা সম্ভব হয় কি করে? জেলখানাতেও যে এর চাইতে আলো থাকে!

সর্ব-প্রথম চোখ মেলল জন কর্ট। দেখল, আগুন নিভে আসছে। ধড়মড়িয়ে উঠে কিছু শুকনো ঘাস আর কাঠকুটো গুঁজে দিল আগুনে। পটপট শব্দে নতুন তেজে আগুন জ্বলে উঠতেই আওয়াজের চোটে ঘুম ভেঙে গেল ম্যাক্স আর খামিশের।

হতভম্বভাবে তিনজনেই চেয়ে রইল তিনজনের মুখের পানে। এ আবার কী রহস্য? মাথার ওপর দেড়শ ফুট ওপরে প্রকাণ্ড মহীরুহের নিশ্ছিদ্র ছাদ। সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ। বোঝা যাচ্ছে না এটা দিন না রাত। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তিনজনে? একদিন? দুদিন? ভেলা টুকরো টুকরো হয়েছে কবে?

সবচেয়ে বড কথা, লাঙ্গা গেল কোথায়? শেষ পর্যন্ত জলে ডুবেই মারা গেল ছেলেটা? আশ্চর্য, বাঁদর বাচ্চাটাও নিশ্চয় বাঁচে নি। তার মুখের আধো-আধো কথা শোনার সাধও শিকেয় উঠল।

লাঙ্গার জন্যে মন কেমন করতে লাগল তিনজনেরই।

কিন্তু তাদের জল থেকে টেনে তুলল কারা?

জন কর্ট বললে—"জলে ঠিকরে পড়ার ঠিক আগে এক পলকের মধ্যে আমি গোটা বারো ছায়ামূর্তিকে দেখেছিলাম ডাঙার ওপর। আমাদের দেখিয়ে চেঁচাচ্ছিল আর হাত নাড়ছিল। কয়েকজন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আমরা তলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে।"

ম্যাক্স সায় দিলে জনের কথায়। আবছা মত কয়েকটা মূর্তি সে-ও দেখেছে। অত্যন্ত উদার প্রাণ তাদের। তাই জল থেকে টেনে তোলার পর এতখানি বয়ে এনে শুইয়ে দিয়েছে ঘাসের বিছানায়। আগুন জ্বেলে গায়ে সেঁক দিয়েছে। খিদে পেলে খাবার জন্যে মোষের মাংস হাতের কাছে রেখে গেছে।

কিন্তু তারপরেই মিলিয়ে গেছে জঙ্গলের অন্ধকারে। প্রতিদান চায় না বলেই আর ওৎ পেতে বসে :কে নি আশে-পাশে।

খিদে পেয়েছিল খুবই। মাংস সেঁকে খেতে শুরু করল তিনজনে। সব মাংসটা একেবারে খেলে তো চলবে ন। সের খানেক মাংস ভাগাভাগি করে নিল নিজেদের মধ্যে। বাকী মাংস রইল পরে খাওয়ার জন্যে। কাছে বন্দুক নেই। কোমরের ছুরী আর কুঠার ছাড়া কোনো হাতিয়ার নেই। বড় জন্তু মারা আর সম্ভব নয়। ফলমূল খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে এখন থেকে।

তেষ্টা পেয়েছিল খুবই। কিন্তু জল তো নেই। জল খেতে হলে ফিরে যেতে হয় নদীর দিকে। কিন্তু নদী কোন দিকে? সামনে না, পেছনে? ডাইনে, না, বাঁয়ে?

এই সময়ে ঘন ঝোপের আড়ালে একটা ক্ষীণ পথ আবিষ্কার করল খামিশ। ঘাসগুলো দুমড়ে গেছে, ঝোপঝাড়ও তেমন তীক্ষ্ণ নয়। আগাছার মধ্যে কাজ চলা গোছের একটা ফুটপাত।

কোথায় গেছে এ-রাস্তা?

আচমকা একটা আলো জ্বলে উঠল দূরে। শুধু একটা আলো। ঘন আঁধারের মাঝে আগুনের আভা। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অভিযাত্রীদের।

জংলী নাকি? না, আলেয়ার আলো? আলোটা তো কাঁপছে না! ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একজায়গায়।

ফিস ফিস করে বলল জন—"কি করি বলো তো?"

খামিশ বললে—"চলুন, এগোই।"

ওরা পা বাড়াল পথের ওপর। কী আশ্চর্য! সামনের আলোটাও সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল। এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

তিন ঘণ্টা এক নাগাড়ে ছুটন্ত আলোর পেছনে ছুটে চলল তিনজনে। শেষকালে বেদম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই রহস্যজনক আলোটাও থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তাই দেখে ম্যাক্স বললে—"আরে! এ যে দেখছি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে!"

জন বললে—"ভালোই তো। জঙ্গলের গোলকধাঁধা থেকে বাইরে নিয়ে গেলে পেছনে ছুটতে আপত্তি নেই আমার।"

সারা বিকেলটা এইভাবে ছুটে চলল ওরা। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ হঠাৎ নিভে গেল ভুতুড়ে মশাল।

জন বললে—"বুঝলে? আমাদের জিরেন নিতে বলছে।"

"হুকুম করছে বলো।" বললে ম্যাক্স।

মাংস পুড়িয়ে খেয়ে নিল তিনজনে। কাছেই ঘাসের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জমা জলের ধারা বইছিল। আঁজলা করে সেই জলপান করল সবাই।

মুখ মুছতে মুছতে জন বললে—"এখন বুঝছি, তেষ্টার সময়ে যাতে জল পাই, তাই অদৃশ্য বন্ধু এখানেই থামতে হুকুম দিয়েছে আমাদের।"

ক্লান্তিতে শরীর আর বইছিল না। টান-টান হয়ে শুতে না শুতেই রাজ্যের ঘুম নামল চোখে।

পরের দিন বাইশে মার্চ। অব্যাহত রইল পদযাত্রা। রাতের নিভে যাওয়া মশাল ফের জ্বলে উঠেছে সকাল হতেই। রাত নামতেই ফের নিভে গেল মশালের আলো। শেষ মাংসটুকুও খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনে।

সবার ঘুম ভাঙল জন কর্টের। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে—"একী! কে এসেছিল এখানে?"

ঘুম ভেঙে গেল ম্যাক্স আর খামিশের। অবাক হয়ে দেখলে মাথার কাছে রয়েছে অনেকখানি হরিণের মাংস। সেই সঙ্গে জ্বলছে আগুনের কুণ্ড!

নিশ্চয় কেউ এসেছিল ওদের ঘুমের সময়ে। আগুন জ্বালিয়ে মাংস রেখে গেছে মাথার কাছে।

ক্ষিদেব চোটে নাড়িভূঁড়ি পর্যন্ত হজম হতে বসেছিল। মাংস পুড়িয়ে তক্ষুনি খেয়ে নিল তিনজনে। সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবির্ভূত হল সেই মশাল। দুলে উঠল সংকেত করল এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

শুরু হল ফের পদযাত্রা। দিনের শেষে হিসেব করে দেখা গেল এই তিন দিনে রিও জোহোসেন থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ এসেছে অভিযাত্রীরা। এসেছে পুব দিকে—অথচ ওদের যাওয়া উচিত ছিল দক্ষিণ-পুব দিকে। গাছপালা পাতলা হয়ে আসছে। মাথার ওপরকার ঘন যবনিকা দিয়ে আকাশ চোখে পডছে।

রাত নামতেই মশাল নিভে গেল। ওরাও খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ম্যাক্সের মনে হল মাথার ওপরে কোথায় যেন অর্গান বাজছে।

১১॥ গাছের আগায় আজব গ্রাম

পবেব দিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর মনে হল অন্ধকার আগের চাইতেও গাঢ। দিন কি রাত বোঝা মুস্কিল। মাথাব ওপব প্রায় শখানেক ফুট ওপরে যেন একটা মঞ্চ পাতা বয়েছে গাছের ডালেব ওপর দিয়ে। যতদূর চোখ যায়, ছাদটাব চেহারাই কেব- চোখে পডে। আর কিছু না। শোনা যাচ্ছে শুধু একটা অদ্ভুত গুমগুম শব্দ। শব্দ নামছে মাথাব ওপরকার ছাদ থেকে।

পায়ের তলায় নরম ঘাসের গালিচা। আসবার সময়ে কাঁটা ঝোপে পা দেওযা যাযনি—সরু রাস্তা ছেডে এক ইঞ্চিও এদিকে ওদিকে যাওয়া সম্ভব হয নি। কিন্তু সেই বিশ্রী আগাছার চিহ্নমাত্র নেই এখানে। গাছগুলো সবই দানব আকারের। বিশ তিরিশ ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে এক-একটা গুঁডি। ঠিক যেন বড বাড়ীর থাম। থামের ডগা অর্থাৎ গুঁডির মাথায় সেই আশ্চর্য মঞ্চ। তারও ওপর থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত গুমগুম আওয়াজটা!

বাওয়াব গাছগুলোর পরিধি কম করেও বিশ থেকে তিরিশ গজ। গুঁড়ি ঘিরে ঝুলছে অসংখ্য ঝুরি। সিল্ক তুলো গাছের গুঁড়িগুলো মনে হচ্ছে ফোঁপরা—মানুষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। মেহগনীর গুঁড়ির ব্যাস কম করেও তিন থেকে সাড়ে চারফুট। মানে একটা মেহগনীর গুঁড়ি কাটলেই আস্ত একটা ক্যানো নৌকো তৈরী হয়ে যাবে।

কিন্তু এ কোথায় এল অভিযাত্রীরা? কোথায় সেই রহস্যজনক আলো? আলো নেই, সঙ্গের খাবারও ফুরিয়েছে। তবে কি এবার না খেয়ে মরতে হবে? ম্যাক্স মুষড়ে পড়ল খুবই।

অভয় দিয়ে বললে খামিশ—"ঘাবড়াবেন না। আমরা এসে গেছি।"

"কোথায়?" শুধোলো জন কর্ট।

"যেখানে মশালধারী নিয়ে আসতে চেয়েছে আমাদের।"

কথাটার কোনো মানে বোঝা গেল না। জন কর্টের প্রশ্নের জবাব এরকম হওয়া উচিত নয়। মশালধারী একটানা ঘাটঘণ্টা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে পুব দিকে। কিন্তু কোথায়?

খামিশ ছটফট করছিল। সমানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল আলোটার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। হঠাৎ চমকে উঠল একটা ক্ষুদে ছায়ামূর্তি দেখে। সূর্য উঠছিল সে সময়ে। ফিকে আলোয় পাতলা হয়ে আসছে বনের অন্ধকার। সেই আলো আঁধারির মধ্যে দেখা গেল একটা বামন মূর্তি ছুটে ছুটে খেলা করছে।

কিছুক্ষণ পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল বামনের চেহারা। সেই আশ্চর্য বাঁদরটা। লাঙ্গা যাকে বুকে জড়িয়ে জলে ঠিকরে পড়েছিল। তবে কি লাঙ্গাও বেঁচে আছে?

হঠাৎ জন কর্টের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভেলার ওপরে বাঁদরের গলায় মেডেল দেখে সুতো কেটে মেডেলটা খুলে নিয়েছিল সে। পকেটে ছিল লকেটটা। এখন বের করে নাড়তে লাগতে মাথার ওপর।

বামন মূর্তির নজর পড়ল মেডেলের ওপর। অস্ফুট চীৎকার করে অবিকল মানুষ খোকার মতই দৌড়ে এল বাঁদর খোকা।

ঝপ করে খামিশ চেপে ধরল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার গলায় হেঁকে উঠল বাঁদর বাচ্চা:

"লি-মাই···আঙগালা···আঙগালা!"

শব্দগুলোর মানে কি বোঝবার আগেই আচম্বিতে আবির্ভূত হল আরো কয়েকটা বাঁদর। আকারে বড়, কিন্তু দেখতে প্রায় একই রকম। অতিশয় বলবান। অভিযাত্রীদের নিমেষ মধ্যে চেপে ধরল দুপাশ থেকে এবং ঠেলে নিয়ে চলল সামনের দিকে।

কিছুদূর যেতে না যেতে গায়ে-গায়ে লেগে থাকা দুটো গাছের সামনে পৌঁছোলো সবাই। এ-গাছের ডালগুলো মাটির খানিক ওপর থেকেই সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে ওপর দিকে। অর্থাৎ ডালগুলো পাশাপাশি এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যে পা রেখে রেখে দিব্বি উঠে যাওয়া যায় ওপরে।

ওরাও উঠল সেইভাবে। কিছুদূর ওঠবার পরেই মাথার ওপরকার সেই আশ্চর্য মঞ্চ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল তারও ওপরে। চোখের সামনে ভেসে উঠল আশ্চর্য এক দৃশ্য।

মঞ্চ, মানে ডালে-ডালে কাঠ বাঁশ ঘাসপাতা মাটি বিছিয়ে বিরাট একটা সমতল জমি তৈরী করা হয়েছে মাটি থেকে একশ ফুট উঁচুতে। গাছের ডগাগুলো উঠে রয়েছে আকাশের দিকে। একরকম হলদে মাটির তৈরী কুঁড়েঘর সাজানো রয়েছে রাস্তার দুপাশে। গ্রামটা এতবড় যে শেষে দেখা যাচ্ছে না।

ক্ষুদে মর্কটের মত দেখতে বিস্তর মর্কট যাতায়াত করছে রাস্তা দিয়ে। ঠিক মানুষের মত হাঁটছে—মর্কটের মত নয়। জাভার জঙ্গলে পিথিকানথ্রোপাস দেখে ডক্টর ইউজীন ডুবয় তার নাম দিয়েছিলেন ইরেকটাস্। নামটা এদেরই মানায়। বৈজ্ঞানিকরা ডক্টর ডুবয়ের আবিষ্কারকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ডারউইনের তত্ত্ব পড়ে জানা যায় না, মানুষ আর মর্কটের মাঝে আর কেউ ছিল কি না। প্রকৃতি ধাপে ধাপে এগোয়। কখনও ধাপ টপকে লাফিয়ে যায় না। পিথিকানথ্রোপাস ই সেই যোগসূত্র—মানুষ আর মর্কটের মাঝামাঝি অবস্থার প্রাণী।*

ম্যাক্স হিউবার বলে উঠল—"কি রকম উদাসীনভাবে চলে যাচ্ছে দেখো ব্যাটারা। বকর-বকর করছে—ফিরেও তাকাচ্ছে না। মানুষ নামক চিড়িয়া আগে দেখেছে মনে হচ্ছে।"

বোধ হয় দেখেছে। তাই তিন তিনটে দুপেয়ে মানুষকে নিয়ে কারো ঔৎসুক্য দেখা গেল না। আকারে এরা বেশ বড়-ই। বোর্নিওর ওরাং, শিম্পাঞ্জী আর গ্যাবুনের গরিলার চাইতে উন্নত শ্রেণীর জীব সন্দেহ নেই। কথা বলতে জানে, আগুন জ্বাল ত জানে, গ্রাম বানিয়ে থাকতেও জানে। এতক্ষণে বোঝা গেল বনের ধারে সেই আশ্চর্য আলোগুলোর নাচানাচির রহস্য। হাতীর পাল যে জঙ্গলে ঢুকতে পারে নি, সেই জঙ্গলেই রাত দশটার পর থেকে মশাল জ্বলেছিল। তারপর কাউকে দেখা যায় নি। নিশ্চয় এরা-ই ঘুরঘুর করছিল বনের কিনারায়। হাতী দেখেই সটকেছে।

*ডক্টর ডুবয় ওলন্দাজ সামরিক বাহিনীর ডাক্তার। থাকতেন বাটাভিয়ায়। ইনি একটা খুলি, একটা উরুর হাড় আর একটা দাঁত পেয়েছিলেন সুমাত্রার জঙ্গলে। দাঁতের ফুটো গরিলার দাঁতের ফুটোর চেয়ে বড়, কিন্তু মানুষের দাঁতের ফুটোর চেয়ে ছোট। মানুষ হওয়ার আগে মর্কট যা হয়েছিল, এ-দাঁত নিশ্চয় সেই নিখোঁজ প্রাণীর দাঁত।—জুল ভের্ণ

ওরাং শব্দটার মানে বনের মানুষ অর্থাৎ বন-মানুষ। এ নাম শুধু এদেরকেই মানায়।

তিনজনকে ঠেলতে ঠেলতে ওরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে বলে গেল। পাহারা রইল দোর গোড়ায়।

আচমকা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল লাঙ্গা। হৈ-হৈ করে উঠল তিনজনে। উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলে শোনা গেল লাঙ্গার কাহিনী।

এরা মানুষ—মর্কট নয়।

এদের নাম ওয়াগদিস। গ্রামের নাম আঙ্গালা। জলে ভেসে আসা সেই বাঁদর-খোকার নাম লি-মাঙ্গ। জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল লি-মাঙ্গ। খুঁজতে বেরিয়েছিল গ্রামের বেশ কয়েকজন। লি-মাঙ্গয়ের বাবা এ গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সুতরাং লি-মাঙ্গয়ের খোঁজে জঙ্গল চষে ফেলেছিল সবাই। এমন সময়ে দেখল জলের তোড়ে ভেলা ভেসে যাচ্ছে।

ওরাই জল থেকে টেনে তোলে সবাইকে। লি-মাঙ্গকে কোলে নেয় ওর মা। লাঙ্গা ছিল লি-মাঙ্গয়ের বাবার কোলে। বিপুল বেগে জঙ্গল পেরিয়ে গতকাল সকালে গ্রামে পৌঁছেছে ওরা। লি মাঙ্গ অনাহারে ধুঁকছিল। পেটে খাবার-দাবার পড়তেই চাঙা হয়ে উঠেছে।

এই পর্যন্ত শুনেই ম্যাক্স বললে—"কিন্তু আমরা যে খিদের জ্বালায় মরতে বসেছি লাঙ্গা।"

লাঙ্গা আর দাঁড়ালো না। ছুটল বাইরে। ফিরে এল একটু পরে। সঙ্গে এনেছে নুন মাখানো মোষের মাংসপোড়া, কলা, অন্যান্য ফল, ফলের রস মেশানো এক মগ জল।

কথাবার্তা বন্ধ রইল কিছুক্ষণ। পেটের জ্বালা কমবার পর জন কর্ট জিজ্ঞেস করল—"লাঙ্গা, এ গাঁয়ে কত ওয়াগদিস আছে?"

"অনেক।"

"নীচের মাটিতে যায় না?"

"যায় বৈকি। ফলমূল জল আনতে যায়।'

"কথা বলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু বুঝতে পারি না।"

"লি-মাঙ্গয়ের বাবা-মা?"

"ভীষণ ভালবাসে আমাকে।"

"এ-গাঁয়ের মোড়ল কে?"

"দেখিনি। নাম শুনেছি।"

"কি নাম ?"

"মসেলো টালা-টালা।"

"এ তো আমাদের ভাষা," চমকে উঠল খামিশ।

"মানে কী ?"

"ফাদার লুকিং গ্লাস।"

চশমাধারী চাবচোখোদের এই নামেই ডাকে কঙ্গোর কাফ্রীরা।

১২॥ ওয়াগদিস

ম্যাক্সের স্বপ্ন তাহলে সত্যি হল ? জঙ্গলের মধ্যে আশ্চর্য কিছু একটা আবিষ্কারের সাধ ছিল তার গোড়া থেকেই। ফরাসী তো, একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ। রহস্যধূসর উবাঙ্গী অরণ্যে আশ্চর্য জনপদ, নবীন মানব, বিচিত্র প্রাণী দেখার জল্পনা জপে এসেছিল মনে মনে। সবই পাওয়া গেল ওয়াগদিসদের রাজা মসেলো টালা-টালা'র রাজত্বে।

একটা ব্যাপার এখনো বোঝা যাচ্ছে না। ওরা কি খাঁচায় বন্দী, না মুক্ত ? গাছের আগায় আজব গ্রামে ওদের ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা হয়েছে বটে, খারাপ ব্যবহার কেউ করেনি। এখন খাঁচায় পুরে না রেখে ছেড়ে দিলেই ভাল হত না ? একটু ঘুরেফিরে আশ্চর্য গ্রামটা দুচোখ ভরে দেখা যেত।

ওদের এই অভিলাষ মেটানোর জন্যই যেন সহসা দরজা খুলে ভেতরে এল লি-মাঙ্গ। সটান ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাঙ্গার কোলে। দেখা গেল, দিব্বি ভাব জমেছে দুটিতে।

দরজা খোলা। ম্যাক্স আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ওয়াগদিসরা ওদের খুব একটা পাত্তা দিল না। ব্যস্ত রইল যে-যার কাজ নিয়ে। গ্রামটা চৌকোণা। প্রকাণ্ড গাছের ডালের ওপর আরও কাঠকুটো মাটি ফেলে দিব্বি সমতল করে তোলা হয়েছে। মাটি থেকে একশ ফুট উঁচুতে দারুণ মজবুত একটা মঞ্চ। গাছের মাথাগুলো মঞ্চ ফুঁড়ে ঝাঁকড়া মাথা মেলে ধরেছে আরো ওপরে। মঞ্চটা লতাযপাতায় এত মজবুত যে এত প্রাণীর যাতায়াতেও কাঁপছে না একটুও।

ওদের দেখে শুধু ফিরে চাইল ওয়াগদিসরা। কিন্তু কৌতূহল দেখালো না। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। জন্তুরা যেভাবে অর্থহীন আওয়াজ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, সে-ভাবে নয়। এদের ভাষায় স্পষ্টই

উচ্চারণ আছে। জিভ নাড়িয়ে শব্দকে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার করতে হচ্ছে। আজোরা শব্দটা শোনা গেল বেশ কয়েকবার। কয়েকটা কঙ্গো শব্দ, এমনকি দুটো তিনটে জার্মান শব্দ-ও বলতে শোনা গেল ওদের। যেমন, ভ্যাটার—যার মানে 'বাবা'। জন কর্ট অবাক হয়ে গেল বাঁদরদের মুখে জার্মান বুকনি শুনে।

ওরা চলেছে লি-মাঙ্গীয়ের পেছন-পেছন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে আগে আগে ছুটছে লি-মাঙ্গী। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে লাঙ্গাকে। তবু উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়। নবাগতদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই যেন ও এসেছে।

মর্কট-মানবরা উলঙ্গ নয় মোটেই। আফ্রিকার কাফ্রীদের মত গাছের বাকল পরেছে কৌপিনের মত। মাথা সুগঠিত, মর্কটদের খুলির মত ছোট হলেও মানুষের খুলির মত গড়নপেটন। মুখটা দেখলে মানুষ বলেই মনে হয়। জন্তুদের মত চোয়াল সর্বস্ব মুখ নয় মোটেই। সব মর্কটের ভুরু কার্নিশের মত ঠেলে বেরিয়ে থাকে। কিন্তু এদেব ভুরু সেরকম নয়। চিবুকে দাড়ির আভাস আছে। গায়ের পাতলা লোম আফ্রিকার কাফ্রীদের মতই ফিনফিনে। পায়ের পাতা মানুষের মত—মর্কটের মত নয়। বাঁদরদেব পা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার উপযোগী হয়। পায়ের পাতা সমানভাবে ফেলতে পারে না। ঐজন্যে আঙুলে ভর দিয়ে দুলে দুলে হাঁটে গরিলা-শিম্পাঞ্জী-ওরাংওটাং। ওয়াগদিসরা হাঁটছে অবিকল মানুষের মত। ল্যাজ পর্যন্ত নেই—যা সব বাঁদরের আছে।

উঁচু জাতের মর্কটদের সঙ্গে ওয়াগদিসদের মিলও আছে। যে মর্কট সোজা হয়ে হাঁটে, তারা কম বাচাল হয়। বেশী গম্ভীর হয়। ওয়াগদিসরাও তাই। বাচালতা নেই। গাম্ভীর্য আছে।

ভট নামে এক বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, নিগ্রিটোস মানবের পূর্বপুরুষ, চওড়া চোয়াল শিম্পাঞ্জী ওরাংওটাং নিগ্রোদের পূর্বপুরুষ, আর কপাট-বক্ষ গরিলারা শ্বেত মানবের পূর্বপুরুষ।

ভট-য়ের এই উদ্ভট তত্ত্ব অনেকে মেনে নিতে পারে নি। মানুষের মগজে এককোটি বিশ লক্ষ কোষ আছে। বাঁদরের মগজে নিশ্চয় তা নেই। ওয়াগদিসদের মগজে অত কোষ না থাকলেও মগজের গড়নটা যে অনেকটা মানুষের মত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্ম, বিজ্ঞান, চারুশিল্প, সাহিত্যে মানুষের সমকক্ষ না হলেও তাদের অ-মানুষ বলা চলে না কোনমতেই।

ওয়াগদিসরা যে কথা কইতে বিলক্ষণ পটু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে, এদের ব্রেন আছে এবং সেই ব্রেনে পুরোনো স্মৃতি জমা থাকে। কথার উৎপত্তি হচ্ছে সেই জমা স্মৃতি থেকে।

বড় বড় চোখ করে এইসব দেখছিল ম্যাক্স। অবাক হচ্ছিল গ্রামের চেহারা দেখে। গ্রামটা কত বড়? ঠিক যেন একটা পাখীর বাসা। দু'মাইল বড় পাখীর বাসা!

বাসার মধ্যে মর্কট-মানবদের কুঁড়ে। দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত। মেয়েরা গেরস্থালী নিয়ে ব্যস্ত। অগুন্তি বাচ্ছাকাচ্চা খেলছে অথবা মায়ের দুধ খাচ্ছে। পুরুষরা ফলমূল জল সংগ্রহ করে আনছে। পশুপাখী শিকার মাংস বয়ে তুলছে।

ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর গ্রামের ধারে পৌছোলো ওরা। সামনেই একটা বড়সড় কুঁড়ে। প্রকাণ্ড গাছের ফাঁকফোকরে সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত। এতবড় কুঁড়ে যে ছাদটা হারিয়ে গেছে গাছের পাতার আড়ালে।

কার কুঁড়ে? ভূতের ওঝার নয় তো? আফ্রিকার জংলীদের তটস্থ করে রেখেছে তো এরাই। তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁক দিয়ে বশে রেখেছে দুর্দান্ত জংলীদের। এ-কুঁড়েও কি তাদেরই একজনের?

ম্যাক্স হনহনিয়ে ঢুকতে গিয়েছিল ভেতরে—ছুটে এসে পথ আটকালো লি মাঙ্গ। সভয়ে বলে উঠল—"মসেলো টালা-টালা·· মসেলো টালা-টালা!"

বটে! ওয়াগদিসদের মহামান্য রাজা মহাশয়ের আস্তানা তাহলে এইখানেই! বিশাল এই কুটির আসলে তারই রাজপ্রাসাদ! লি-মাঙ্গকে সরিয়ে দিয়ে রাজা বাহাদুরকে দেখতে গিয়েছিল ম্যাক্স, কিন্তু দ্বাররক্ষী দুজন লোহাকাঠের কুঠার তুলে পথ আগলে দাঁড়াতেই পেছিয়ে এসেছিল ভয়ের চোটে।

লি-মাঙ্গ ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁয়ের আরেক প্রান্তে। বড়-বড় গাছের জটলা সেখানে। মাঝে একটা নিরিবিলি কুটির। কলাপাতার ছাউনী। দরজাটাও কলাপাতার—লতা দিয়ে বাঁধা।

ভেতরে একখানা বড় ঘর। কোণে ঘাসের বিছানা। পাথরের উনুন। কাঠ জ্বলছে উনুনে। বাসনপত্র বলতে মাটির মগ, গামলা, কলসি। জল ভর্তি রয়েছে কলসিতে। তাকের ওপর ফলমূল, রান্না করা মাংস, গোটা কয়েক ছাল ছাড়ানো পাখীর কাঁচা মাংস। আরেক দেওয়ালে কাঁটা থেকে ঝুলছে গাছের বাকল।

ওরা ঢুকতেই মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল একজন মর্কট-মানব ও মর্কট-মানবী—ওয়াগদিস পুরুষ ও নারী।

লি-মাঙ্গ সোল্লাসে বললে—"আঙগোরা! আঙগোরা!…লো-মাঙ্গ!… লো-মাঙ্গ!"

অর্থাৎ এই আমার মা· ·এই আমার বাবা! জার্মান ভাষায় 'বারা' শব্দটাও যাচ্ছেতাই ভাবে উচ্চারণ করল কয়েক বার। মর্কট-মানবের জিভে জার্মান শব্দ বেরিয়েছে, এই যথেষ্ট!

লাঙ্গা দৌড়ে গেল লি-মাঙ্গয়ের মায়ের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল লিমাঙ্গ জননী। চোখে-মুখে স্নেহ ফুটে উঠল। সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলে মানুষ-মায়েরাও এমনি স্নেহকোমল হয়ে ওঠে।

জন কর্ট খুঁটিয়ে দেখছিল বাপ আর মাকে। প্রথমজন রীতিমত বলিষ্ঠ। দ্বিতীয়জন দিব্বি ছিমছাম। ঝকঝকে দাঁত। পরিষ্কার মুখ আর গায়ের রঙ। মাথার চুলে ফুল, কাচ আর হাতীর দাঁতের টুকরো। গলায় ঝুলছে ডক্টর জোহোসেনের নাম ও মূর্তি খোদাই করা একটা মেডেল।

জন কর্ট অনেক চেষ্টা করল আলাপ জমাতে। কিন্তু ওদের কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না।

আঙ্‌গা, আম্‌গ্‌ আর আম্‌স্‌—এই তিনটে ধ্বনি দিয়েই যেন তৈরী এদের সমস্ত ভাষা। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু কঙ্গো শব্দ আর জার্মান শব্দ।

মিনিট পনেরো রইল ওরা। ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ন করল লো-মাঙ্গ আর লা-মাঙ্গ—লি-মাঙ্গয়ের বাবা আর মা। তারপর মর্কট-মানবদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বাসায় ফিরে এল জন আর ম্যাক্স। খামিশ বেচারী হ্যাণ্ডশেক করতে পারল না কিছুতেই। জন্তুর থাবা ধরা যায়, বাঁদরের আঙুল ছোঁয়া যায়। কিন্তু বাঁদর-মানুষের হাত ধরতে গেলেও যে গা শিউরে ওঠে!

১৩॥ একুশ দিনের পর্যবেক্ষণ

লাঙ্গাকে পেছনে নিয়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে। দেখল, ঘরদোর পরিষ্কার করছে একজন ওয়াগদিস্‌। নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে নিজের নামটাও বলল সে—"ক্যেল্লো…কোল্লো!"

বেশ্‌ বোঝা গেল, অতিথি সংকারে কোনো ক্রটি রাখতে রাজী নয় ওয়াগদিসরা। তাই কোল্লো-কে চাকর হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যেই চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে ঘাসের বিছানা পেতে ঘর সাজিয়ে ফেলেছে সে।

নাঃ, ওয়াগদিসরা আর যাই হোক, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইতর প্রাণীদের মত নয় মোটেই। সারা গ্রামটা ঝকঝক তকতক করছে ওদের হাতের গুণে।

সব তো হল, কিন্তু এ-গ্রামেই কি বাকী জীবনটা কাটাতে হবে? ম্যাক্স পর্যন্ত অধীর হয়ে উঠল। আশ্চর্য আবিষ্কারের নেশা ছুটে গেল মন থেকে। তেড়েমেড়ে বললে—"চারচোখো মসেলো টালা-টালা'র সঙ্গে দেখা হলে এক হাত নিতাম। তার মত নিয়েই সটকান দিতাম।"

জন কর্ট কিন্তু ধড়ফড় করতে রাজী নয় মোটেই। আশ্চর্য জীবদের আরো কাছ থেকে সে দেখতে চায়। বিজ্ঞান-জগৎকে তাক লাগিয়ে দেবার মত রসদ সংগ্রহ করতে চায়। ম্যাক্স কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত জনের সংকল্প শুনলেই। সে তো আর জোহোসেন নয়, গার্ণারও নয়। খাঁচায় বন্দী থাকতে যাবে কেন?

ঘরে আটক রাখলেও ওয়াগদিসরা ওদের বন্দুক আর কার্তুজের বাক্স ফিরিয়ে দিয়েছে। ভেলা ভেঙে যাওয়ার আগেই পাথরের গায়ে বুলেটের বাক্স আর বন্দুকগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ছিল খামিশ। ওয়াগদিসরা সেগুলো বয়ে এনে সাজিয়ে রেখেছে ঘরের কোণে।

দিন যায়। ঘরের মধ্যে থেকে বেরোলেও গাঁয়ের নীচে নামতে পারে না কেউই। সে পথ বন্ধ। সেখানে একজন ষণ্ডামার্কা ওয়াগদিস পাহারা দেয় বেশ কয়েকজন সাগরেদ নিয়ে। নাম তার র‍্যাগি। অষ্টপ্রহর গাছের ডালের সিঁড়ি আগলে থাকাই তার কাজ। গোটা গাঁয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তার ওপরে।

একদিন ঐ পথে সটকান দিতে গিয়ে খামিশের সঙ্গে দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি লেগে গেল র‍্যাগির। চেঁচামেচিতে ছুটে এল লো-মাঙ্গি। তার সঙ্গেও একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেল র‍্যাগির। বেশ বোঝা গেল, লো-মাঙ্গিয়েরও সাধ্য নেই র‍্যাগির ওপর খবরদারি করার।

কি আর করা যায়। গায়ের মধ্যেই ঘুর-ঘুর করত ওরা। দেখত ওয়াগদিসদের ধরণধারণ আচার-আচরণ। এদের মনে মায়া-মমতা আছে। অপরাধবোধ আছে। চুরি করে ধরা পড়লে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। লজ্জা পেলে লাল হতে জানে। কিন্তু ধর্ম কি জিনিস তা জানে না। ঈশ্বর বলতে বোধহয় ঐ মসেলো টালা-টালা ছাড়া আর কাউকে মানে না। জানলে তো মানবে।

তবে হ্যাঁ, এদের চোখের ধার আছে। ভালো শিকারী ঐ জন্যেই। উড়ন্ত পাখীকে তীর-ধনুক দিয়ে নামিয়ে আনতে পটু।

চাষবাস কি জিনিস, তা এরা জানে না। শস্য ফলিয়ে খেতে শেখেনি। খায় ফল-মূল, মাছ-মাংস।

আগুন জ্বালে দুটো চকমকি ঠুকে। এক রকমের ফলের শুকনো ধোঁয়া

গুলো দপ করে জলে ওঠে চকমকির ফুলকিতে। সেই আগুনে মাংস ঝলসে খায় বা জলে ফুটিয়ে নেয়।

মাছ ধরে নদী থেকে। গাঁয়ের নীচেই তিরিশ চল্লিশ হাত চওড়া একটা নদী আছে। কে জানে রিও জোহোসেনের শাখা কিনা। নদীর পাশে কয়েকটা কুঁড়ে বানিয়ে রেখেছে ওয়াগদিসরা। ঐ হল ওদের বন্দর। গুঁড়ি কেটে কয়েকটা নৌকোও বানিয়েছে। ক্যানো আর ভেলার মাঝামাঝি দেখতে নৌকোগুলিকে। দাঁড় বেয়ে নদীতে নৌকো চালিয়ে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে আনে। তারপর জলহস্তী আর কুমীরের হামলা থেকে নৌকো বাঁচানোর জন্যে তুলে রাখে বন্দরে।

গাঁয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্য বহুবার দেখেছে জন, ম্যাক্স আর খামিশ। একবার যদি নীচে নামা যেত। উধাও হওয়া যেত নদী বেয়ে। কিন্তু সে গুড়ে বালি ঐ র‍্যাগির জন্যে।

একদিন একটা অনর্থ ঘটল। দারুণ হট্টগোল শোনা গেল নীচে। ব্যাপার কী? জংলীরা আকাশ-গ্রাম আক্রমণ করল নাকি! তাহলেই তো সর্বনাশ! গাছের গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেই তো দাউ দাউ করে ছাই হয়ে যাবে আশ্চর্য এই জতুগৃহ!

টপাটপ করে জনা তিরিশ সঙ্গী সাথী নিয়ে র‍্যাগি নেমে গেল নীচে। অবিকল বানরের মত সেই ক্ষিপ্রতা দেখবার মত। গাঁয়ের প্রান্তে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্স-জন-খামিশ। দেখল জলহস্তীর মত বিরাট একদল প্রাণী দুপদাপ করে উঠে আসছে জল থেকে। সামনে যা পাচ্ছে তাই চুরমার করে দিচ্ছে।

শুরু হল লড়াই। বর্শা আর কুঠারের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে রণে ভঙ্গ দিল প্রকাণ্ড প্রাণীরা। লাল হয়ে গেল নদীর জল।

বন্দুক ছুঁড়ে বাহাদুরি নেওয়াব লোভ সামলে নিল জন কর্ট। বলল— "এখন বন্দুক ছুঁড়ে বিদ্যুতের খেলা দেখালে ওরা হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। এ খেলা দেখাবো শেষ সময়ে—এখন নয়।"

ম্যাক্স খুশী হল এ-কথায়। সত্যিই তো! বজ্রের খেলা শুরু হবে চরম মুহূর্তে—মসেলো টালা-টালা'র পিলে চমকে দেওয়া যাবে'খন।

১৪॥ রাজা মসেলো-টালা-টালা

সেদিন ছিল পনেরোই এপ্রিল। বিকেলের দিকে হঠাৎ সেজেগুজে লি-মাঈ তার বাপ-মা'কে নিয়ে হাজির হল জন-ম্যাক্স খামিশের কুঁড়েতে। আসা যাওয়া কোনো দিনই বন্ধ হয় নি। কোনো দিন এরা যেত—কোনোদিন

ওরা আসত। কিন্তু আজকের সাজগোজ বিশেষ ধরনের। লি-মাঙ্গীয়ের বাবার মাথায় পাতার টুপী, গায়ে গাছের বাহারি পোশাক। মায়ের চুলে সবুজ পাতা গোঁজা, গলায় কাচ আর ধাতু খণ্ডের মালা। এমন কি পুঁচকে লি-মাঙ্গীও গাছের ছালের কৌপিন পরেছে।

"ব্যাপার কী? উৎসবের পোশাক মনে হচ্ছে?" অবাক হল ম্যাক্স। জন কর্ট বললে—"ধরেছো ঠিকই। পুজো-টুজো আছে মনে হচ্ছে। ভালই হল। ঠাকুর দেবতায় এদের ভক্তি আছে কিনা জানা যাবে।"

লো-মাঙ্গী কি বুঝল ভগবান জানেন। বলে উঠল—"মসেলো-টালা টালা··।"

"তাই নাকি? মসেলো-টালা-টালা আজ দেখা দেবে?" সোল্লাসে বললে ম্যাক্স। "চশমাধারী বাবা দর্শন দান করবে বলেই এত সাজ গোজ! হুররে!"

এই একুশ দিন জন কর্ট অনেক চেষ্টা করেছে ওয়াগাদিসদের ভাষা জানবার। কিন্তু পারেনি। বরং হতভম্ভ হয়েছে মর্কট মানবদের ভাষার মধ্যে কঙ্গো শব্দ আর জার্মান শব্দের জগাখিচুড়ি দেখে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে নি কেন এমন হল। ওযাগদিসরা যে সত্যিই সেই 'মিসিং লিঙ্ক' অর্থাৎ মর্কট আর মানবেব মাঝমাঝি অবস্থার প্রাণী ডারউউন তত্ত্ব অনুযায়ী তা বোঝা গেছে। কিন্তু সভ্যজগতের মানুষকে এ-খবর জানাতে হলে লিভারভিলে ফিরে যাওয়া দরকার। কে জানে আজ সেই সুযোগ আসছে কিনা।

ঝটপট সবাই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সত্যি সত্যিই আজ উৎসবের সাজে সেজেছে ওয়াগদিসরা। প্রত্যেকের গায়ে মাথায় কোমরে পাতা আর বাহার। রকমারি ফুলের মুকুট। এতদিন যারা গোমড়া মুখে ঘোরাফেরা করেছে, আজ তাদের চোখে মুখে আনন্দের রোশনাই। খুশী যেন উপচে পড়ছে চোখের। সবচাইতে বড় পবিবর্তন এসেছে ওয়াগদিস মেয়েদের কথায়। মুখে কথার ফুলঝুরি কাটছে যেন।

জন কর্ট গোড়া থেকেই একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখেছিল এ-গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে। সভ্য দুনিয়ার মেয়েরা বচনে দড়। কথার ধোকড়। মিনিটে বারো-হাজার বার জিভ নাড়তে পারে অনায়াসেই। তাই স্বামী বেচারাদের কানে তুলো এঁটে না রাখলে পাগল হতে হয়।

কিন্তু মর্কট মানবীরা ঠিক তার উল্টো। পারতপক্ষে কথা বলতে চায় না। পুরুষরাই কথা বলে—মেয়েরা শোনে আর কাজ করে।

কিন্তু সেদিন, সেই উৎসবের দিন, দেখা গেল মেয়েরা পর্যন্ত বকর বকর করছে মনের আনন্দে। এত কিসের আনন্দ?

ঘরে কেউ বসে নেই। প্রায় হাজার খানেক ওয়াগদিস জড়ো হয়েছে

রাজার কুঁড়ের সামনে। সেনাপতি র‍্যাগি কাঁধে ধনুক, কোমরে ছুরী আর কুঠার, হাতে শিকারী বর্শা নিয়ে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছে কুঁড়ের সামনে।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা ফাঁকা চত্বর আছে। সেখানে গাছের ভীড় নেই। ওয়াগদিসরা জড়ো হয়েছে সেখানেও। এক রকম গেঁজানো রসে টামারিস্ক গাছের সুবাস মিশিয়ে ঢক ঢক করে পান করছে। ঠিক যেন মদ খাচ্ছে। মাতালও হচ্ছে। হেলেদুলে নাচছে চত্বর ঘিরে। দশবারো জন ওয়াগদিস ফাঁপা নলে এক সঙ্গে ফুঁ দিচ্ছে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে ফুঁ দেওয়ার চোটে। কিন্তু বাঁশীর মত আওয়াজ বেরোচ্ছে নল থেকে। বেসুরো বিকট সেই আওয়াজের সঙ্গে মিশেছে ডুগডুগি বাজানোর যাচ্ছেতাই আওয়াজ। মাটির পাত্রে চামড়া বেঁধে তার ওপর কষে ঘুসি চড় মেরে ঢাক বাজানোও হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা ভীষণ বিকট জগঝম্প। পাগলের মত বাঁদর-নাচ নাচছে ওয়াগদিসরা। জগঝম্পের কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজকে আরো বাড়িয়ে তুলছে আকাশ ফাটা চেঁচিয়ে।

ম্যাক্স-জন-খামিশ স্তম্ভিত হয়ে দেখছে এই তাণ্ডব-নৃত্য। বাঁদর নাচকে যদি নাচ বলা যায়, তাহলে ওয়াগদিসদের এই লম্ফঝম্পও নাচ বটে। ছেঁড়া জামা গায়ে উৎসবের মাঝে ওদের মানাচ্ছে না। তবুও দাঁড়িয়ে আছে মসেলো-টালা-টালাকে দেখে চক্ষু সার্থক করার আশায়।

হঠাৎ পর্দা তুলে উঠল। রাজ-কুটিরের অন্দর থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত একটা জিনিস। কয়েকজন ওয়াগদিস ধরাধরি করে জিনিসটাকে বয়ে নিয়ে এল চত্বরের মাঝে। পাতা দিয়ে তৈরী কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল জিনিসটা। ঢাকনা তুলতেই দেখা গেল একটা ব্যারেল-অর্গান।

ধাঁ করে ম্যাক্সের মনে পড়ে গেল সেই রাতের স্মৃতি। ছুটন্ত আলোর পেছন পেছন আকাশ-গ্রামের তলায় এসে পৌঁছোনোর পর সবে ঘুমোতে যাচ্ছিল ম্যাক্স, এমন সময়ে মাথার ওপর কোথায় যেন অর্গানের বাজনা শুনেছিল। ভেবেছিল, ভুল শুনেছে। এখন বুঝল—ভুল নয়—ঠিকই শুনেছিল।

একজন ওয়াগদিস ততক্ষণে ব্যারেল-অর্গান বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। সুমধুর ওয়াল্‌জ সঙ্গীতের ঝঙ্কারে বাতাস ভরে উঠেছে। জগঝম্প থেমে গিয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে ওয়াগদিসরা। গান ইতরপ্রাণীকেও মোহিত করে—মর্কটমানবরা মুগ্ধ হবে, এ আর আশ্চর্য কী।

ফিসফিস করে বললে জন কর্ট—"অর্গানটা ডক্টর জোহেৌসেনের।"

"খাঁচা ঘর থেকে তুলে এনেছে নিশ্চয়-ই সায় দিলে ম্যাক্স।"

কিন্তু এরা কি জানে ব্যারেল-অর্গানে শুধু এই একটা বাজনাই বাজে না?

পাশের বোতাম টিপলে পর পর বাজবে আরো অনেক বাজনা? প্রত্যেকটা বাজনা সমান মিষ্টি, সমান সুরেলা, সমান ঝঙ্কারময়। সভ্যমানুষ ছাড়া ব্যারেল-অর্গানের এ-গুপ্তরহস্য আর কারো জানা সম্ভব নয়।

ওয়ালজ গান ফুরিয়ে গেল। বাদক ওয়াগদিস বিনা দ্বিধায় পাশের বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল জার্মান বাজনা। সে গান ফুরোতেই শুরু হল ফরাসী বাজনা। প্রত্যেকটা সুর ভুবন বিখ্যাত। মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে যন্ত্র খারাপ হওয়ার জন্যে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যেন গানের সুধায় পরিবেশ পাল্টে গিয়েছে আঙ্গালা গ্রামের।

বিস্ফারিত চোখে অদ্ভুত এই কাণ্ড দেখছিল জন আর ম্যাক্স। নিজের চোখে না দেখলে এ-দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না। আফ্রিকার গহন জঙ্গলে অজ্ঞাত মর্কট-মানব সুসভ্য মানুষের মতই ব্যারেল-অর্গান বাজিয়ে গান শুনছে, এ যে ভাবাও যায় না:

হঠাৎ কানের কাছে লো-মাঙ্গী বললে—"মসেলো টালা-টালা!"

চমকে উঠল জন, ম্যাক্স, খামিশ। তবে কি অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে সত্যি সত্যিই আলোয় আবির্ভূত হচ্ছে মর্কট-মানবদের অধিপতি?

কুটিরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড সিংহাসন। চারজন অসুরের মত বিশালদেহী ওয়াগদিস ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসছে সিংহাসনটা। তবুও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সিংহাসনে আসীন মানুষটার গুরুভারে।

হ্যাঁ, মানুষ। সিংহাসনে বসে আছে, সে মর্কট নয়—মানব। শ্বেত মানব। ধবধবে ফর্সা রঙ। চুল আর দাড়িও দুধের মত সাদা। বয়স প্রায় ষাট। চোখে মস্ত চশমা—কালো কাঁচের। নাকটা খাঁড়ার মত।

কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজামশায়ের। ভক্ত প্রজাদের দিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে না, কথাও বলছে না। পরম উদাসীনভাবে চেয়ে আছে সামনে। দুবার শুধু আঙুল দিয়ে নাকের ডগা চুলকোনো ছাড়া আর কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না মেদ থলথলে দেহে। ম্যাক্স-জন-খামিশের সামনে দিয়ে গেল সিংহাসন। অথচ তিলমাত্র কৌতূহল দেখাল না। ফিরেও তাকাল না। মর্কট-মানবদের মধ্যে চারজন সভ্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এ-তথ্য নিশ্চয় তার অজানা নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেল সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

ক্ষেপে গেল ম্যাক্স। আর একটু হলেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠত সে। রুখে দিল জন। বলল অদ্ভুত সুরে—"চিনতে পারলে না? উনিই তো ডক্টর জোহৌসেন।"

১৫ ॥ ডক্টর জোহৌসেনের অবস্থা

ডক্টর জোহৌসেনের সঙ্গে জন কর্ট-য়ের আলাপ পরিচয় ছিল। সুতরাং তার চিনতে ভুল হয় নি।

এতদিনে বোঝা গেল ভদ্রলোক চব্বিশে আগস্ট পর্যন্ত ডাইরী লেখার পর খাঁচাঘর থেকে কোথায় উধাও হয়েছিলেন। জন-ম্যাক্স-খামিশ একটা রোজ-নামচা পেয়েছিল পরিত্যক্ত খাঁচাঘরে। তাতে পেন্সিলে রোজকার অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলেন ডক্টর। শুরু হয়েছিল সাতাশে জুলাই, ১৮৯৪। শেষ হয়েছিল চব্বিশে আগস্ট। খাঁচার মধ্যে ছিলেন মাত্র তেরোদিন।

এখন বোঝা গেল, তিনি ওয়াগদিসদের খপ্পরে পড়েছিলেন। চাকরটা পালিয়েছিল বনের মধ্যে। সে-ও ধরা পডলে এ গাঁয়ে তাকে অন্ততঃ প্রধান মন্ত্রী হিসাবেও নিশ্চয় দেখা যেত।

ওয়াগদিসরা রিও জোহৌসেন নদীপথে মাঝে মাঝে অভিযানে বেরোতো। হাতীদের তাড়া খাওয়ার আগে ম্যাক্স-জন-খামিশ-লাঙ্গা কতকগুলো রহস্যজনক মশালের নাচানাচি দেখেছিল গাছের আগায় আর তলায়। আলোগুলো এই ওয়াগদিসদেরই।

এরাই তিনবছর আগে ডক্টর জোহৌসেনকে তুলে এনেছিল আঙ্গলা গ্রামে। তাঁর কাছ থেকেই এরা থালাবাসন তৈরী করতে শিখেছে, ব্যারেল-অর্গান বাজানোর কায়দা রপ্ত করেছে, দু'চারটে জার্মান বুকনি আর কঙ্গো শব্দও মুখস্থ করেছে। তারপর তাঁর উন্নত মেধা আর ফর্সা রঙ দেখে রাজা বানিয়ে ফেলেছে।

আগে এলে ম্যাক্স আর জন-ও রাজা হতে পারত। কিন্তু আগেভাগে রাজা হয়েছেন বলে কি অহংকার মটমট করছেন ডক্টর? আরো দুজন সাদা চামড়ার মানুষ তার রাজত্বে হাজির হয়েছেন জেনেও আমল দিলেন না কি ঐ অহংকারেই?

জন কর্ট বললে—"ওঁর উচিত ছিল আমাদের ডেকে পাঠানো ওঁর কুটিরে। কেন ডাকলেন না ভেবে পাচ্ছি না।"

খামিশ বললে—"হুজুর, আমার মনে হয় ওঁকে খবর দেওয়া হয় নি।"

"সত্যিই তো," লাফিয়ে উঠল জন কর্ট।

"নিশ্চয় ওঁকে জানানো হয়নি আমাদের কথা। আগেই ভাবা উচিত ছিল আমাদের।"

চলল জোর পরামর্শ। ঠিক হল, ওঁর ঘরে গিয়ে গায়ে পড়ে আলাপ করতে হবে। ওঁরই রাজত্বে চার-চারজন মানুষ বন্দী রয়েছে জানলে নিশ্চয় চমকে উঠবেন ডক্টর। তারপর দেশে ফেরার জন্যে তাঁর মত আদায় করতে কতক্ষণ? তিনি হুকুম দিলে কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে পথ আটকানোর?

শুভ কাজে দেরী করতে নেই। আজ রাতেই হানা দিতে হবে তাঁর ঘরে। কেননা, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঝিমুচ্ছে গোটা গ্রাম। রক্ষীরাও নিশ্চয় বেহুঁশ।

গুটিগুটি রাস্তায় নামল চারজনে। তখন রাত নটা। কোল্লো চাকরটাও উৎসব থেকে ফেরেনি। গাঁ বিলকুল অন্ধকার। এক-আধটা নিভু-নিভু মশাল দূরে-দূরে গোঁজা রয়েছে গাছের ফোকরে। রাস্তা ফাঁকা। ওয়াগদিসরা সবাই বেহুঁশ।

রাজকুটিরের সামনের প্রাঙ্গণে কেউ নেই। রক্ষীরাও সরে পড়েছে। কুটিরের মধ্যে মিট মিট করে জ্বলছে একটা আলো।

আসবার সময়ে বন্দুকগুলো সঙ্গে এনেছে ম্যাক্স-জন-খামিশ। গুলিগুলো বাক্স থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছে। পালানোর পক্ষে আজকের রাতের মত শুভ লগ্ন আর পাওয়া যাবে না। দরকার হলে বন্দুকবাজি দেখিয়ে আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়া যাবে ওয়াগদিসদের।

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে পরপর দুটো ঘর। প্রথম ঘরটা অন্ধকার এবং ফাঁকা। দ্বিতীয় ঘরে আলো জ্বলছে এবং দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরাম কেদারায় চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন ডক্টর জোহৌসেন।

আরাম কেদারা ছাড়াও আরও কয়েকটা সভ্যদেশের সামগ্রী রয়েছে ঘরের মধ্যে। ওয়াগদিসরা খাঁচাঘর থেকে বয়ে এনেছিল নিশ্চয় ডক্টরকে ধরে আনার সময়ে।

ওদের পায়ের শব্দে মুখ ঘোরালেন ডক্টর এবং উঠে বসলেন।

ঘরে ঢুকে জার্মান ভাষায় বললে জন কর্ট—"নমস্কার, ডক্টর জোহৌসেন। আমরা এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে।"

ডক্টর জোহৌসেন শুনতে পেয়েছেন ব'লে মনে হল না। এমন কি বুঝতে পেরেছেন বলেও মনে হল না। হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন সামনে। যেন কিছু দেখেও দেখলেন না। শুনেও শুনলেন না।

ব্যাপার কী? তিন বছরের মধ্যে মাতৃভাষাটাও ভুলে মেরে দিয়েছেন ডক্টর?

হাল ছাড়বার পাত্র নয় জন। ফের বলল গলা চড়িয়ে—"আমরা বিদেশী। আজালা গ্রামে আমাদের ধরে আনা হয়েছে—"

জবাব নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইলেন ডক্টর—মর্কট মানব নৃপতি মসেলো-টালা-টালা!

ম্যাক্সের আর সহ্য হল না। ছিটকে গেল সামনে। কোনোরকম খাতির করল না মহামান্য রাজাকে। দুহাতে কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিল বেশ জোরেই।

অমনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর। যে কোনো বানরও লজ্জা পেত তাঁর সেই অদ্ভুত দাঁত খিঁচুনি দেখলে।

ম্যাক্সের মাথায় রক্ত চড়ে গেল তাই দেখে। কাঁধ খামচে ধরে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফের ঝাঁকিয়ে দিল ডক্টরকে।

ডক্টর জিভ বের করলেন এবং ভেংচি কাটলেন।

"পাগল নাকি?" ভড়কে গেল জন।

"তারও বেশী," বলল ম্যাক্স। "বাঁদরদের সঙ্গে থেকে একেবারে বাঁদর হয়ে গেছেন। মাথায় ছিট নিয়ে এসেছিলেন জঙ্গলে। এখন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন। মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে। ওযাগাদিসবা ঐ জন্যেই ওকে মাথায় তুলে রেখেছে। বাঁদর মানুষ দেখে আমরা যেমন অবাক হয়েছি, ওরা অবাক হয়েছে মানুষ বাঁদর দেখে। দেখছো না বাঁদরদের মত কি রকম গা মাথা চুলকোচ্ছেন? ধুত্তোর! চল, পালাই।"

"কিন্তু ডক্টর জোহৌসেনের কি হবে?" শুধালো জন কর্ট।

"ওঁকেও সঙ্গে নেব।" বলে দুই বন্ধু দুপাশ থেকে চেপে ধরল ডক্টরকে এবং টেনে নামাতে গেল কোচ থেকে। পারবে কেন বুড়োর সঙ্গে? ষাট বছরেও রীতিমত বলবান তিনি। এক ধাক্কায় দুজনকেই ছুঁড়ে দিলেন দেওয়ালের গায়ে। নিজেও চিৎপাত হয়ে চার হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন রাক্ষুসে গলদা চিংড়ির মত।

সেই সময়ে আর একটি কাণ্ড করলেন। অমানুষিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। নিস্তব্ধরাতে বাজখাঁই চীৎকারটা ছড়িয়ে গেল অনেক দূরে। একজন রক্ষীও যদি এখন জেগে থাকে, রাজামশায়ের হাঁক শুনে ছুটে আসবে এখুনি।

আর সময় নেই। ঝড়ের মত চারজনে বেরিয়ে এল বাইরে।

১৬॥ সংক্ষিপ্ত উপসংহার

কপাল ভাল, রক্ষীরা কেউ তেড়ে আসছে না। চীৎকার শুনে কেউ সচকিত হয় নি। চারজনে তাই ছুটতে লাগল সিঁড়ির সন্ধানে। কিন্তু কোথায়

সেই সিঁড়ি? একে অন্ধকার, তায় গলিঘুঁজি গাছের গোলকধাঁধা। এর মধ্যে সিঁড়ি কোথায়?

দিশেহারা হয়ে গেল চারজনে। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে লো-মাঙ্গ আর লি-মাঙ্গ।

লি-মাঙ্গ ছেলেমানুষ হলেও বুদ্ধিমান। রাতের অন্ধকারে চারজনকে চুপিসারে রাজকুটিরের দিকে যেতে দেখেই ভয় পেয়ে খবর দিয়েছিল বাপকে। লো-মাঙ্গ বুঝেছিল, পালাবার ফিকিরে আছে বিদেশীরা। তাই ছেলের হাত ধরে ছুটে এসেছে পথ দেখিয়ে নীচে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ভালই হল। লো-মাঙ্গ না থাকলে রাত ফর্সা হয়ে যেত, তবুও সিঁড়ি খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে র‍্যাগি আর জনাবারো ওয়াগদিস সেপাই।

আর সময় নেই। র‍্যাগি তেড়ে আসছে ম্যাক্সের দিকে। অতজনের সঙ্গে মাত্র চারজনের লড়াই সম্ভব নয় কোনমতেই।

দুপা পেছিয়ে এল ম্যাক্স। বন্দুক তুলে গুলি করল র‍্যাগির বুক লক্ষ্য করে।

দিনের বেলায় বজ্রপাত এক জিনিস, আর রাতের অন্ধকারে বিনামেঘে বজ্রপাত আরেক জিনিস। ওয়াগদিস সেপাইরা কস্মিনকালেও এমন কাণ্ড দেখেনি। আগুনের ঝলক, বজ্রের গর্জন এবং র‍্যাগির আছড়ে পড়া—তিনটি দৃশ্য চোখেকানে দেখেশুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল তাদের। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

গাছের ডালে পা দিয়ে টপাটপ নীচে নেমে এল পলাতকরা। ছুটে গেল নদীর দিকে। একটা ক্যানো জলে ভাসিয়ে লাফিয়ে বসল ভেতরে।

কিন্তু ওয়াগদিসরা ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। দাউ দাউ করে মশাল জ্বলছে গাঁয়ের ওপরে এবং নীচে। যারা নীচে নেমেছিল, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে আসছে নদীর দিকে। ওদের কিছুক্ষণের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা দরকার। নইলে ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একই সঙ্গে বন্দুক তুলল ম্যাক্স আর জন। জোড়া গর্জনে বন কেঁপে উঠল। ভীড়ের মধ্যে থেকে দুজন ওয়াগদিস সটান আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ঠিক সেই সময়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল ক্যানো।

একটানা পনেরো ঘণ্টা নদী-যাত্রার পর তীরে ক্যানো বেঁধে নেমে পড়ল লো-মাঙ্গ। নিজে জেগে পাহারা দিল সারা রাত। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে দিল সবাইকে।

সকাল বেলা সবাইকে ক্যানোয় তুলে দিয়ে ছেলের-হাত ধরে তীরে দাঁড়িয়ে রইল লো-মাঈ। এক হাত তুলে দেখালো নদী। আরেক হাতে জঙ্গল।

লাজা জড়িয়ে ধরল লি-মাঈকে। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়ে দিল। দুজনেরই চোখে জল ঝরতে লাগল অঝোরধারে। এমন কি বিশালদেহী লো-মাঈও কেঁদে ফেলল বিচ্ছেদের সময়ে। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

অভিভূত কণ্ঠে জন বললে—"ম্যাক্স, এখনও কি এদের বাঁদর বলবে ?"

"না। জন, এরা মানুষ। মানুষেরই মত এরা হাসতে জানে, কাঁদতেও জানে।"

কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটা শব্দই বার বার বলতে লাগল লি-মাঈ—"আঙগোরা···আঙগোরা !"

অর্থাৎ, মা রয়েছে যে আঙ্গালা গ্রামে ! বাবাকে নিয়ে সেখানেই ফিরে যেতে হবে আমাদের।

স্রোতের টানে হু-হু করে ভেসে গেল ক্যানো। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল বাপ-বেটার মর্কট-মানব মুর্তি।

সেদিন ছিল ষোলই এপ্রিল। প্রায় একমাস পরে বিশে মে লিভারভিলের ফ্যাক্টরীতে ফিরে এল চারজনে অনেক পথ পেরিয়ে। সুদীর্ঘ সেই কাহিনী এখানে অবান্তর।

আসবার পথে আর কোনো ঝুলন্ত পল্লী চোখে পড়েনি ওদের। আর কোনো মর্কট-মানব পথ জুড়ে দাঁড়ায় নি।

কে জানে ডক্টর জোহৌসেনের কল্যাণে হয়ত দূর ভবিষ্যতে আঙ্গালা গ্রামকে দখল করে বসবে জার্মানরা।

কিন্তু ইংরেজরা কি অত সহজে ছেড়ে দেবে ?

ধূমকেতুর পিঠে চড়ে

[অফ্ অন্ এ কমেট]

(জুল ভের্নের একমাত্র সত্যিকারের গ্রহে-গ্রহে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী)

....

[আচম্বিতে পৃথিবীর একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহাশূন্যের বুক চিরে উড়ে গেল বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডটি অজানার পথে·· সেইসঙ্গে ক'জন মানুষ !]

....

ক্যাপ্টেন হেক্টর সারভাদাক জাতে ফরাসী। ফরাসী সামরিক বাহিনীর অফিসার তিনি। অ্যালজিরিয়ার মোসটাগানেমে থাকার সময়ে মহিলাঘটিত একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লেন।

মহিলাটির নাম ম্যাডাম গু এল। খানদানী মহলের মহিলা। সুন্দরী। সুতরাং তাঁকে বিয়ে করার জন্যে সুপাত্রর অভাব ছিল না।

যুগ-যুগ ধরে দেখা গেছে যত অনর্থের মূল হল সুন্দরী মেয়েরা। ম্যাডাম গু এল-ও তাঁর রূপের মায়াজাল বিছিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরে টেনে নিয়ে এলেন সম্রান্ত দুজন পুরুষকে। এঁদের একজন ক্যাপ্টেন সারভাদাক। অপরজন কাউন্ট টিমাসচেফ।

দুজনেই সুপুরুষ বীর। দুজনেই জেদ ধরেছেন ম্যাডাম গু এল-কে বিয়ে করার জন্যে। এখন, একজন পিছিয়ে না গেলেই নয়। একদিন সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনকে সেই অনুরোধ করলেন কাউন্ট।

দূরে ক্যাপ্টেনের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর আর্দালী বেন জুফ। সাগরের নীল জলে দুলতে লাগল কাউন্টের পাল তোলা জাহাজ ডোব্রিয়ানা।

কাউন্টের সনির্বন্ধ অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন ক্যাপ্টেন। ম্যাডাম গু এল-কে তিনি বিয়ে করবেন-ই।

বললেন—"কাউন্ট টিমাসচেফ, আমি দুঃখিত। দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাকে রুখতে পারবে না—ম্যাডাম এল-য়ের পাণিগ্রহণ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

চেয়ে রইলেন কাউন্ট। ধীর কণ্ঠে বললেন—"তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমস্যার সমাধান করে নেওয়া যাক। দেখি, তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি মত পালটান কিনা।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান ? তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন ক্যাপ্টেন।

বললেন—"বেশ, আগামীকাল পয়লা জানুয়ারী সকাল নটায় চলে আসুন শেলিফ নদীর কাছে পাহাড়ের ওপর।"

"আসব" বলে বিদায় নিলেন কাউন্ট।

ঘোড়া হাঁকিয়ে কোয়ার্টার অভিমুখে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন। বেনজুফও ঘোড়ায় চেপে চলেছে পাশে পাশে। অ্যালজিরিয়ার গ্রাম্যশোভা দেখে আর আসন্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ভেবে ক্যাপ্টেনের মনটা খুশীতে নেচে নেচে উঠছে।

সূর্য অস্ত গেল। ক্যাপ্টেন ঘোড়ার পিঠে বসেই শুধোলেন—"বেনজুফ, কবিতা লিখেছো কোনোদিন ?"

"না, ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেনের মাথার মধ্যে কবিতার ছন্দ ঘুর-ঘুর করছিল বলেই প্রশ্ন করেছিলেন বেনজুফকে। কবিতা নিযে তন্ময় হযে পথ চলছিলেন তিনি। অন্ধকার আকাশ যে আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে, একটা অদ্ভুত গোলাপী আভা ছেয়ে ফেলছে কালো আকাশকে—সেদিকে খেয়াল ছিল না কারোরই।

কুটির এসে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা কুঁড়েঘরকেই সাময়িক-ভাবে আবাস বানিয়ে নিযেছেন ক্যাপ্টেন! দিশি ভাষায় এ-কুটিরেব নাম গোরবি।

কবিতা বড় সাংঘাতিক ব্যাধি। একবার ধরলে ছাড়তে চায়না। সারাটা পথ বেনজুফকে কবিতা শুনিয়ে এসেও আশ মেটে নি ক্যাপ্টেনের। গোরবিতে বসে বেনজুফ খানা পাকাচ্ছে, আর ঘরের বাইরে করিডরে দুহাত পেছনে দিয়ে পায়চারী করছেন সারভাদাক। ছন্দের মিল খুঁজছেন। সজোরে আবৃত্তি করছেন।

"শোনো সুন্দরী, প্রতিজ্ঞা আমার
পাণিগ্রহণ করিব তোমার।
চিরদিন রহিব আমি—"

প্রলয় উপস্থিত হল ঠিক তারপরেই। কবিতা মাথায় উঠল।

আচম্বিতে তছনছ হয়ে গেল সব কিছু। বিধ্বস্ত হল গোরবি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাদ। ছিটকে গেল রান্নার সরঞ্জাম। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটার ঝুঁটি ধরে কে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল।

মাটিতে ঠিকরে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আর বেনজুফ। আশ্চর্যভাবে অক্ষত থেকে গিয়েছিলেন দুজনেই। তবে জ্ঞান ছিল না ঘণ্টা কয়েকের মত।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন প্রভু এবং ভৃত্য। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে বিমূঢ়ের মত দুজনে চেয়ে রইলেন দুজনের পানে। কাঠের বরগা স্তূপাকারে পড়ে রইল আশেপাশে।

বেনজুফ মাথা চুলকে শুধোলো—"স্যার, ভালো আছেন তো?"

হতভম্ব মুখে ক্যাপ্টেন বললেন—"তা তো আছি। কিন্তু কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম বলতে পারো?"

"সকাল হয়ে এল। ঐ দেখুন সূর্য উঠছে।"

"সূর্য উঠছে!" ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। "সূর্য কি কখনো পশ্চিম দিক দিয়ে ওঠে?"

সত্যিই তো? চোখ রগড়ে ফের তাকালো বেনজুফ। মাথায় চোট লেগে দুজনেই এক সাথে পাগল হয়ে গেল নাকি? তা না হলে এ-রকম অলৌকিক অবিশ্বাস্য অসম্ভব দৃশ্য দেখা যাবে কেন?

সূর্যই উঠছে বটে। দিগন্ত রাঙিয়ে উঁকি দিয়েছে তার রক্তগোলক। তবে পূবে নয়—পশ্চিমে!

এইভাবেই শুরু হল এই অত্যাশ্চর্য উপাখ্যানের আশ্চর্য ঘটনাবলী!

ক্যাপ্টেন সারভাদাককে বিধাতা গড়েছিলে বিশেষ ধাতু দিয়ে। নইলে এই সৃষ্টিছাড়া সূর্যোদয় দেখবার পরেও তাঁর লড়বার সখ হবে কেন?

ভাঙা কুটিরের মধ্যে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে ফস করে খাপ থেকে তরবারি টেনে বার করলেন সারভাদাক। বাঁই বাঁই বার কয়েক বাতাসের ওপর কোপ মারলেন সরু তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে। বললেন সহজ গলায়—"বেনজুফ।"

"আজ্ঞে?"

"পৃথিবী যদি উল্টেও যায়, তাহলেও আমায় লড়তে হবে। ঠিক কিনা?"

"তা তো বটেই।"

"তাহলে তো এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়। নইলে নটার সময়ে পৌঁছোবে কি করে?"

"তা তো বটেই," বলে রামভক্ত হনুমানের মত সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালো বেনজুফ।

পা বাড়িয়েই ঘটল বিপদ। দুজনেরই পিলে চমকে উঠল উঠল পরবর্তী ঘটনায়!

ক্যাপ্টেনের শরীরটি পাতলা, ছিপছিপে, মজবুত। বেনজুফের বপু স্কে অনুপাতে একটু ভারীই বলতে হবে। কিন্তু ঐ ভারী শরীরই যে ভেল্কী দেখালো সেদিন, দেখে তো আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল প্রভু-ভৃত্যের।

হন হন করে চলেছে দুজনে। ঘোড়া দুটোও দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে অকস্মাৎ উলট-পালট কাণ্ডর পর। সুতরাং পা চালিয়ে না গেলে তো পৌঁছোনো যাবে না দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরে।

অকস্মাৎ একটা বিচিত্র অনুভূতিতে শিরশিরে করে উঠল দুজনেরই লোমকূপ। আশ্চর্য ব্যাপার তো! হঠাৎ শরীর এত হাল্কা-হাল্কা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে যেন গ্যাসভর্তি বেলুন হয়ে গিয়েছে শরীরটা। বেলুন যেমন উড়ে উড়ে চলে শূন্য দিয়ে, তাঁদের শরীর দুটোও যেন সেই ভাবে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে!

ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?

এ-তো হন হন করে হাঁটা নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। জমির ওপর পায়ের সামান্যতম ধাক্কা শরীরকে অনায়াসে ঠেলে নিয়ে চলেছে বাতাসের মধ্যে দিয়ে!

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে ফেলল বেনজুফ—"স্যার, মনে হচ্ছে যেন উড়ে-উড়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ একটা পগার পড়ল সামনে। এমন কিছু চওড়া নয়। সামান্য লাফ দিলেই পেরিয়ে যাওয়া যাবে। সেই হিসেবেই একই সঙ্গে লাফ মারলেন দুজনে।

সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশের পটভূমিকায় ভেসে উঠল দু'দুটো মানুষ মূর্তি। মাটি থেকে তিরিশ ফুট ওপরে উঠে গেছেন ক্যাপ্টেন এবং বেনজুফ!

সামান্য লাফেই এই কাণ্ড! ব্যাপার কি? কালরাত থেকে এসব কি ঘটছে পৃথিবীতে? ভূ-পৃষ্ঠ কি সহসা ভূত প্রেত দত্যি দানোর দখলে চলে গিয়েছে? বিদেহী অধিদেবতারা কি ছিনিমিনি খেলা খেলছেন অসহায় দুটি মানুষকে নিয়ে?

ধীরে ধীরে শূন্য থেকে মাটিতে অবতীর্ণ হলেন ক্যাপ্টেন। পাশে আর্দালী।

কারো মুখে কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন কাপ্টেন—"বেনজুফ, আমরা কি পাগল হয়ে গিয়েছি, না, এখনো ঘুমিয়ে রয়েছি?"

গোঁফ ঝুলে পড়েছিল বেচারী বেনজুফের। বিড়বিড় করে বললে কোনো মতে—"কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। পাগলও হতে পারি।"

যাই হোক, ফের যাতে হনুমানের মত উল্লম্ফন না দিতে হয়, তাই বেশ হিসেব করেই পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের ওপর পৌছোলেন ক্যাপ্টেন। গিয়ে দেখলেন ভোঁ-ভাঁ! কাউণ্ট এসে পৌছোন নি!

তাজ্জব ব্যাপার তো! কাউণ্ট টিমাসচেফ কাপুরুষ নন। মৃত্যুভয়ে ভীত নন! দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভয়ে চম্পট দেওয়া তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। সময়জ্ঞানও তাঁর প্রখর। কথার খেলাপ করা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও কিনা তিনি এলেন না?

সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন প্রবোধ দিলেন নিজের মনকে—"নিশ্চয় কোথাও বাধা পেয়েছেন কাউণ্ট। নইলে আসতেন ঠিকই। তাহলেও একটু দাঁড়িয়ে যাওয়া যাক।"

কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। কাউণ্ট টিমাসচেফের চিহ্ন দেখা গেল না ধারে কাছে!

গোরবিতে ফিরে এলেন দুজনে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—"বেনজুফ, চলো, ঘোড়া দুটোকে খুঁজে পেতে ধরে আনি তারপর দুজনে মিলে দেখে আসি তল্লাটটা।"

"তা যাচ্ছি। কিন্তু স্যার," আঙুল তুলে দিগন্ত দেখিয়ে বলল বেনজুফ—"সূর্যের কি হল বলুন তো? একি পাগলামি জুড়েছে সকাল থেকে?"

তাকিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন। দেখলেন, আকাশে রঙের খেলা শুরু হয়েছে। এবং সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন?

"সূর্য অস্তাচলে! নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ক্যাপ্টেন—"এখনো তো ছঘণ্টাও হয়নি সূর্যোদয় হল! এর মধ্যেই সূর্য ডুবছে! সর্বনাশ! দিনের দৈর্ঘ কি অর্ধেক হয়ে গেল আজ থেকে?"

কে জবাব দেবে এই সব আবোল তাবোল হেঁয়ালীর?

ঠিক ছ'ঘণ্টা পরে ফের সূর্যোদয় ঘটল।

অবাক হওয়াটা আস্তে আস্তে সয়ে আসছিল দুজনের। সুতরাং এবার আর চোখ কপালে না তুলে ঘোড়া দুটো ছুটিয়ে আনল বেনজুফ। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌছোলেন শেলিফ নদীর তীরে।

কিন্তু কোথায় শেলিফ নদী? এযে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র! আকাশে মেঘ ভাসছে, গাঙচিল উড়ছে, ওঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন সহসা গজিয়ে ওঠা একটা আনকোরা নতুন সমুদ্রতটে! শেলিফ নদী রাতারাতি সমুদ্র বনে গেছে!

"নদী তীর এখন সমুদ্রতট!" বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠস্বর ক্যাপ্টেনের।

বেনজুফের চোখ দুটো ছানাবড়ার মত বেরিয়ে এসেছিল। একী ডাইনীর ভেল্কী, না, চোখের মায়া? মতিভ্রম, না উন্মত্ততা?

মাথা চুলকে বলল বেনজুফ—"নদীর ওপারে শহর টহরগুলো তাহলে এখন জলের তলায়।"

সমুদ্রের গা ঘেঁসে এগিয়ে চললেন দুই অশ্বারোহী। এতবড সমুদ্র, কিন্তু মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে যেন। কোথাও কোনো জলযানের চিহ্নমাত্র নেই। ডাঙার অবস্থাও তাই। পৃথিবী কি সহসা পাণ্ডববর্জিত নিভৃত গ্রহে রূপান্তরিত হল? মানুষ কোথায়? অন্যান্য প্রাণী কোথায়? কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে সূর্য পশ্চিমে ওঠে, ছঘণ্টা পবে পূবে অস্ত যায়, নদী সাগবে রূপান্তরিত হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ জনপ্রাণী শূন্য হয়?

ক্যাপ্টেন বললেন—"বেনজুফ, মনে হচ্ছে আমরা দুজন ছাড়া আব কেউ বেঁচে নেই।"

যাই হোক, সমুদ্রকে পাশে বেখে অব্যাহত বইল ওঁদেব ঘোড দৌড়। গাছের ফল মূল খেয়ে, রাতে গাছেব তলায় ঘুমিয়ে এগিয়ে চললেন দিনেব পর দিন, রাতের পব রাত। অবশেষে পথ ফুবোলো।

এই কদিন লোকালয়ের কোনো চিহ্ন চোখে পডেনি। দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ—কোনো প্রাণীও দেখা যায়নি।

হঠাৎ একদিন একটা ভাঙা চোব' গোববি দেখে থমকে দাঁডালেন দুজনে। জায়গাটা অত্যন্ত চেনা চেনা মনে হল।

আবে! এযে তাদেরই গোরবি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বেনজুফ। আলেয়া-ভূতের খপ্পরে পডলে নাকি পথ ভুলে এ ভাবে ঘুবে মরতে হয়। নইলে উল্টোদিকে যাত্রা করেও গোরবির কাছে দুজনে ফিরে আসেন কি করে?

বহস্যটা অবশ্য পবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেনেব কাছে। উনিই বললেন- "বেনজুফ, আমরা দ্বীপে আটকা পডেছি। চারদিক থেকে সমুদ্র আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমরা ছাডা এ-দ্বীপে আব কেউ নেই।"

এত দুঃখেও হাসি পেল বেনজুফের।

বলল—"তাহলে স্যার আজ থেকে আপনি এ-দ্বীপের গভর্ণব জেনারেল। আর আমি জনগণ।"

চুপ করে রইলেন ক্যাপ্টেন।

অসহিষ্ণুভাবে হাত-পা ছুঁডে বলল বেনজুফ - "স্যার, বলতে পারেন এখন কি করব? জডভরবেব মত বসে থাকব?"

"বেনজুফ," সান্ত্বনা সূচক কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন—"ধৈর্য ধরো। সহিষ্ণুতা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। একদিন না একদিন জাহাজের দেখা মিলবেই। আমরাও উদ্ধার পাবো।"

সূর্য তখন অস্তাচলে।

ভাঙা গোরবির কাঠ দিয়ে সমুদ্রতটে একটা ছাউনী বানানো হল। শুধু ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়টা ঠায় সেখানে বসে থাকত বেনজুফ। চোখে টেলিস্কোপ। চাহনি নিবদ্ধ দিগন্তে। মনে আশা—উদ্ধারকারী জাহাজ আসবেই। দ্বীপের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবে দুজনে।

দিন যায়। গরম বাড়তে থাকে। বছরের এ-সময়ে তো এত গরম পড়ে না। ক্যাপ্টেন নিজেও একদিন অবাক হলেন রোদ্দুরের তাত দেখে।

বললেন—"জানুয়ারী মাসে এত গরম?"

বেনজুফ টেলিস্কোপ থেকে চোখ না নামিয়েই বললে—"আমি বলতে পারি অসময়ে গরম পড়েছে কেন।"

"তুমি বলতে পারো?

"আমরা সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রোদের হলকায় তাই যেন গায়ে ফোস্কা পড়ছে।

শুনে গুম হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

কথা বললেন অনেকক্ষণ পরে —"বেনজুফ, তুমি হক কথা বলেছো। সূর্যের অনেক কাছে চলে এসেছি আমরা। তবে আমাদের মূল গতি শুক্রগ্রহের দিকেই মনে হচ্ছে। কাল রাতে দেখলাম, আকাশের গায়ে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে শুক্রগ্রহ।"

এ-কথা শোনার পর টেলিস্কোপ নামাতেই হল বেনজুফকে। আঁৎকে উঠে বলল—"সর্বনাশ। শুক্রগ্রহের ওপর আছড়ে পড়ব নাকি?"

"অসম্ভব নয়। পরিণামে দেখা দেবে আর একটা মহাপ্রলয়।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটল না। মহাশূন্যের বুক চিরে অবিশ্বাস্য গতিবেগে ওঁরা পৌঁছোলেন শুক্রগ্রহের বিশলক্ষ মাইল দূরে। কিন্তু কক্ষপথ না ছুঁয়েই দূরে সরে গেল উড়ন্ত ভূখণ্ড। সংঘাতের কোনো সম্ভাবনাই দেখা দিল না।

রাতের আকাশে দানবিক চেহারার লোহিত গোলকটাকে ক্রমশঃ পিছু হটে যেতে দেখা গেল। আসলে উড়ন্ত ভূখণ্ড মহাশূন্যের আরো গহনে প্রবেশ করছে—শুক্রগ্রহ রইল পেছনে পড়ে।

সোল্লাসে বললেন ক্যাপ্টেন—"পালাচ্ছে শুক্রগ্রহ!"

"ঈশ্বর মঙ্গলময়!" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল বেনজুফ।

দুদিন পর।

সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করছে বেনজুফ। গুম হয়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন।

আচমকা এক চীৎকার—"ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! জাহাজ!"

জাহাজ! তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গেলেন। বেনজুফের হাত থেকে টেলিস্কোপ ছিনিয়ে নিযে চোখ রাখলেন দিগন্তে।

দূরবীনের কাঁচে ভেসে উঠল একটা জাহাজ। পালতোলা জাহাজ। জাহাজের গতি সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপের দিকে।

টেলিস্কোপে এক চোখ রেখেই বললেন ক্যাপ্টেন—"বেনজুফ।"

"আজ্ঞে?"

"জাহাজটা আমার চেনা।"

"আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ বেনজুফ। জাহাজেব নাম ডোব্রিয়ানা। কাউণ্ট টিমাসচেফেব ডোব্রিয়ানা।"

মহানন্দে একপাক নেচে নিল বেনজুফ।

দেখতে দেখতে দ্বীপের কাছে পৌঁছোলো ডোব্রিয়ানা। ঘর-ঘব শব্দে নোঙর পড়ল জলে। জলে নামানো হল ছোট নৌকো। খালাসীরা দাঁড টেনে নৌকো নিয়ে এল দ্বীপের গায়ে। লাফ দিয়ে ঘাস-জমিতে উঠে এলেন কাউণ্ট টিমাসচেফ, সঙ্গে জাহাজ-অফিসার—লেফটেন্যাণ্ট প্রোকোপ।

দ্বীপের ওপর ক্যাপ্টেন হেক্টর সারভাদাককে বীরোচিত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাউণ্ট তো অবাক।

বললেন—"ক্যাপ্টেন, প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিই নির্দিষ্ট সময়ে আপনার সামনে হাজির না হতে পারার জন্যে।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা তখন মনেই নেই ক্যাপ্টেনের। অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—"কাউণ্ট, সে-কথা এখন থাকুক। আগে বলুনদিকি কি হয়েছে আমাদের?"

বিষণ্ণ চোখে চেয়ে বললেন কাউণ্ট টিমাসচেফ—"কি যে হয়েছে তা আমিও জানিনা। শুধু জানি, একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক হারিকেন ঝড়ে ডুবতে বসেছিল ডোব্রিয়ানা। আমরা রক্ষে পেয়েছি স্রেফ

আয়ু ছিল বলে। অলৌকিক কাণ্ড বলতে পারেন। তারপর থেকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। কোনো দ্বীপ, মানুষ, প্রাণী দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম এই দ্বীপ আর আপনাদেরকে।"

"কাউন্ট," বললেন ক্যাপ্টেন—"চলুন আমরা সাগরে সাগরে টহল দিই। যদি কেউ কোথাও বেঁচে থাকে, তাকে উদ্ধার করাটা আমাদের কাজ।"

"আমার জাহাজ আপনার হুকুমের অপেক্ষাতেই তো দাঁড়িয়ে আছে, ক্যাপ্টেন সারভাদাক," বললেন কাউন্ট টিমাসচেফ।

বেনজুফ দ্বীপের পাহারায় রইল। পাহারা দেওয়ার অবশ্য কিছু নেই। অষ্টপ্রহর দূরবীন দিয়ে দিগন্ত দেখার জন্মেই ও-থেকে গেল দ্বীপে। বলা যায় না আবার কোন জাহাজ এসে পৌঁছোতে পারে। খবরা-খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্মে অন্ততঃ একজনের থাকা দরকার।

সারভাদাককে নিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল পূবদিকে। ছ' ঘণ্টা অন্তর সূর্য উঠছে, নামছে, জাহাজ এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

ডেকে দাঁড়িয়ে একদিন বললেন ক্যাপ্টেন—"কি ব্যাপার বলুন তো? গোটা অ্যালজিরিয়া দেশটা গেল কোথায়? এইখানেই তো থাকবার কথা।"

কাউন্ট ম্লান হাসলেন—"শুধু অ্যালজিরিয়ার কথা কেন বললেন? আমার তো বিশ্বাস সারা আফ্রিকা জলের তলায় কোনো গহ্বরে ঢুকে বসে আছে।"

"গোটা একটা মহাদেশের পাতাল প্রবেশ! বলেন কী?" হাঁ হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

"জল ছাড়া কোনোদিকে ডাঙার কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কী?" বললেন কাউন্ট।

"সব তলিয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন, সব গেছে। নিষ্ঠুর বিধাতা শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন এই মহাশ্মশান দেখানোর জন্মে।"

জাহাজ এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু সেদিকেও ডাঙার কোনো চিহ্ন নেই।"

দিন যায়, রাত যায়, হঠাৎ একদিন হৈ-হৈ করে উঠলেন জাহাজ-অফিসার।

"ডাঙা! ডাঙা।"

ডাঙা! ছুটে এলেন কাউন্ট। এখানে ডাঙা থাকার তো কথা নয়?

কিন্তু সত্যিই দূর-দিগন্তে দেখা যাচ্ছে স্থলভাগের আভাষ। সেখানে জল ছাড়া কিছুই থাকার কথা নয়। অথচ জলের ওপর মাথা তুলে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড়! একী কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীতে? মহাদেশ অদৃশ্য হচ্ছে এবং দৃশ্যমান হচ্ছে নতুন দেশ!

স্থলভাগের গা ঘেঁসে এগিয়ে চলল ডোব্রিয়ান। বেশ কিছু মাইল যাওয়ার পর অকস্মাৎ তুফান উঠল দরিয়ায়। আকাশ-জুড়ে জটাজাল বিছিয়ে পবন-দেবতা হুহুংকার রবে তাণ্ডব-নৃত্য জুড়লেন, তালে তাল মিলিয়ে ফুলে-ফুঁসে ভয়ংকর রূপ ধারণ করল সমুদ্র। আকাশ, বাতাস, সমুদ্র—তিন ভৌতিক শক্তি ষড় করে নামল লণ্ডভণ্ড-নাটকে।

আর বুঝি রক্ষে নেই। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে ডোব্রিয়ানা। বড় বড় ঢেউয়েব মাথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে খেলনার নৌকোর মত। পরমুহূর্তে আছড়ে পড়ছে বহু নীচে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করল ডোব্রিযানার আরোহীরা।

আচমকা গেল-গেল রব উঠল জাহাজে। পাহাড়ের দিকে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে জাহাজ· যেন উল্কা খসে পড়েছে আকাশ থেকে · দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে অন্ধের মত ধেযে চলেছে সামনেই একটা খাড়া পাহাড়·· যেন শব্দহীন অট্টহাসি হাসছে সুউচ্চ শৈলপ্রাচীর · একটু পরেই ঘটবে প্রচণ্ড সংঘাত · দেশলাইয়ের বাক্সর মত গুঁড়িয়ে গিয়ে কাঠকুটোগুলো ভেসে যাবে দিকে দিকে।

আচম্বিতে চেঁচিযে উঠলেন ক্যাপ্টেন—"কাউন্ট, দেখেছেন? পাহাড়ের গায়ে একটা ফাঁক রয়েছে—জাহাজ ঢোকাব মত ফাঁক।"

কাউন্ট দেখলেন। ঝড়ের মধ্যে খাড়ির ভেতরে ঢোকা যদিও বিপজ্জনক। কিন্তু একবার ঐ সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করতে পারলে, ভেতরে পাওয়া যাবে শান্ত জল। ঝড় সেখানে মাথা কুটে মরলেও বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না জাহাজের।

লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ ঝুঁকি নিলেন। আশ্চয দক্ষতায় জাহাজ চালিযে নিয়ে এলেন উন্মুক্ত খাড়িপথে। দুপাশে খাড়াই পাহাড় দেওয়ালের মত উঠে গেছে বহু উঁচুতে। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গলিপথ।

নৌবিদ্যায় নিপুণ লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ ঐ বিপদ্-সঙ্কুল পথেই জাহাজ চালিয়ে নিযে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। জল সেখানে দিব্বি শান্ত। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে পাথরের দেওয়াল দিযে সুরক্ষিত রেখেছেন নিভৃত সেই পর্বত-বন্দরকে। ভৌতিক শক্তিরা বৃথাই আস্ফালন জুড়েছে বাইরে—ভেতরে তাদের প্রবেশ নিষেধ।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য বিদায় নিল ঝড়জল। হেসে উঠল নীল আকাশ।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—"দ্বীপ! দ্বীপ!"

সত্যিই তো! আবার একটা দ্বীপ দেখা দিয়েছে দুরদিগন্তে। তৎক্ষণাৎ জাহাজের মুখ ঘুরে গেল সেদিকে। দ্বীপের কাছে গিয়ে নোঙর নামিয়ে স্থির হল ডোব্রিয়ানা।

ছোট নৌকো নামল জলে। সারভাদাক আর কাউণ্ট বসলেন তাতে। দাঁড়ের টানে নৌকো গিয়ে ভিড়ল পাহাড়ের গায়ে। খাড়া পাহাড় প্রায় দেওয়ালের মত উঠে গেছে ওপরে। অতি কষ্টে দুজনে উঠলেন ওপরে। উঠেই দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে দুজন বৃটিশ মিলিটারী অফিসার। পেছনে পাহাড় চূড়োয় একটা কেল্লা। কেল্লার মাথায় কামানের নল ফেরানো সমুদ্রের দিকে।

ক্যাপ্টেন সারভাদাক নিজেও সামরিক অফিসার। পরনে তখনও মিলিটারী ইউনিফর্ম। সুতরাং বৃটিশ অফিসার দুজনকে কেতাদুরস্তভাবে অভিবাদন জানালেন তাঁকে।

করমর্দনের পর সহর্ষে বললেন সারভাদাক—"সমান পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক করায় যে এত আনন্দ তা কে জানত' যাক, খবর-টবর কিছু আছে?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে শুধোলেন বৃটিশ অফিসার—"কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হল জানতে পানতে পারি কী?"

"ইনি কাউণ্ট বাসিলি টিমাসচেফ। আমি ক্যাপ্টেন হেক্টর সারভাদাক।" আত্মপরিচয় দিলেন সারভাদাক। মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানালেন কাউণ্ট টিমাসচেফ।

বৃটিশ অফিসার পরিচয় দিলেন নিজেদের—"ইনি মেজর স্যার জন টেম্পল অলিফাণ্ট। আমি কর্নেল হেনেজ ফিঞ্চ মর্ফি।"

এগিয়ে এলেন কাউণ্ট টিমাসচেফ। বললেন গম্ভীর গলায়—"আপনারাও জানেন গত জানুয়ারী থেকে একটার পর একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে চলেছে পৃথিবীর ওপর। অত্যাশ্চর্য সেই বিপর্যয় পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। মহাপ্রলয়ের ভয়ংকর রূপ আমরা কিছু কিছু দেখেছি। সেই থেকে জাহাজ নিয়ে ঘুরছি জলে জলে। মানুষ রয়েছে, এমন ডাঙার সন্ধান পেলাম এই প্রথম।"

"ইউরোপ, মানে, লণ্ডনের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে কী?" শুধোলেন সারভাদাক।

"একদম না। তবে আশায় আছি শীগগিরই ইংলণ্ড থেকে জাহাজ এসে পৌছোবে।"

"ইংলণ্ড এখনো টিঁকে আছে তো?"

"আলবৎ আছে," শিরদাঁড়া সিধে করে বললেন কর্নেল মর্ফি—"আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন বৃটিশ মাটিতে।"

"বৃটিশ মাটি! কি নাম বলুন তো এ-জায়গার?"

"জিব্রাণ্টার!"

"জিব্রাণ্টার!" স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সারভাদাক। মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বেরুলো না। কাউণ্ট টিমাসচেফও হতভম্ভ হয়ে গেলেন কর্ণেলের কথা শুনে।

"জিব্রাণ্টার!" অস্ফুট কণ্ঠে অবশেষে বললেন সারভাদাক। "কিন্তু জিব্রাণ্টার তো ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম-প্রান্তে, আর আমরা চলেছিলাম পূবদিকে!"

রহস্য! আবার রহস্য! কে জবাব দেবে দুর্বোধ্য এই হেঁয়ালীর?

যার-পর-নাই বিস্মিত হয়ে জাহাজে ফিরে এলেন কাউণ্ট এবং সারভাদাক।

জাহাজ-অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কাউণ্ট—"লেফটেন্যাণ্ট, আমরা সবশুদ্ধ কত মাইল জাহাজে এসেছি বলুন তো?"

"প্রায় ১৪০০ মাইল, স্যার।"

সারভাদাককে বললেন কাউণ্ট—"ব্যাপারটা বুঝলেন? অ্যালজিরিয়া থেকে পুবমুখো রওনা হয়েছিলাম আমরা। তার মানে, আমাদের পথে পড়ত সুয়েজখাল, লোহিত সমুদ্র, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর। এতটা পথ পেরিয়ে আসার পর আসত জিব্রাণ্টার। কিন্তু এতো দেখছি ভূমধ্যসাগবেই ফিরে এসেছি—তাও মাত্র ১৪০০ মাইল পথ গিয়ে?"

শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল সারভাদাকের—"বলেন কী! মাত্র ১৪০০ মাইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ!"

"তাই তো দেখছি। গোটা পৃথিবীটাকে এক চক্কর ঘুরে এসে পৌছোলাম ভূমধ্য সাগরেই।"

"পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে বেজায় ছোট হয়ে গিয়েছে বলতে হবে। পনেরো আনা উধাও হয়েছে আছে মাত্র এক আনা!"

"সোজা কথায় পৃথিবীটা অসম্ভব ছোট হয়ে গিয়েছে, এই তো?" বললেন কাউণ্ট।

"তা আর বলতে! নইলে মাত্র ১৪০০ মাইল জলযাত্রা করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে কেউ পেরেছে?"

এই সময়ে লেফটেন্যাণ্ট প্রোকোপ একটা দামী কথা বললেন।

"দেখুন আমার মনে হয় পৃথিবী বলতে যে গ্রহটাকে বোঝায়, আমরা তার ওপরে নেই।"

"তবে কোথায় আছি?"

"পৃথিবীর একটা চাঁই খসে বেরিয়ে এসেছে। একটা মস্ত চাকলা পৃথিবী থেকে কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে চলেছে সৌর জগতের মধ্যে দিয়ে নতুন কক্ষপথে।"

এ-সম্ভাবনাটা কেউ ভাবেন নি। এ-রকম উদ্ভট থিওরী অন্য সময়ে শুনলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু পূবের সূর্য পশ্চিমে ওঠার মত আজগুবী ঘটনাও যখন সম্ভব হয়েছে, তখন ফ্যানটাসটিক এই থিওরীই বা সত্য হবে না কেন?

দিনের পর দিন জল পথে ভেসে চলল ডোব্রিয়ানা। আরোহীরা কিরকম যেন হয়ে গিয়েছে। প্রাণে ফুর্তি নেই কারো। দিবারাত্র কেবল এক চিন্তা— সবুজ পৃথিবীর এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে কে দায়ী?

এই সময়ে হঠাৎ একদিন একটা বোতল ভেসে আসতে দেখা গেল ঢেউয়ের মাথায়।

তৎক্ষণাৎ ভাসমান বোতলটা তুলে আনা হল ডেকে। হাতে নিয়ে কাউণ্ট দেখলেন, জিনিসটা বোতল নয়—টেলিস্কোপের খাপ। ভেতরে একটা চিরকুট।

চিরকুটে চোখ বুলিয়ে কাউণ্ট বললেন—"মোট চারটে ভাষায় লেখা চিঠি! ফরাসী, ইংরেজী, ইটালিয়ান আর ল্যাটিন। একটা মাত্র শব্দ লেখা—'গ্যালিয়া'। আর একটা হিসেব—পনেরই ফেব্রুয়ারী সূর্য থেকে আমাদের দূরত্ব।"

"লেখক নিশ্চয় পণ্ডিত মানুষ" সাগ্রহে বললেন সারভাদাক।

"আব গ্যালিয়া বোধ হয় আমাদের এই নতুন ক্ষুদে গ্রহটার নাম।"

"কিন্তু তিনি কোথায়?" আপন মনে বললেন কাউণ্ট। "চার চারটে ভাষায় যাঁর সমান দখল, যিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিলক্ষণ পণ্ডিত, তাঁর ঠিকানাটি যদি জানা যেত!

অব্যাহত রইল অনুসন্ধান অভিযান। ভূমধ্যসাগরের বুক চিড়ে সতর্ক প্রহরীর মত এগিয়ে চলল ডোব্রিয়ানা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

হঠাৎ একদিন আর একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা বিচার করে মনে হল তা সারডিনিয়ার কাছাকাছি কোথাও।

দ্বীপে নেমে পড়লেন সারভাদাক এবং কাউণ্ট। ঘাস জমিতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। একটা ছাগল চেয়ে আছে ওঁদের দিকে। শুধু তাকিয়ে

নেই, রকম সকম দেখে মনে হল যেন অভিযাত্রীদের তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করছে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! সারভাদাক দেখে শুনে বললেন—"চলুন না দেখে আসা যাক কোথায় নিয়ে যেতে চায়।"

দুজনে এগোলেন ছাগলের পিছু পিছু। গুট গুট করে ছাগল গিয়ে পৌঁছোলো একটা গুহার মুখে।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা মেয়ে। পরনে ছিন্ন পোশাক। শীর্ণ মুখে অনেক কষ্টের ছাপ।

সারভাদাককে সামনে দেখেই ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি। কাঁদো কাঁদো মুখে বললে—"মারবেন নাকি আমাকে?"

এগিয়ে গেলেন সারভাদাক। স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন—"আরে না! খুকী, তোমার নাম কী?"

"নিনা। ঐ যে ছাগলটা আমার ছাগল ওর নাম মার্জি। একদিন রাত্রে ভীষণ ঝাঁকুনিতে পৃথিবীটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তারপর থেকে দুজনে রয়েছি এখানে।"

নিনা আর মার্জিকে নিয়ে সারভাদাক জাহাজে ফিরে এলেন। ডোব্রিযান' এবার এগিয়ে চলল বেনজুফ যে-দ্বীপে রয়েছে, সেই দিকে।

যথা সময়ে দ্বীপ পৌঁছোলো ডোব্রিয়ানা। ছোট নৌকো নিয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে দ্বীপে উঠলেন সারভাদাক। বেনজুফ ভালো আছে তো?

এমন সময়ে দেখা গেল বেনজুফকে। দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে হাতে বন্দুক। গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল সারভাদাককে দেখে—"চোর, ক্যাপ্টেন, চোরের জ্বালায় আর পারছিনা!"

ঘাবড়ে গেলেন সারভাদাক—"চোর! কি হয়েছে বেনজুফ?"

বেনজুফ পেছন ফিরেই লাফাতে লাফাতে দৌড়োলো দ্বীপের ভেতর দিকে। দুহাত মাথায় ওপর তুলে চেঁচাতে লাগল তারস্বরে—"দেখছেন না? ঐ দেখুন! চোর! চোর!"

এইবার দেখতে পেলেন সারভাদাক।

পালে পালে পাখী নামছে আকাশ থেকে। মেঘের মত পাখীর দল শূন্যে উঠছে সবুজ শস্যক্ষেত্র ছেড়ে। পাখী কোথায় নেই? গাছে পাখী, মাঠে পাখী, পাহাড়ে পাখী। সর্বত্র পাখী। ছোট্ট দ্বীপটা যেন পক্ষীরাজ্যের রাজধানী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লাফাতে লাফাতে ছুটতে বেনজুফ আর চেঁচাচ্ছে বিকট গলায়—"পিশাচ!

পিশাচ পাখীর দল সব খেয়ে ফেলল গো! ফসল, ফল—কিছু আর বাকী রাখল না। ক্যাপ্টেন আপনি গিয়ে ইস্তক আমি কেবল বন্দুক ছুঁড়ে পাখী তাড়িয়ে চলেছি। হেই! হেই! যাঃ!"

বেচারী বেনজুফ! সার্টের বোতাম খুলে গেছে। চেহারাও রীতিমত উদভ্রান্ত পক্ষীকুলের সঙ্গে একক লড়াইয়ের ফলে।

সারভাদাক বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন—"পাখীদের আর দোষ কি বলো? টহল দিয়ে দেখলাম তো, খাবার কোথায়? পাখীর দল তাই এই দ্বীপেই জড়ো হয়েছে ক্ষিদের জ্বালায়।"

"ক্যাপ্টেন, পুরোনো পৃথিবীর খবর কী?"

"এই মুহূর্তে তা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে।" বলে, বেনজুফকে বুঝিয়ে বললেন সারভাদাক। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট্ট একটা ভূখণ্ড উড়ে চলেছে সৌরজগতের নতুন কক্ষপথে।

শুনতে শুনতে ভেঙে পড়ল বেনজুফ—"হতেই পারেনা! না না· কিছুতেই তা হতে পারে না।"

"বেনজুফ, সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। সত্যিই আমরা আর পুরোনো পৃথিবীর ওপরে নেই। ফিরে যাওয়ার পথ যখন বন্ধ, তখন এসো সবাই মিলে হাত লাগিয়ে এই দ্বীপটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিই। পাকাপাকিভাবে এইখানেই থেকে যাই। দ্বীপের বাসিন্দা হবে মোটে এগারোজন। কাউন্ট, তাঁর মাঝি মাল্লা, তুমি, আমি আর নিনা। এগারো জনের খাবার এ-দ্বীপ থেকেই পাওয়া যাবে।"

"মাফ করবেন স্যার," বলল বেনজুফ—"আমরা এখন বাইশ জন।"

"বাইশ জন! কিভাবে?"

পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল বেনজুফ—"আপনি চলে যাওয়ার পর একটা বাণিজ্য জাহাজ এসেছিল দ্বীপে। স্পেন দেশের জাহাজ। নাম, হানসা। জাহাজের মালিক একজন বড় কারবারী। নাম, অ্যালগর হাকাবুট। এই মুহূর্তে ওরা দ্বীপের অন্য প্রান্তে চাষবাস করছে। সব মিলিয়ে ওরা দশজন—একজন তো একেবারেই নাবালক।"

"বেশ তো," বললেন সারভাদাক, "মেহনৎ করলে, ভাল করে চাষ করলে, দ্বীপ থেকে বাইশ জনের খাবার উঠবে না?"

"অঢেল হয়ে যাবে। এ-ছাড়াও আপনি রাশি রাশি কফি, চিনি, তামাক, বারুদ যন্ত্রপাতি আর জামা কাপড় পাবেন হাকাবুটের জাহাজে।"

"খাবার দাবার জামা কাপড়ের অভাব হবে না বোঝা গেল, কিন্তু সমস্যা তো অন্য দিক দিয়ে আসছে," চিন্তিত মুখে বললেন কাউন্ট।

"আবার কি সমস্যা ?"

"ক্যাপ্টেন, আমরা কিন্তু ক্রমশর সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। যতই যাচ্ছি, ততই কিন্তু ঠাণ্ডা বাড়ছে। শীগগিরই এমন অবস্থা আসবে যে ঠাণ্ডা আর সহ্য করা যাবে না—প্রাণ পর্যন্ত টিকিযে রাখা মুস্কিল হবে। দুর্জয় সেই ঠাণ্ডাকে বাগে আনার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন কী ?"

সারভাদাক বলে উঠলেন—"মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে অথবা পাতাল গুহায শীতকাল কাটিয়ে দিলে হয় না ?"

মতলবটা মনে ধরল কাউণ্টের। বললেন—"চমৎকার আইডিয়া। আসুন কাল থেকেই লেগে পড়া যাক। সময় বিশেষ নেই।"

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল মাটি খোঁড়ার কাজ। কিন্তু বেশীদূর কাজ এগোলো না। গাঁইতি গিয়ে ঠেকলো শক্ত পাথরে। আগুন ঠিকরে গেল গাঁইতির ডগা দিয়ে, কিন্তু কঠিন পাথরকে টলানো গেল না।

অসম্ভব ? কঠিন এই শিলাস্তর ভেদ করে পাতাল প্রবেশ অসম্ভব। হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল সকলে।

ততক্ষণে শীতের কামড শুরু হযে গিযেছে। শূন্য তাপাংকের ছ-ডিগ্রী নীচে পৌঁছেছে থার্মোমিটারের পারা।

লেফটেন্যাণ্ট শংকিত কণ্ঠে বললেন—"বিকল্প ব্যবস্থা এখুনি না করলেই নয়। টেম্পারেচার আরো নামবে।"

সারা দ্বীপ তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। অভাবনীয় ঠাণ্ডায মৃত্যু এড়োতে হলে গরম জায়গা চাই। এমন একটা নিবাস প্রয়োজন যেখানে মহাশূন্যের ভয়ংকর শৈত্য মাথা কুটে ফিরে যাবে—মুষ্টিমেয় মানুষ কজনের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেনা। কিন্তু বৃথাই হন্যে হযে খুঁজল সবাই। সেরকম নিরাপদ কোটরের সন্ধান পাওয়া গেল না কোথাও।

সন্ধ্যে হয়েছে। শুকনো মুখে সমুদ্রতীরে দাঁড়িযে লেফটেন্যাণ্ট প্রোকোপ, কাউণ্ট এবং সারভাদাক। কারো মুখে কথা নেই।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন লেফটেন্যাণ্ট—"আলো! আলো! দিগন্তে একটা আলো দেখা যাচ্ছে !"

"জাহাজে নাকি ?" বললেন কাউণ্ট।

"কিন্তু আলোটা তো নড়ছে না। জাহাজ হলে নিশ্চয় সরে সরে যেতো" বললেন, জাহাজ অফিসার। "তাছাড়া বাতাসে একটা কম্পনও অনুভব করছি আমি।"

উজ্জ্বল হল সারভাদাকের মুখ। মন জোড়া নিঃসীম নৈরাশ্যর মধ্যে দেখা দিল আশার ক্ষীণ রেখা।

বললেন ব্যগ্র কণ্ঠে—"আগ্নেয়গিরি নয় তো?"

"আগ্নেয়গিরি!"

"আগ্নেয়গিরি ছাড়া বাতাসে কাঁপন জাগাতে আর কেউ পারে কী? আমার অনুমান যদি সত্যি হয়," সহর্ষে বললেন সারভাদাক, "আমাদের সমস্যার সমাধানও তাহলে হয়ে গেল। ঠাণ্ডা পড়ুক, অফুরন্ত তাপ জুগিয়ে যাবে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত জঠর!"

ভাল কাজে দেরী করা ভুল। সুতরাং পরের দিন অভিযাত্রীরা রওনা হলেন আলোর উৎস-সন্ধানে। দূর থেকে দেখা গেল আগ্নেয়গিরির দানবিক বপু। জ্বালা মুখ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, আগুন ছিটকোচ্ছে, লাভা গড়াচ্ছে।

দ্বীপের আরো কাছে এগিয়ে গেল নৌকো। কাউণ্ট বললেন—"লাভার স্রোত গড়াচ্ছে আগুন-পাহাড়ের ওদিকে। সুতরাং এদিকে আমরা নামতে পারি নির্ভয়ে।"

দ্বীপের পাথুরে বুকে পা দিলেন কাউণ্ট। আগ্নেযগিরির চুড়ো দিয়ে সমানে আগুন, ছাই, লাভা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু দাপাদাপি নেই। অগ্ন্যুৎপাত বলতে যে-রকম ভয়ংকর একটা ব্যাপার বোঝায়—সেরকম কিছু নয়। বিস্ফোরণ নেই, ভূগর্ভের প্রচণ্ড চাপে আকাশের বহু উঁচুতে পাথর ছিটকে যাওযা নেই, গুরু-গুরু-গুম-গুম শব্দে হৃদস্পন্দন দ্রুত করার প্রচেষ্টাও নেই।

দেখেশুনে বললেন কাউণ্ট—"বাস্তবিকই, এ রকম শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভলক্যানো আমি জীবনে দেখিনি বাপু। হৈ-হৈ করে অগ্ন্যুদগারের চিহ্নমাত্র নেই, কেবল জ্বলন্ত লাভার স্রোত ধীরস্থিরভাবে গড়িয়ে পড়ছে জ্বালামুখ থেকে।"

শুরু হল পর্বতারোহণ। কিছুদূর ওঠার পর পাওয়া গেল একটা গভীর গর্ত। দেখেই খটকা লাগল লেফটেন্যাণ্ট প্রোকোপের।

তিনিই বললেন—"সুড়ঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক ভেতরে ঢুকে।"

গর্তের মুখ দিয়ে একে একে ভেতরে প্রবেশ করলেন অভিযাত্রীরা। বিরাট একটা গহ্বর। ছাদ থেকে ঝুলছে লাইম কারবোনেটের সরু সুতো। যেন অজস্র ঝালর দিয়ে প্রকৃতিদেবী সাজিয়ে রেখেছেন পর্বত প্রকোষ্ঠকে। স্ট্যালাগমাইটের ওপর আলো ঠিকরে যাচ্ছে সহস্র রোশনাই হয়ে—যেন রোশনাই বিকিরণ করছে অগণিত ঝাড় লণ্ঠন।

সবচাইতে আশার কথা, পর্বত-কন্দর বেশ উষ্ণ। বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা হার মেনেছে আগুন-পাহাড়ের গোপন-বিবরে।

উল্লসিত হলেন অভিযাত্রীরা। আর কী। বিধাতা স্বয়ং আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন ভাগ্যহত কটি মানুষের জন্যে। বিচ্ছিন্ন পৃথিবীখণ্ড উধাও হোক সৌরজগতের তুহিন শীতল অজ্ঞাত অঞ্চলে, আসুক শৈত্য নামক দৈত্য — অফুরন্ত অগ্নির উত্তাপে নিশ্চিন্ত থাকবে বাইশজন পৃথিবীবাসী।

আচম্বিতে সুড়ঙ্গ-পথ ফুরিয়ে গেল। সামনে আরও প্রকাণ্ড একটা গহ্বর। এত উঁচু গহ্বর যে ঠাহর করে ছাদ দেখা মুস্কিল। তাছাড়া লম্বা লম্বা স্ট্যালাগমাইটের ঝালর ঝুলছে সমস্ত ছাদ জুড়ে। ঠিক যেন জল ঝরতে ঝরতে স্থির হয়ে জমে গিয়েছে যাদুমন্ত্র বলে। দেওয়ালে আগ্নেয়শিলার পলস্তারা। লাভা জমাট বেঁধে মসৃণ করে রেখেছে মেঝে। শিলাস্ফটিক, চকমকি পাথর আর গ্র্যানাইট ছড়িয়ে আছে এদিকে সেদিকে।

গহ্বরের এই আশ্চর্য সৌন্দর্যের দিকে চোখ ছিল না ভাগ্যহত মানুষ কজনের। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে ওরা দেখছিলেন সামনের জ্বলন্ত লাভার স্রোতকে।

গহ্বর যেখানে শেষ হয়েছে, সুদূর সেই প্রান্তে গলিত লাভা গড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে। আগুন জ্বলছে লাভার ওপর, লাল আভায় উদ্ভাসিত অন্ধকারময় গহ্বরের বহুদূর পর্যন্ত গনগনে আঁচে আরামদায়কভাবে উষ্ণ সুবিশাল পর্বত-কন্দর! লক্ষ চুল্লী একসঙ্গে জ্বালিয়েও বুঝি এমন মোলায়েম উষ্ণতা সৃষ্টি করা যায় না শীতার্ত রাতে।

ক্যাপ্টেন কাউন্ট এবং লেফটেন্যান্ট বিস্ফারিত চোখে কতক্ষণ যে চেয়ে রইলেন প্রকৃতির হাতে গড়া কল্পনাতীত এবং অবর্ণনীয় সেই ফায়ার প্লেসের দিকে তার ইয়ত্তা নেই।

সেইখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক হয়ে গেল। আর দেরী নয়। করোস্কো এই পর্বত-কন্দরে সরিয়ে আনতে হবে ক্ষুদ্র কলোনীর মানুষ ক'জনকে।

পরের দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম শুরু করল দ্বীপবাসীরা। ঘোড়া আর ছাগলের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে তোলা হল জাহাজে। জাহাজ থেকে খাবারদাবার এবং যাবতীয় জিনিসপত্র পৌঁছোলো আগুন পাহাড়ের উষ্ণ জঠরে। তিন-তিনটে দিন গেল শুধু বাসা পাল্টাতে।

বাসার মত বাসা পাওয়া গেল পর্বত-গহ্বরে লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখালেন, গহ্বরটা আসলে যেন একটা দানবিক মৌচাক। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আর গুহার সারি সাজানো মস্ত গহ্বরের দেওয়ালে।

নিনা ওর প্রিয় ছাগল মার্জিকে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল ভলক্যানোর পেটের মধ্যে সাজানো এই আশ্চর্য প্রস্তর নিবাস।

সারভাদাক তাই দেখে বললেন—"বন্ধুগণ! আজ থেকে নতুন বাড়ীর নাম হোক আমাদের কনিষ্ঠতম বাসিন্দা নিনার নামে। 'নিনা-হাইভ' আমাদের রক্ষে করবে শীতের প্রকোপ থেকে। শীত যত লম্বাই হোক না কেন, ভয় পাইনা আমরা। জয় হোক 'নিনা-হাউভ'এর!"

মহাশূন্যের পথচারী ক'জন নতুন করে জীবন শুরু করেছে আগ্নেয়গিরির উদরে। প্রলয় দেবতার সঙ্গে সহাবস্থান মন্দ লাগছে না কারোরই। এ-এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

প্রায়ই সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন কাউন্ট, ক্যাপ্টেন আর লেফটেন্যান্ট। রোজই দেখেন জল কাঁচের মত স্থির, টলটলে। জমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ টেম্পারেচার কোনকালে নেমে গিয়েছে জিরো ডিগ্রীর নীচে।

কারণটা অবশ্য অজানা নয়। সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত থাকার দরুন তা জমে বরফ হতে পারছে না।

ভলক্যানোর গায়ে পায়চারী করতে করতে একদিন বললেন কাউন্ট—"জানি না সম্ভব হবে কিনা, কিন্তু পুরোনো দ্বীপে গেলে কিছু শিকার করে আনা যেত।"

"কিন্তু এখন যাবেন কি করে?" বললেন সওদাগর হ্যাকাবুট। "শীত শেষ না হলে তো জাহাজ বা নৌকো কোনোটাই বার করা যাবে না।"

"এক কাজ করলে হয় না," বললেন লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ। "জাহাজে আইস-স্কেট আছে। সমুদ্র জমে বরফ হয়ে গেলে স্কেটিং করে দ্বীপে চলে যাওয়া যেত বরফের ওপর দিয়ে। চাকাওলা লোহার জুতোয় গড়গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া যেত অনায়াসে।"

কিন্তু সমুদ্র তো জমেনি! অথচ তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রীর নীচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের পুরু আস্তরণে ঢেকে যাওয়া উচিত ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ।

হঠাৎ একটা মতলব এল কাউণ্টের মাথায়। উনি বললেন—

"যদিও শোনা কথা, তাহলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?"

"কি বলুন তো?"

"চারদিক যখন কনকনে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে, অথচ কোনো জল অত্যন্ত শান্তশিষ্ট থাকার দরুন বরফ হতে চাইছে না, ছিনেজোঁকের মত

তরল থেকে গিয়েছে—তখন তার ট্যাঁটামো ভাঙতে হলে জলটাকে সামান্য ঝাঁকিয়ে দিতে হয়।"

নিনা গরম জামা পরে সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কাউন্ট তাকে ডাকলেন সস্নেহে। এক টুকরো বরফ তুলে নিয়ে তার হাতে দিলেন।

বললেন—"নিনা, বরফটা ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলতে পারবে ?"

"কেন পারব না ?"

ওঁরা তখন দাঁড়িয়ে রইলেন উঁচু পাথরের ওপর। বহু নীচে টলটল করছে সাগরের নীল জল। নিনা খিলখিল করে হেসে টুপ করে বরফের টুকরো ফেলে দিল নীচে।

ম্যাজিক ঘটে গেল যেন পরের মুহূর্তে !

বরফ-খণ্ড জল স্পর্শ করতেই বুঝি শিউরে উঠল টলটলে জলপৃষ্ঠ। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এমনি একটা শিহরণ নিস্তরঙ্গ নিস্পন্দ জলরাশিকে রোমাঞ্চিত করল মুহূর্তের জন্যে। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি একবার মাত্র কেঁপে উঠেই রূপান্তরিত একখণ্ড বরফে !

সাদা বরফের একটি মাত্র চাদরে নিমেষ মধ্যে ছেয়ে গেল দিক হতে দিগন্ত। মাঝখানে মাথা উঁচু করে রইল ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। অদূরে দুটি জাহাজ !

কিছুক্ষণ আগেই যা ছিল লালবর্ণ, চোখের পলকে তা হল শ্বেতবর্ণ !

টেম্পারেচার কিন্তু ক্রমশঃই কমতে লাগল। প্রতিদিনই দেখা গেল সমান হারে নামছে তাপমাত্রা। সব কিছুই বরফে ঢেকে যাওয়ায় পক্ষীকুল পড়ল বিপদে। খাবার কোথায় ? সামান্য যেটুকু স্থলভাগ জেগে ছিল বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে, তাও ঢেকে গেছে বরফের চাদরে। খাদ্যের সন্ধানে তাই হন্যে হয়ে উড়তে উড়তে পক্ষীবাহিনী হানা দিল আগ্নেয়গিরির গোপন কন্দরে—ভাগ্যহত ক'টি মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থলে।

সেকি কাণ্ড ! বিশাল আকারের অ্যালবেট্রস উড়ছে ডানার প্রচণ্ড ঝাপটায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে। অধিকাংশ পাখীই আগ্নেয়গিরির গায়ে বসে থাকত সামান্য ঐ তাতটুকুর লোভে। মাঝে মাঝে কয়েকটা পাখী ডানা ঝটপটিয়ে ঢুকে পড়ত পাহাড়ের ফাটল দিয়ে পর্বত গহ্বরে। লুঠেরা পাখীর দল যা পেত, তাই ছিনিয়ে নিয়ে যেত নখ আর ঠোঁট দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে।

সেদিন আক্রান্ত হল নিনা। গহ্বরের এক কোণে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বসে আছে বেনজুফ। এমন সময়ে নিনা দৌড়ে এল সেখানে। পেছন পেছন ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে এল শ্বেত শুভ্র কয়েকটা অ্যালবেট্রস।

অ্যালবেট্রস পাখীকে আকারের দিক দিয়ে দানব-পাখী বলা যায় অনায়াসেই। ডানা মেললে পাকা দশ ফুট জায়গা নিয়ে উড়ে চলে এক একটা অ্যালবেট্রস। গহ্বরের ভেতরে সেদিন নিনাকে তেড়ে এল এমনি কয়েকটা দানব পাখী।

বেনজুফ সভয়ে দেখল, পাখীগুলো একযোগে ঘিরে ধরেছে বেচারী নিনাকে। ছোঁ মেরেই উড়ে যাচ্ছে, আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিতে চাইছে। নিনা 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চেঁচাচ্ছে আর কি যেন বুকের কাছে আঁকড়ে রেখে দিয়েছে—ছাড়তে চাইছে না কিছুতেই।

বেনজুফ আরো দেখল, দানব-পাখীগুলোর নজর কিন্তু নিনার ওপর নয়—নিনার বুকের কাছে হাত দিয়ে আড়াল করে রাখা সেই বস্তুটির দিকেই।

লাফিয়ে উঠল বেনজুফ। তেড়ে এল মোটা লাঠি নিয়ে। দমাদম করে লাঠি চালিয়ে জখম করল কয়েকটা পাখীকে। মারের চোটে কত পালক যে ঝরে পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই।

ক্ষিদের জ্বালায় হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল যে-পাখীর দল, কোঁৎকা খেয়ে হুঁশ ফিরে এল তাদের। ঝটপট ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল গহ্বরের বাইরে।

নিনা তখনো দাঁড়িয়ে বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে। বাহুর ফাঁকে সাদামত কিসের পালক দেখা যাচ্ছে যেন।

বেনজুফ কাছে এল। শুধোলো কৌতূহলী কণ্ঠে—"নিনা, কি ওটা?"

"পায়রা।"

"পায়রা! তাই বলো! পায়রাটাকে খাওয়ার লোভেই হতভাগারা ছেঁকে ধরেছিল তোমাকে। তুমিও তো তেমনি মেয়ে। পায়রার জন্যে প্রাণটা দিতে বসেছিলে? ছেড়ে দিলেই তো পারতে।"

"কিন্তু এটা তো সাধারণ পায়রা নয়। এর গলায় একটা থলি বাঁধা রয়েছে যে!" পায়রা তুলে দেখাল নিনা।

"থলি! পায়রার গলায় থলি! জয় ভগবান! অ্যাদ্দিনে মুখ তুলে চাইলে?" বলেই, নিনার হাত থেকে পায়রাটা ছিনিয়ে নিয়ে বেনজুফ দৌড়োলো কর্তাদের কাছে।

বেনজুফকে পায়রা হাতে ছুটে আসতে দেখেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন সারভাদাক। ব্যাপার কি? পেছনে নিনাও যে-ছুটে আসছে?

"ক্যাপ্টেন, দেখুন নিনা কি এনেছে!"

"পায়রার গলায় থলি! অজ্ঞাত বন্ধুর আরেকটা বার্তা মনে হচ্ছে!"

ছোঁ মেরে থলিটা তুলে নিলেন সারভাদাক। থলির ভেতরে সত্যি সত্যিই একটা চিরকুট।

পড়ে মর্মার্থ শোনালেন সারভাদাক—"অজ্ঞাত বন্ধু আবার জানিয়েছেন, পয়লা এপ্রিল সূর্যদেব আমাদের কাছ থেকে কত মাইল দূরে ছিলেন! আরো কিছু লেখা ছিল দেখছি। খাবার দাবার ফুরিয়ে আসছে ভদ্রলোকের·· কিন্তু বাকী লেখাটা হতভাগা পাখীগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। তিনি কোথায়, তা না জানলে তাঁকে উদ্ধার করা তো সম্ভব নয়।"

বিশাল গহ্বরের অগণিত প্রকোষ্ঠে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলল সারভাদাকের আক্ষেপধ্বনি। সতিই তো! ঠিক কোন অঞ্চলে অজ্ঞাত বাস করছেন অজ্ঞাত বন্ধু, তা না জানলে উদ্ধার পার্টি রওনা হয় কি করে?

নিনা হঠাৎ বলে উঠল—"দেখুন, দেখুন, পায়রার ডানায় কিসের ছাপ দেখুন!"

ঝুঁকে পড়লেন সারভাদাক। সাদা ডানার ওপর একটা অস্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে বটে! ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে এল।

বললেন—"আরে! এযে দেখছি ডাকটিকিটের ছাপ, জায়গাটার নামও দেখা যাচ্ছে—ফোরমেনটেরা।"

"এ জায়গা আমি চিনি," উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট টিমাসচেফ। "স্পেনের গায়ে ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ হল ফোরমেনটেরা। এখান থেকে ফোরমেনটেরার দূরত্ব প্রায় ৩৬০ মাইল।"

সারভাদাক বললেন--"আমাদের উচিত এখুনি গিয়ে ভদ্রলোককে সাহায্য করা। স্কেটিং করে আমি একাই চলে যাব এখন বরফের ওপর দিয়ে।"

"আপনি মহানুভব, ক্যাপ্টেন সারভাদাক, সীমা নেই আপনার সাহসের।" বললেন কাউন্ট টিমাসচেফ। "কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা সুবিধের নয় মোটেই। তা সত্ত্বেও না হয় পৌঁছে গেলেন আপনি কিন্তু যাঁকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন, তিনি যদি রুগ্ন, কাহিল অবস্থায় থাকেন—তখন করবেন কী? কি ভাবে আনবেন তাঁকে?"

"আমি একটা উপায় বাৎলাতে পারি," বললেন লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ।

"কি উপায়?"

"ডোব্রিয়ানায় যে ছোট নৌকো আছে, তার তলায় লোহার রেল আর ওপরে পাল খাটিয়ে নিলে হাওয়ার টানে বরফের ওপর দিয়ে লোহা পিছলে নৌকো পৌঁছে যাবে ফোরমেনটেরা দ্বীপে।"

"ব্র্যাভো, লেফটেন্যান্ট।" তারিফ ভরা কণ্ঠে বললেন সারভাদাক। "চমৎকার আইডিয়া! চলুন, এখুনি রেল আর মাস্তুল ফিট করে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কিন্তু স্যার," বললেন লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ—"আপনি একা তো নৌকো নিয়ে পাল খাটিয়ে যেতে পারবেন না। অভিজ্ঞ নাবিক থাকা দরকার আপনার সঙ্গে। আপনার সঙ্গে থেকে ও-দায়ীত্বটা আমি আমার কাঁধে রাখতে চাই।"

"বেশ।"

পরের দিন সকালেই নৌকো তৈরী হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আর লেফটেন্যান্ট পাল খাটিয়ে দিলেন। হাওয়ার টানে লোহার পাত ছুটো কঠিন বরফের ওপর দিয়ে পিছলে গেল আশ্চর্য গতিবেগে। দেখতে দেখতে আরোহী সমেত বিচিত্র বরফ-যান মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত এক নাগাড়ে বরফের ওপর দিয়ে হুড়কে এগিয়ে চলল নৌকো। দুই আরোহী ঠায় বসে বরফ-যান চালিয়ে নিয়ে চললেন গন্তব্যস্থানের দিকে। ধু-ধু বরফের চাদর পাতা দিগন্ত পর্যন্ত। এক সময়ে এখানে ছিল জল—দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। এখন শুধু বরফ আর বরফ।

ভোর রাতের দিকে দেখা গেল ছোট্ট একটা ভূখণ্ড।

"ফোরমেনটেরা!" সোল্লাসে বললেন লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ।

সূর্য তখন উঁকি দিয়েছে বরফ-দিগন্তে।

ছোট্ট দ্বীপটায় পা দিলেন দুই অভিযাত্রী। সারা দ্বীপে কুটির বলতে একটি-ই। হন্তদন্ত হয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন দুজনে।

খাটে শুয়ে এক বৃদ্ধ। চুলহীন মাথা। নাকের ডগায় চশমা। চোখের পাতা বন্ধ। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, বোঝা যাচ্ছে না।

"মারা গেছেন নাকি?" শুধোলেন সারভাদাক।

"না। প্রাণ আছে এখনো," নাড়ি ধরে বললেন প্রোকোপ।

তৎক্ষণাৎ কম্বল দিয়ে বেশ করে মোড়া হল বৃদ্ধকে। ধরাধরি করে অচেতন-অবস্থায় তাঁকে তোলা হল নৌকোর মধ্যে। নৌকো হু-হু করে ফিরে চলল আগ্নেয়গিরি-নিবাসের দিকে।

পর্বত-গহ্বরে ফিরে শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হল জ্ঞানহীন বৃদ্ধকে।

একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন সারভাদাক। হঠাৎ বললেন তিনি —"এঁকে খুব চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন দেখেছি।"

ঠিক এই সময়ে নাটকীয় ভাবে মুহূর্তের জন্যে চোখ মেললেন বিরল কেশ বৃদ্ধ। বললেন জড়িত কণ্ঠে—"সারভাদাক, কালকেই ৫০০ লাইন লিখে আন। চাই।"

দপ করে স্মৃতির আলো জ্বলে উঠল সারভাদাকের চোখে।

বললেন অবাক কণ্ঠে—"আরে! এ-যে প্রফেসর পালমিরিন রোসেট্টি—আমাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়াতেন!...প্রফেসর· ·প্রফেসর...আমি সারভাদাক বলছি...!"

"ক্যাপ্টেন, উনি কিন্তু ফের ঘুমিয়ে পড়েছেন," বলল বেনজুফ—"এখন ডাকাডাকি না করাই মঙ্গল।"

"বেনজুফ," উত্তেজিত কণ্ঠ সারভাদাকের—"প্রফেসর শেষ ঘুম ঘুমোলেন কিনা জানি না। এ-ঘুম যদি ভাঙে তো ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পাবে কেন এ-হাল হয়েছে আমাদের।"

"উনি এখন স্বাভাবিক ঘুম ঘুমোচ্ছেন। এই সময়ে ওঁকে বিরক্ত না করাই ভাল। কিচ্ছুক্ষণ পরেই দেখবেন উনি সুস্থ হয়ে গেছেন।"

সমস্ত দিন সমস্ত রাত একটানা নিদ্রার পর ভোর বেলা ঘুম ভাঙল প্রফেসরের। বিছানার পাশে বসে উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন কাউণ্ট। মাসচেধ আর ক্যাপ্টেন সারভাদাক।

বালিশে পিঠ দিয়ে বসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ প্রফেসর- "গ্যালিয়া সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কী?"

"গ্যালিয়া!" কাষ্ঠহেসে বললেন সারভাদাক—"পৃথিবীর যে টুকরোটার ওপর বর্তমানে আমরা রয়েছি, আপনি বুঝি একেই গ্যালিয়া নাম দিয়েছেন?"

"না-হে না! যার পিঠে চড়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে বেরিয়েছি, গ্যালিয়া তার নাম। আমারই দেওয়া নাম।"

"পিঠে চড়েছি?

"কার পিঠে প্রফেসর?" বিমূঢ় কণ্ঠ সারভাদাকের।

"ধূমকেতুর!"

"অবিশ্বাস্য!" অস্ফুটকণ্ঠে বললেন কাউণ্ট।

কথাটা যেন শুনতে পান নি, এমনি ভাবে বললেন প্রফেসর সারভাদাক—"দেখো বাপু, পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষর বহু আগে থেকেই ধূমকেতুটাকে চোখে চোখে রেখেছিলাম আমি। সেই জন্যেই আমি জানি কি ঘটেছে একত্রিশে ডিসেম্বরের রাতে। ধূমকেতুর ধাক্কায় পৃথিবীর খানিকটা অংশ ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ধূমকেতু সেই ভাঙা টুকরোটাই পিঠে নিয়ে ছুটে চলেছে মহাশূন্য দিয়ে।"

"তাই যদি বলেন স্যার," শুধোলেন সারভাদাক—"ধূমকেতুর তো শুনেছি অনেক জাত থাকে। এটা কি জাতের ?"

"এ-হল 'পিরিয়ডিক' ধূমকেতু। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘুরে ফিরে আসে একই জায়গায়।"

চোখ জ্বলে উঠল সারভাদাকের—"তার মানে আপনি বলতে চান আমাদের বাহন ধূমকেতুও একদিন পৃথিবীতে ফিরে যাবে ?"

"হ্যাঁ, যাবে। পৃথিবীর কাছছাড়া হওয়ার ঠিক দুবছর পরে আবার যাবে পৃথিবীর কাছে।"

সোল্লাসে বললেন কাউন্ট—"হুররে! তাহলে তো দুর্ভোগ কাটিয়ে এনেছি বলতে হবে। এক বছর তো হয়েই গেল। বাকী রইল আর একটা বছর!"

সারভাদাকেরও কম আনন্দ হয় নি সুসংবাদটা শুনে। খুশী-উজ্জ্বল মুখে তিনি প্রস্তাব করলেন—"তাহলে আসুন ধূমকেতুর পিঠে চড়ার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করি আমরা ভাল-মন্দ খেয়ে।"

"চমৎকার প্রস্তাব!" সায় দিলেন কাউন্ট টিমাসচেফ,—"খানা-ও খানাপিনা।"

পয়লা জানুয়ারী।

আগ্নেয়গিরির উষ্ণ নিবাস। ভোজসভা সরগরম। হুল্লোড় জুড়েছেন ধূমকেতু-আরোহীরা। ভাল-মন্দ খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন সারভাদাক।

বললেন—"আমার আর একটা প্রস্তাব আছে। চলুন গরম জামা-কাপড় পরে আইস-স্কেটিং করে আসি সবাই মিলে।"

"উত্তম প্রস্তাব।" বলে লাফিয়ে উঠলেন বাকী সকলে। মোটা মোটা শীতবস্ত্র পরে পায়ে চাকাওলা লোহার জুতো লাগিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ হল ঝকঝকে সাদা বরফের ওপর। গড়গড় করে বরফের ওপর দিয়ে পিছলে গেল সবাই দিকে-দিকে। উল্লাসে-আনন্দে যেন ফেটে পড়তে চাইল বাইশ জনের ছোট্ট দলটা।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। রাত নামছে।

"মশাল জ্বালাও, ফিরতে হবে তো," বললেন সারভাদাক।

অন্ধকারের ধরন দেখে কিন্তু খটকা লেগেছিল প্রোকোপের। জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে তিনি বললেন—"যতটা হওয়া উচিত ছিল, অন্ধকার দেখছি তার চাইতে বেশী। ব্যাপার কী ?"

ব্যাপারটা জানা গেল আগ্নেয়গিরিতে ফিরে আসার পরেই!

পর্বত-গহ্বরে প্রবেশ করে থ হয়ে গেল ধূমকেতু-আরোহীরা!

আগুন-পাহাড়ের আগুন নিভে গিয়েছে! অসময়ে আঁধার ঘনিয়েছে ঐ কারণেই। অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে আগ্নেয়গিরির!

বড় হলঘরটায় জমায়েৎ হল সবাই। এ-যে বড় ভয়ানক কথা! আগুন পাহাড়ের ভরসাতেই নতুন করে সংসার সাজিয়ে বসা গিয়েছিল নিভৃত এই পর্বত বন্দরে। পাহাড়ের গরম, আগুনের আঁচ-কে হাতিয়ার বানিয়ে এতদিন ধরে ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল দুর্জয় শীতকে। এখন? উত্তাপের মূল উৎসই যে গেল নিভে।

কাউন্টের মনের বল অপরিসীম। এত সহজে ভেঙে পড়ার পাত্র তিনি নন। আগুন-পাহাড়ের আগুন নিভেছে হয়ত বাইরের দিকে। এত বড় একটা আগ্নেয়গিরি চক্ষের পলকে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এ-হতেই পারে না। আরো গভীরে কোথাও না কোথাও আগুন নিশ্চয় আছে এখনো। হয়ত সে আগুনের তেজ কমে এসেছে। কিন্তু যা আছে, তা নিশ্চয় বাইশ জনের প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

সুতরাং খোঁজ-খোঁজ আরম্ভ হল আগুন-পাহাড়ের আরও গভীরে। বেশী দেরী করা সমীচীন নয় মোটেই। কল্পনাতীত এই ঠাণ্ডা দিন কয়েকের বেশী সহ্য করা যাবে না।

বিশাল পর্বত-গহ্বরের দেওয়াল থেকে বহু সুড়ঙ্গ নেমে গিয়েছিল পাতালের দিকে। জ্বলন্ত মশাল হাতে দুরু-দুরু বুকে সন্ধানী দল নেমে গেল সেই সব পথে।

বেশী খুঁজতে হল না। একটা গুহার দেওয়ালে শিলাস্তর আর জমাট লাভার পলস্তারা দেখে মনে হল, আগ্নেয়গিরির মাঝের কার্নেসে গিয়ে মিশেছে সুড়ঙ্গটা। কিছু দূর গিয়ে দেখা গেল গুহার গা বেশ গরম।

তবে কি গরম দেওয়ালের পেছনেই রয়েছে লাভার ফুরিয়ে আসা শেষ স্রোতটুকু?

অত চিন্তায় কাজ কী? প্রাণের দায়ে যে কোনো কঠোর পরিশ্রমেই তখন প্রত্যেকে রাজী। সুতরাং কালবিলম্ব না করে গাঁইতি শাবলের ঘায়ে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে গেল পাথরের বুক থেকে। মুহুর্মুহু ঠকাং-ঠকাং শব্দে কেঁপে-কেঁপে উঠল পর্বত-গহ্বর। কালঘাম ছুটে গেল মেহনতী পুরুষদেরও। কিন্তু কঠিন আগ্নেয়-শিলার বুকে ফাটল ধরানো গেল না। দেওয়াল ভেঙে লাভা স্রোতের কাছেও পৌঁছোনো গেল না।

সারভাদাকের উর্বর মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খেলে গেল।

বললেন—"বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দাও পাথরের দেওয়াল!"

"ঐটেই এখন আমাদের শেষ উপায়," বললেন কাউন্ট। বারুদ দিয়েও যদি কাজ না হয়, তাহলে আমরা গেছি।"

বিষণ্ণ মুখে কয়েকজন বসে পড়ল পাথরের ওপর। এত পরিশ্রমের এই ফল? ঠাণ্ডায় জমে শোচনীয় মৃত্যু? বিধাতা একী খেলা খেলছেন হতভাগ্য মানুষ কজনের সঙ্গে?

"ভেঙে পড়লে তো চলবে না বন্ধু," বললেন সারভাদাক। "শেষ আশা এখনো দুরাশা হয়নি।"

পুরো তিনটে দিন গেল গাঁইতি দিয়ে পাথর ফুটো করতে। পাথরের ফুটোয় বারুদ ঠেসে সম্পূর্ণ হল বিস্ফোরণের প্রস্তুতি। তারপর পলতেতে আগুন দিয়ে সবাই সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে থর-থর করে কেঁপে উঠল গোটা আগ্নেয়গিরি। ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে কয়েকজন সটান আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর।

পরমুহূর্তেই বিস্ফোরণের স্থানে দৌড়ে গেলেন সারভাদাক এবং টিমাসচেফ।

গ্র্যানাইটের কঠিন দেওয়াল উড়ে গেছে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পাথরের ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে দেওয়ালের গায়ে একটা মস্ত ফুটো। নতুন সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখ।

মশাল জ্বালিয়ে তৎক্ষণাৎ ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে নতুন পর্বত গহ্বরে পা দিলেন অভিযাত্রীরা। পাহাড়ের এই নিভৃত কন্দরে ইতিপূর্বে মানুষের পদচিহ্ন কখনো পড়েনি। আগ্নেয়গিরির জন্ম মুহূর্ত থেকে রুদ্ধ ছিল গহ্বরের প্রবেশ মুখ। প্রবেশাধিকার ছিল না কারোরই।

বুদ্ধিবলে এবং দুঃসাহসকে পাথেয় করে ওঁরা পা দিলেন সেই উষ্ণ অঞ্চলে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে মেঝে নেমে গেছে পাতালের দিকে। দেওয়াল বেশ গরম। বাতাসও উষ্ণ।

জ্বলন্ত মশাল মাথার ওপর তুলে নেমে চললেন ওঁরা। চারিদিকের প্রস্তরের মধ্যে কত বিচিত্র নমুনা গাঁথা। ভূতত্ত্ববিদরা উল্লসিত হবেন শিলাস্তরের সেই বিস্ময়কর বিন্যাস দেখে। আগ্নেয়শিলা, শিলাস্ফটিক, চকমকি, অভ্র, চিকমিক করছে মশালের গনগনে আভায়।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওঁরা নেমে এলেন পাঁচশ ফুট ভূগর্ভে। উষ্ণতা এখানে আরো বেড়েছে। সব চাইতে আশার কথা, হাওয়ার একটা জোরালো স্রোত

হু-হু করে নেমে আসছে পাতাল সুড়ঙ্গে। নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ক্রমে ক্রমে ওঁরা নামলেন ৯০০ ফুট গভীরে। এখানেও মাথার ওপর ঝুলছে স্ট্যালাগমাইট—পাথরের ঝুরি। দেওয়ালে নানা পাথরের কারুকাজ।

সারভাদাক বললেন—"এখানকার তাপমাত্রা দেখছি বেশ সহনীয়। আমার মনে হয়, আর নীচে নামা ঠিক হবে না। বিপদ ঘটতে পারে। কে জানে আগ্নেয়গিরির একদম তলায় কি বিপদ ওৎ পেতে আছে।"

কাউন্ট টিমাসচেফ বললেন—"এ-গহ্বরটা যদিও পুরোনো গহ্বরের মত আরামপ্রদ নয়, তাহলেও প্রাণটাকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে তো?"

চড়াই পথ বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ওঁরা। হেঁকে বললেন সারভাদাক —"আর ভয় নেই। মনের মত গুহা পাওয়া গেছে। জিনিসপত্র এখুনি নামিয়ে নেওয়া যাক পাতাল গহ্বরে।"

কালবিলম্ব না করে শুরু হল ডেরা সরানোর কাজ। বাক্স পেঁটরা, টেবিল চেয়ার, বাসনপত্র, পিপে ভর্তি বারুদ, কফি, চিনি, অন্যান্য খাবার দাবার সমস্তই ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল উৎরাই দিয়ে। সাময়িক ভাবে শৈত্য নামক দৈত্যের খপ্পর এড়িয়ে এল ধূমকেতু আরোহীরা। কিন্তু তারপর? পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন ধূমকেতু বাহিত এই ভূখণ্ডের এইটুকু অগ্নিও যদি নিভে যায়? যদি অন্য কোনো দিক দিয়ে আসে নতুন কোনো বিপদ করাল চেহারা নিয়ে? বাঁচার পথ মিলবে কী?

কে জানে!

সারভাদাক অবশ্য বললেন—"অত ভেঙে পড়ার কি আছে। নতুন বিপদ আসবে, পরিত্রাণের নতুন পথ দেখা দেবে। হতাশ হলে তো চলবে না।"

দেখা যাক!

অতিবাহিত হল দীর্ঘ নটি মাস।

মৃত আগ্নেয়গিরির একদম উদরে কষ্টেসৃষ্টে কাটল এই নটি মাস। ইতিমধ্যে শীতের প্রকোপ কমে এল। দিবালোকে গিরিগুহাবাসীরা পায়চারী করতেন ভলক্যানোর পাদদেশে। রাত হলেই বাড়ত ঠাণ্ডা। তখন আগ্নেয়গিরির জঠরে ফের পলায়ন করা ছাড়া পথ থাকত না।

ঠাণ্ডার দাপট কমে আসায় বরফ গলে গিয়েছে। আবার টলটলে নীল জল দুলছে ভলক্যানো ঘিরে দিগন্ত পর্যন্ত।

সময় এগিয়ে আসছে—পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় আর মাত্র তিন মাস বাকী !

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কাউন্টকে সেই কথাই বলছিলেন সারভাদাক। কাউন্ট শুনলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"কিন্তু একটা কথা ভেবেছেন কী ?"

"কী ?"

"পৃথিবীর ওপর ধূমকেতু আছড়ে পড়লে ধাক্কার চোটে আমরা তো ছাতু হয়ে যাবো।"

"তা কেন," বললেন সারভাদাক। "আমরা যেদিকে আছি, সেই দিকটা পৃথিবীর ওপর পড়লেই গেছি। কিন্তু যদি উল্টো দিকটা পড়ে—"

"ভুল ধারণা আপনার। যেদিকেই সংঘর্ষ লাগুক না কেন, ঝাঁকুনি সব দিকেই মোটামুটি সমান থাকবে। সে ঝাঁকুনি সওয়া মানুষের হাড়ের ক্ষমতা নেই। ঝাঁকুনি ছাড়াও আর একটা বিপদ আছে। টেম্পারেচার।"

"টেম্পারেচার ?"

"জানেন তো, ছুটন্ত ধূমকেতু কোনো কারণে যদি হঠাৎ বাধা পায়, তাহলে তীব্র উত্তাপ ঠিকরে আসে তার গা থেকে। সে উত্তাপ এত ভীষণ যে পোকা মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হওয়া ছাড়া পথ থাকবে না।"

বেনজুফ এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল ধূমকেতু-পৃথিবী সংঘাতের ভয়ংকর সম্ভাবনা। এবার ফস করে বলে উঠল—"একটা কাজ করলে তো হয়। ঝাঁকুনি খাওয়ার আগেই যদি এখান থেকে আকাশে উঠে পড়ি ?"

"কিভাবে উঠে পড়ব ?" শুধোলেন প্রোকোপ।

"অত আমি জানি না। তবে ঠোক্কর লাগার সময়ে যদি শূন্যে ভেসে থাকি, তাহলে হাড় গোড়গুলো তো আস্ত থাকবে।"

বেনজুফের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ।

বললেন—"বেনজুফ খাঁটি কথা বলেছে। শূন্যে ভেসে থাকাটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। একটা বড়সড় বেলুন বানিয়ে নিলেই হল। ধাক্কার সময়ে, এমন কি তার পরেও, যতক্ষণ না সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসছে, বেলুন চেপে আমরা শূন্যে ভাসব। গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। খাসা মতলব বাতলেছে বেনজুফ।"

শুনে বেনজুফের বত্রিশপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কাউন্ট কিন্তু প্রস্তাবটার আগাপাশতলা তলিয়ে বিচার করলেন।

তারপর ছোট্ট প্রশ্ন করলেন—"বেলুন বানাবেন কি ভাবে ?"

"ডোব্রিয়ানার পাল দিয়ে।" বললেন প্রোকোপ।

"পাল দিয়ে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পালের কাপড় যেমন মজবুত তেমনি হাল্কা হয়। কড়া বার্নিশ লাগিয়ে নিলে বাতাসের আনাগোনাও বন্ধ হয়ে যাবে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে।"

"বুঝলাম। কিন্তু বেলুন ভরবেন কি দিয়ে ?"

"গরম বাতাস দিয়ে।"

'হাইড্রোজেনের বদলে গরম বাতাস ?"

"তাইতেই বেলুন উড়বে। গরম বাতাস দারুণ হাল্কা হয়ে বেলুনকে ঠিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে শূন্যে। বিশ্বাস করুন, বেলুন বানানো খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। সমস্যাও নয়। আসল সমস্যা তো অন্যত্র।"

"আসল সমস্যাটা আবার কী ?"

"ঠিক কোন সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষ লাগবে এবং কোন মুহূর্তে আমাদের শূন্যে ভাসমান থাকতে হবে, তা তো জানি না। এ সমস্যার কে সমাধান করবে ?'

"প্রফেসর রোসেটি," বললেন সারভাদাক

"উনি নিশ্চয় হিসেব করে বার করেছেন কবে কখন কোন মুহূর্তে ফিরে গিয়ে পৃথিবীকে গুঁতো মারবে ধূমকেতু। সময়টা আমি ওঁর কাছে ঠিক জেনে নেব। যদিও জানাটা খুবই মুস্কিল। ইদানী উনি এত খিটখিটে হয়ে গেছেন, কথা বলে কার সাধ্যি। গ্যালিয়া ছেড়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর এমন কি ওঁকে আমরা ফেলে রেখে গেলেও ওর তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।"

এই বলে উঠে পড়লেন সারভাদাক। কথাটা কিভাবে পাড়বেন প্রফেসরের কাছে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল ওদের ছোট্ট জগৎ। উপর্যুপরি পাতাল বিস্ফোরণের কান ফাটানো শব্দ ভেসে এল ওপরে। ঠিকরে পড়ল আসবাবপত্র, মালপত্র।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই হেঁকে উঠলেন সারভাদাক—"বাইরে যান—পাহাড়ের বাইরে। জলদি।"

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল সকলে। গ্যালারি দিয়ে নীল আকাশের নীচে পৌঁছোনোর পর একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল মহাশূন্যে।

টকটকে নীল একটা অগ্নিগোলক, পেছনে ধূম্রপুচ্ছ, হু-হু করে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল আকাশে। অসম্ভব গতিবেগে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে তার ভয়াল বপু। শুধু থেকে যাচ্ছে বহুবর্ণ রঞ্জিত সুদীর্ঘ একটা ধোঁয়ার রেখা।

"নতুন ধূমকেতু! নতুন ধূমকেতু!" স্তম্ভিতের মত চীৎকার করে উঠলেন সারভাদাক।

"মূর্খ!" পেছন থেকে খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর রোসেট্টি। চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে বিস্ময়কর রক্তগোলককে পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি। সারভাদাকের মন্তব্যে বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে খ্যাঁক করে উঠেছেন তিনি-ই। চোখ থেকে দূরবীন না নামিয়েই বলছেন—"উজবুক কোথাকার! যা দেখছো, তা নতুন ধূমকেতু নয়—গ্যালিয়ারই একটা ছেঁড়া টুকরো। গ্যালিয়ার গা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরতে চলল নিজের নতুন কক্ষপথে!"

"সর্বনাশ! তাহলে তো জিব্রাল্টার আর ইংরেজ ফৌজ সমেত বেশ খানিকটা অংশও রয়ে গেল ওর পিঠে!"

এই বলে সুকৌশলে কাজের কথায় চলে এলেন সারভাদাক। প্রশ্ন করলেন নিরীহ কণ্ঠে—"আচ্ছা প্রফেসর, আয়তন কমে গেল যখন, তখন নিশ্চয় আমাদের গতিবেগও পাল্টে যাবে?"

চোখ পাকিয়ে বললেন বিরলকেশ বৃদ্ধ—"বলি, জ্ঞানটা দান করেছে কে?"

"সব্বাই তো তাই বলে" বোকা সেজে গেলেন সারভাদাক।

"ডাহা গোমুখ্যুর দল!" সে কী রাগ প্রফেসরের! "আয়তনের সঙ্গে কক্ষপথের কি সম্পর্ক হে? কোনো সম্পর্ক নেই। গবেট ছোকরা! এই বুদ্ধির জন্যেই তো স্কুলে কস্মিনকালেও চালাক ছেলে বলে নাম কিনতে পারোনি।"

সারভাদাক যেন আহত হলেন, এমনি স্বরে বললেন—"যাই বলুন আর তাই বলুন, ইহজন্মে আর পৃথিবীতে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।"

"তাই নাকি? তাই নাকি?" শুধু নাচতে বাকী রাখলেন খিটখিটে প্রফেসর। "শুনে রাখো হে ছোকরা, পৃথিবীর ওপর আমরা আছাড় খাবো আগামী পয়লা জানুয়ারী ভোর রাতে কাঁটায় কাঁটায় দুটো বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ ছয় দশমাংশ সেকেণ্ডে!"

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন সারভাদাক—"ধন্যবাদ প্রফেসর, অজস্র ধন্যবাদ। শুধু এইটুকুই জানতে চাইছিলাম আমি।"

হতভম্ব মুখে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ প্রফেসর!

হাতে সময় বেশী নেই। সুতরাং উদয়াস্ত পরিশ্রম চলল বেলুন নির্মাণ নিয়ে। জাহাজের দড়িদড়া দিয়ে তৈরী হল মস্ত জাল—বেলুন মোড়বার জন্যে। বেলুনের দোলনা নির্মিত হল জাহাজের পার্টিসনের পাতলা কাঠ বুনে। নৌকো ভর্তি শুকনো ঘাস নিয়ে আসা হল দ্বীপ থেকে। এই ঘাস জ্বালিয়ে

গরম বাতাস দিয়ে ভরাট করা হবে বেলুনের গর্ভ। ফুলে-ফেঁপে উঠলে হাল্কা হয়ে শূন্যে টেনে নিয়ে যাবে দোলনা এবং আরোহীদের। জাহাজের মাস্তুলগুলো খুলে আনা হল ঘাস পোড়ানোর মস্ত কড়াটাকে বেলুনের নীচের ফুটোর ঠিক তলায় বেঁধে রাখার জন্যে।

ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখে সম্পূর্ণ হল বিশাল বেলুন। জাহাজের পালে বার্নিশ লাগিয়ে মন্দ হয় নি বেলুনের গাত্রাবরণ। পুরো বেলুনটাকে দড়ির জালসমেত এলিয়ে রাখা হল পাহাড়ের গায়ে। তলার ছিদ্রটার চারদিকে গোলাকার আংটির মত একটা বেড়। বেড়টা বাঁধা দুটো মাস্তুলের ডগায়। মাস্তুলের তলা বাধা কাঠের দোলনায়। ওপরের বেড় আর তলার দোলনার ঠিক মাঝখানে বিশাল পাত্রের মধ্যে রইল রাশিরাশি শুকনো ঘাস।

বেলুন দেখে খুশী হল সবাই। হৃষ্টচিত্তে বললেন সারভাদাক—"যাক, নববর্ষের প্রথম দিনটি কাটবে ভাল। মরণ বাঁচন ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে চলুন পাড়ি জমাই মহাশূন্যে।"

পয়লা জানুয়ারী।

জলন্ত ঘাসের কল্যাণে একটার সময়ে ফুলে ফেঁপে উঠে দুলতে লাগল ভীমাকৃতি বেলুন। চড়চড় করে টান লাগল নীচের দোলনার সঙ্গে লাগানো দড়িতে। কোথায় লাগে গ্যাস-বেলুন। গরম বাতাসের এত তেজ?

ঠিক একটার সময়ে হেঁকে উঠলেন সারভাদাক—'কে কোথায় আছো, চলে এসো! জলদি! সময় হয়েছে দোলনায় ওঠবার।"

দুটোর সময়ে গোটা কলোনীটা আশ্রয় নিল প্রকাণ্ড দোলনার ভেতরে।

কিন্তু প্রফেসর রোসেট্টি কোথায়?

আঙুল তুলে দেখালো বেনজুফ—"ঐ দেখুন।"

সারভাদাক ডাকতে গেলেন বৃদ্ধ প্রফেসরকে। কিন্তু ছাত্রকে আসতে দেখেই দৌড়োতে লাগলেন বৃদ্ধ। সেই সঙ্গে দু'হাত নেড়ে সে কী চীৎকার—"খবরদার! কাছে এসো না আমার। তোমাদের খুশী হয় তোমরা যাও। আমি যাব না। বেড়ে আছি আমার ধূমকেতুতে। তোমাদের পৃথিবীর চাইতে ভাল জায়গা বাপু।"

সারভাদাক কথা বাড়ালেন না। চোখের ইঙ্গিত করলেন দুজন খালাসীকে, চক্ষের নিমেষে প্রফেসরকে তারা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল দোলনার ওপর।

সবশেষে লাফিয়ে উঠে পড়লেন সারভাদাক—"সব ঠিক আছে! ওড়াও বেলুন!

সঙ্গে সঙ্গে কেটে দেওয়া হল মাটিতে পোঁতা খোঁটার সঙ্গে বাঁধা দোলনার দড়ি। মুহূর্তের মধ্যে রাজকীয় ভঙ্গীমায় হেলেদুলে আকাশে উঠে পড়ল দৈত্যাকার বেলুন। পায়ের তলায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল আগ্নেয়গিরি, সমুদ্র, জাহাজ।

মিনিট যায়· ··

দূর থেকে দেখা গেল পৃথিবীর সবুজ চেহারা। আব একদিকে পুচ্ছ তুলে ছুটন্ত ধূমকেতু! গ্যালিয়া ছুটে চলেছে ধরিত্রীকে গুঁতোতে!

পৃথিবী কাছে এসে গেছে। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রয়েছে দোলনাব আরোহীরা।

আচম্বিতে সমগ্র আবহমণ্ডল যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। আকাশ কাঁপছে· বাতাস কাঁপছে·· বিশ্বচরাচব যেন মুহুর্মুহু শিহরিত হয়ে উঠছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে! পুঞ্জ পুঞ্জ বিচিত্র রঙীন মেঘে ছেয়ে গেল চারিদিক। আশ্চর্য বর্ণ সে-সব মেঘরাশির· বর্ণালী যেন সমস্ত রঙ উজাড করে ঢেলে দিল মেঘালয়ে· সেই সঙ্গে শুরু হল বিদ্যুতের লকলকে জিহ্বার লীলাখেলা। বর্ণনা কবা যায় না ভয়ংকর সুন্দর সেই দৃশ্যেব। সমস্ত দৃশ্যপটে যেন শরীরহীন বিভীষিকারা উন্মাদনৃত্যে মত্ত হল বিভিন্ন ভৌতিক শক্তির সাহায্যে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল আশেপাশে ওপবে নীচে। মাটি থেকে আকাশে যে বিদ্যুৎ দেখা যায়—এ-বিদ্যুৎ যেন তা নয়। গনগনে আগুন নিমেষে ধেয়ে যাচ্ছে বহুবর্ণ রঞ্জিত মেঘলোকেব এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্তে। মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে· মুহূর্তে জাগ্রত হচ্ছে· কক্কড় নিনাদে কান বধিব হচ্ছে, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মহাকাল স্বয়ং বুঝি লক্ষ রূপে সংহার লীলায় নেমেছেন মেঘের আড়ালে থেকে। সেই প্রলয় দৃশ্য, সেই ভীষণ টংকার ধ্বনি, সেই লেলিহান অগ্নিশিখার আতীব্র আঁচ সহ্য করতে পাবল না দোলনাব মানুষ ক'জন। জ্ঞান লোপ পেল প্রত্যেকেরই।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখা গেল ঘাস জমির ওপব শুয়ে রয়েছে সকলে। ওপরে ঝকঝক করছে নীল আকাশ। পৃথিবীতে ফিরে এসেছে সবাই ধূমকেতুর পিঠে চড়ে মহাকাশ পর্যটনের পর।

"কিন্তু বেলুনটা কোথায়?" প্রশ্ন করলেন সারভাদাক।

বেলুন! তাইতো বটে! সুনীল আকাশে বেলুনের তো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না! ধূমকেতুটাই বা কোথায়?

পাশ থেকে গজ গজ করে উঠলেন প্রফেসর—"ধূমকেতু!' হুঃ! সে কী আর আছে—পৃথিবীর গা ছুঁয়ে ফের উধাও হয়েছে মহাশূন্যে। আহারে! গ্যালিয়ার পিঠে চড়ে আর এক চক্কর যদি ঘুরে আসা যেত!"

রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হল। পৃথিবীর ওপর গ্যালিয়া ধূমকেতু আছাড় খায় নি—গা ঘষটে বেরিয়ে গিয়েছে। শুধু তারই ফলে আবহমণ্ডলে প্রলয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে বেলুন-আরোহীরা। সহ্য করতে পারেনি মহাকালের অসহ্য বিষাণধ্বনি, ডম্বরুসংকেত, বিজুলীঝিলিক। লোপ পেয়েছে সংজ্ঞা!

বিড়বিড় করে বলল বেনজুফ—"জায়গাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন। এ-আমাদের অ্যালজিরিয়া না?"

অ্যালজিরিয়াই বটে। নিশুতিরাতে পৃথিবীর ভূখণ্ড ছিনতাই করে নিয়ে উধাও হয়েছিল গ্যালিয়া ধূমকেতু। ঝাড়া দুটি বছর মহাশূন্যের বুক চিরে তাপহীন রাজ্য দিয়ে নক্ষত্র বেগে উড়েছে। কজন পৃথিবীবাসীর অশেষ দুর্ভোগের কারণ হয়েছে।

দুটি বছর পরে পৃথিবীর বুকে পৃথিবীব ডানপিটেদের ফিরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে সদয় হয়েছে বাউণ্ডুলে গ্যালিয়া · ডাকাত গ্যালিয়া। যেখান থেকে গায়েব করেছিল পৃথিবীবাসীদের, নামিয়ে দিযে গিযেছে ঠিক সেই স্থানেই!

কালক্ষেপ না করে ওঁরা হেঁটে ফিরে এলেন মোসটাগানেমে।

সেনাশিবিরে হৈ-চৈ পড়ে গেল সারভাদাককে দেখে। দু'বছর পবে হঠাৎ কোত্থেকে আবির্ভূত হলেন ক্যাপ্টেন সারভাদাক! কোথায ছিলেন তিনি অ্যাদ্দিন?

প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হলেন সারভাদাক। মুচকি হেসে কেবল একটি জবাবই দিলেন সবাইকে—"বললেও সে-কথা কারো বিশ্বাস হবে কী?"

তারপর জিজ্ঞেস করেছেন এক পুরোনো দোস্ত অফিসারকে—"ম্যাডাম দ্য এল-এর খবর কি বলতে পারো?"

একগাল হেসে বলেছে দোস্ত অফিসার—"কোনকালে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি কি ভাবো দু'দুটো বছর তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবেন তিনি?"

কাউন্ট টিমাসচেফ পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। সারভাদাক হাসি মুখে বললেন—"কাউন্ট, বেঁচে গেলাম, কি বলেন? ডুয়েলটা আর লড়তে হল না।"

"বাঁচালেন," বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন কাউন্ট।

কামান কারখানার রহস্য

দি বেগমস্ ফরচুন

....

মুখবন্ধ

এইচ, জি, ওয়েলস বলেছেন "জুল ভের্ণ অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গিয়েছেন।" "বেগমস্ ফরচুন" উপন্যাসে তিনি যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, তা শুধু আশ্চর্য নয়—অত্যাশ্চর্য।

ভের্ণই বোধ করি প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃত্রিম উপগ্রহ কল্পনায় আনতে পেরেছেন, নিক্ষেপক যে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে—তাও বলেছেন। দূরপাল্লার কামানে গ্যাস বোমা আর আগুন-বোমা বৃষ্টির ভয়াবহ বিপদ তিনিই প্রথম দিব্যচোখে দেখেছেন এবং নেভাবার জন্য নাগরিক প্রস্তুতি কিরকম হওয়া উচিত, তাও বলেছেন। উনি এ-কথাও বলেছেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধ পুরোপুরি যান্ত্রিক যুদ্ধ হবে।

এতো গেল কেবল অস্ত্রের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্‌বাণী। অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি বিস্ময়কর। জার্মান জাতটা যে ভবিষ্যতে সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববাসীকে পদানত করতে চাইবে, পলিটিক্যাল পুলিশ অধ্যুষিত একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটবে এবং জনগণের জীবনধারা পর্যন্ত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হবে—এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও তাঁর। মূল ফরাসি বইটিতে হের সুলৎসের যে ছবি আঁকা হয়েছিল, তা যেন গোঁফ বাদ দেওয়া বিসমার্কের প্রতিকৃতি!

নগর পরিকল্পনার কল্পনায় আধুনিক স্থপতিদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন ভের্ণ। ফ্রাঙ্কভিলকে ধোঁয়ামুক্ত রাখার জন্যে উনি যে বিশেষ ফার্ণেসের কথা ভেবেছেন—যা দিয়ে ধাতুও ঢালাই করা যাবে—তা আজও সম্ভব হয়নি।

কৌতূহলোদ্দীপক এই সায়ান্স ফিকশন উপন্যাসে ভের্ণ দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান রামরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে, বিজ্ঞান রামরাজ্য সংহারও করতে পারে।

৯৫ বছর আগেই ভের্ণ আঁচ করেছিলেন, এই শতাব্দীতে সংঘাত লাগবে গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের, চারুশিল্পের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার—এমন কি কল্পনা করেছেন স্পেশ স্যাটেলাইটকেও!

'দি বেগমস্ ফরচুন' লেখা হয় ১৮৭৯ সালে।

....

কামান কারখানার রহস্য

১ ॥ মিস্টার শার্পের প্রবেশ

ডক্টর সারাসিনের বয়স পঞ্চাশ অথবা ধারে কাছে। মার্জিত চেহারা। ইস্পাতের চশমায় ঢাকা একজোড়া প্রাণময় টলটলে চোখ। চোখ মুখের ভাব গম্ভীর হলেও আপন-করে-নেওয়া। এক নজরেই যাঁদের 'খাঁটি মানুষ' বলে চেনা যায়, ইনি সেই জাতের মানুষ।

বসে আছেন ব্রাইটন হোটেলের বসবার ঘরে। হাতের কাছে কার্পেটে এবং খান কয়েক চেয়ারের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 'টাইমস', 'ডেলী টেলিগ্রাফ' আর 'ডেলী নিউজ' খবরের কাগজ। লণ্ডনের নামী দৈনিকগুলোয় সেই বিশেষ খবরটি পড়ে নিয়েছেন সাতসকালেই।

বিশেষ খবরটি অবশ্য তাঁকে নিয়ে। দুদিন আগে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনীতে উনি যে নিবন্ধটি পড়ে শুনিয়েছেন, তার বিশদ সংবাদ বেরিয়েছে কাগজে। প্রবন্ধের নাম 'রক্তকণিকার গণকযন্ত্র'। তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ধরনের একটি যন্ত্র।

হোটেলের ওয়েটার ঢুকল ঘরে। একটা ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে ধরল সামনে এবং সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, "মঁসিয়ে কি দর্শনার্থীকে দর্শন দেবেন ?"

ডক্টর সারাসিন বিলক্ষণ বিস্মিত হলেন। এ-দেশে তাঁকে কেউ চেনে না। তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বাড়ী বয়ে দেখা করতে এসেছেন এক ব্যক্তি। কে তিনি ?

কার্ডটা টেনে নিয়ে পড়লেন ডক্টর। মাথার মধ্যে আরো গোলমাল হয়ে গেল নামটা পড়ে : ডব্লিউ. এইচ. শার্প, জুনিয়র।

সলিসিটর। ৯৪, সাদামটন রো, লণ্ডন।

সলিসিটর 'মানে যে আইনবিদ, ডক্টর তা জানতেন।

"নিয়ে এসো" বললেন একটু অবাক হয়ে।

ঘরে যিনি পা দিলেন, তাঁকে দেখলে তরুণ বলেই মনে হয়। এক নজরেই অবশ্য ডক্টর সারাসিন তাঁকে 'মড়ার খুলি' মার্কা মানুষদের দলে ফেললেন। শুকনো পাতলা ঠোঁট বড় বড় দাঁতের ওপর দিয়ে টেনে তোলা ; ভেতরে-ঢোকা রগ, চামড়া তো নয়—যেন শুকনো পার্চমেণ্ট কাগজ, মিশরের ম্যমীদের মত গায়ের রঙ, চোখ দুটো ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ ; ভদ্রলোকের ইংরেজী নামের মানে যা—চোখ দুটোও তাই ; অর্থাৎ ধারালো ! কংকালের বাকী অংশটা,

মানে, পায়ের গোড়ালি থেকে করোটির পেছন দিক পর্যন্ত বিপুল আলস্টার অর্থাৎ লম্বা ঢিলে কোটে ঢাকা। চেক প্যাটার্ণের কোট। হাতে ধরা রয়েছে পেটেণ্ট-লেদারের একটা ব্যাগ।

কংকাল-মূর্তি ঘরে ঢুকেই ঝটিতি মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন ডক্টরকে, ব্যাগ আর টুপী রাখলেন মেঝেতে, না বলতেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং সরাসরি কাজের কথা শুরু করলেন—

"আমি উইলিয়াম হেনরী শার্প, জুনিয়র, বিলোজ, গ্রীন, শার্প অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে আসছি। ডক্টর সারাসিনের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে কি আমার?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"ফ্রাঁসোয়া সারাসিন?"

"নামটা আমারই মশায়, কোনো সন্দেহ রাখবেন না।"

"দোয়াই-তে থাকেন?"

"ঠিক বলেছেন, দোয়াই-তেই আমার নিবাস।"

"আপনার বাবার নাম ইসিদোর সারাসিন?"

"ঠিক, ঠিক।"

পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বার করলেন মিস্টার শার্প। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে পড়া শুরু করলেন:

"ইসিদোর সারাসিন ১৮৫৭ সালে প্যারিসের হোটেল ইকোডেস-য়ে মারা যান। হোটেলটি এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে। সামরিক বাহিনীতে ছিলেন—ষষ্ঠ অ্যারোনডিসেমেণ্ট, রু-টারানি, চয়ান্ন নম্বর।"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক—হুবহু ঠিক।" আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললেন ডক্টর। "দয়া করে বলবেনকি— ?"

কিন্তু মিস্টার শার্পকে রোখা মুস্কিল। গড় গড় করে বলে চললেন নোট বই দেখে—"আপনার ঠাকুমার ভাইয়ের নাম ছিল জাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভল। ড্রাম-মেজর ছিলেন সামরিক বাহিনীর ছত্রিশ নম্বর লাইট—

"শুনুন মশায়, আমার বংশের বাপ পিতামহের নামধাম আপনি যা জানেন, আমিও তা জানি না। আমি শুধু জানি, আমার ঠাকুমার বংশের পদবী ছিল ল্যাংগেভল।"

মিস্টার শার্পের মুখের কুলুপ কিন্তু ফের খুলে গেছে—"১৮০৭ সালে আপনার ঠাকুর্দাকে নিয়ে আপনার ঠাকুমা বার্লিভূক শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। জাঁ সারাসিনের সঙ্গে আপনার ঠাকুমার বিয়ে হয়েছিল ১৭৯৯ সালে

টিনের মিস্ত্রী হিসেবে আপনার ঠাকুর্দা কারবার শুরু করেন মেলুন শহরে। ঐ শহরেই আপনার ঠাকুমা ১৮১১ সালে মারা যান আপনার পিতৃদেব ইসিদোর সারাসিনকে রেখে। সেই থেকে প্যারিসে আপনার বাবার মৃত্যু পর্যন্ত কোনো খবর আর পাচ্ছি না।"

"খবরটা আমি দিচ্ছি", বললেন ডক্টর। কুলপঞ্জীর নির্ভুল বর্ণনা শুনে চমৎকৃত হওয়া সত্ত্বেও বললেন—"বাবাকে ডাক্তারী পড়ানোর জন্যে ঠাকুর্দা প্যারিসে বসবাস শুরু করলেন। ১৮৩২ সালে মারা যান উনি। বাবার ডাক্তারী পশার জমে ওঠে তাঁর মৃত্যুস্থানে অর্থাৎ প্যালেস্থ-তে। আমার জন্মও সেখানে—১৮২২ সালে।"

"আপনাকেই খুঁজছি আমি," শুরু করলেন মিস্টার শার্প—"ভাই বোন নেই তো?"

"না। আমি একমাত্র সন্তান। আমাকে দু বছরের রেখে মা মারা যান। এখন বলুন দিকি মশায়—"

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার শার্প।

"রাজা ব্রায়া জবাহির মথুরানাথ," ইংরেজরা যেভাবে গদগদ কণ্ঠে সশ্রদ্ধভাবে উপাধি উচ্চারণ করে, অবিকল সেইভাবে বললেন মিস্টার শার্প—"আপনাকে আবিষ্কার করে আমি আনন্দিত এবং আমিই প্রথম অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।"

ডক্টর ভাবলেন, লোকটার মাথায় ছিট আছে। মড়ার খুলি মার্কা লোকদের মাথায় এ-রকম গোলমাল থাকে বইকি।

ডক্টরের মনের কথা চোখের ভাষায় পড়ে নিলেন সলিসিটর।

বললেন অতি-প্রশান্ত কণ্ঠে—"আমি পাগল নই মোটেই। এই মুহূর্তে আপনি রাজা উপাধির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আপনার ঠাকুমার ভাই জাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভল এই উপাধি পেয়েছিলেন ১৮১৯ সালে বৃটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করার পর। তাঁর স্ত্রী বেগম গোকুল মারা যান ১৮১৪ সালে। তাঁদের একমাত্র ছেলে—জড়দগব এবং গণ্ডমূর্খ—মারা যায় ১৮৬৯ সালে। বাংলার গভর্ণর জেনারেল তাই বেগম গোকুলের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন আপনার ঠাকুমার ভাই রাজা জাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভলকে।

"গত তিরিশ বছরে বেগম গোকুলের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিংয়ে দাঁড়ায়। পুরো সম্পত্তিটাকে আলাদাভাবে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সুদে-আসলে সম্পত্তির অর্থমূল্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় জাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভল-এর সেই গণ্ডমূর্খ পুত্রের জীবদ্দশাতেই।

"১৮৭০ সালে সম্পত্তির মোট অর্থমূল্য দাঁড়ায় দু'কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং অথবা বাহান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ। আগ্রা আদালতের আদেশ অনুসারে, দিল্লীর সই নেওয়ার পর এবং প্রিভি কাউন্সিলের সম্মতি লাভের পর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বেচে দেওয়া হয় এবং টাকা গচ্ছিত রাখা হয় ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডে।

"মোট টাকার পরিমাণ এই মুহূর্তে বাহান্ন কোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। কোর্ট অব চ্যান্সারিতে আপনি যে মুহূর্তে প্রমাণ করে দেবেন, আপনিই জাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভলের একমাত্র বংশধর, সেই মুহূর্তে পুরো টাকা-টা চেক কেটে তুলে নিতে পারবেন। ইতিমধ্যে আপনার যদি অগ্রিম টাকার দরকার হয়, তা পাবেন। সে অধিকার আমাকে দিয়েছে ব্যাংকার মেসার্স ট্রল্প, স্মিথ অ্যাণ্ড কোম্পানী।"

বেশ কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন ডক্টর সারাসিন। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোলো না। ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন, গল্পটি সোনা, কল্প একেবারেই ভিত্তিহীন।

বললেন শান্ত স্বরে—"প্রমাণ কী? আমাকে সনাক্ত করলেন কি করে?"

"প্রমাণ এইখানে," চামড়ার ব্যাগটায় টোকা মেরে বললেন মিস্টার শার্প। "আপনাকে সনাক্তকরণের ব্যাপারটাও অতি সোজা। বৃটিশ সাম্রাজ্যে অগুন্তি বেওয়ারিশ সম্পত্তির ওয়ারিশ খোঁজার দায়িত্ব যে কোম্পানীর, আমি সেই কোম্পানীর হয়ে পাঁচ বছর ধরে খুঁজছিলাম আপনাকে।

"পাঁচ বছর ধরে বেগম গোকুলের বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বেড়িয়েছি দেশে দেশান্তরে, হাজার হাজার সারাসিন ফ্যামিলির কুলপঞ্জী ঘেঁটেছি। কিন্তু ইসিদোর সারাসিনকে পাইনি। শেষকালে যখন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল যে ফরাসি মুলুকে ও নামে আর কেউ নেই, ঠিক তখনি ডেলী নিউজ খবর কাগজে একটা খবর পড়লাম। স্বাস্থ্য সম্মেলনীর খবরটা বেরিয়েছিল গতকালের কাগজে। সদস্যদের নামের তালিকায় ছিল জনৈক ডক্টর সারাসিনের নাম—যে নাম এর আগে আমি কোনোদিন শুনিনি।

"তৎক্ষণাৎ আমি দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটতে বসলাম। হাজার হাজার সারাসিন পরিবারের কুলজি ঘাঁটলাম। চোখ কপালে উঠল যখন দেখলাম, এত মেহনৎ করেছি, অথচ দোয়াই আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।"

"বুঝলাম, অ্যাদ্দিনে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ব্রাইটনের ট্রেনে চেপে বসলাম তক্ষুনি। মিটিং থেকে আপনাকে বেরোতে দেখেই বুঝলাম, শেষ হয়েছে আমার তল্লাসি। সন্দেহের বাষ্পটুকুও রইল না মনের মধ্যে।

আপনার পূর্বপুরুষ ল্যাংগেভল য়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি আপনি। ওঁর একটা ছবি এঁকেছিল ভারতীয় শিল্পী সারানোনি। সে-ছবি আমার হেপাজতে রয়েছে। সুতরাং আপনাকে দেখেই চিনেছি, ভুল হং নি।"

খাতা থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করে ডক্টর সারাসিনকে দিলেন মিস্টার শার্প।

ছবিতে দেখা গেল একজন দীর্ঘকায় পুরুষকে। গালজোড়া জাঁকালো দাড়ি, চূড়ো করা পাগড়ি এবং মহার্ঘ কিংখাপের রাজপোশাক চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে।

সেনাধ্যক্ষরা যেভাবে চেয়ারে বসে তন্ময় হয়ে সামরিক অভিযানের মতলব আঁটেন, ভদ্রলোকের ছবিটা আঁকা হয়েছে সেই পোজে। পশ্চাদপটে দেখা যাচ্ছে রণক্ষেত্র। ধোঁয়া আর অশ্বারোহী সৈন্যর ছায়াভাষ।

মিস্টার শার্প বললেন—"কাগজগুলো পড়ুন। আমি মুখে যা বলব, তার চাইতেও বেশী খবর পাবেন এর মধ্যে। দু'ঘণ্টা পরে আমি আসছি। এবার আসব আপনার হুকুম মাথা পেতে নিতে।"

এই বলে চকচকে ব্যাগের পেটের মধ্যে থেকে সাত আট তাড়া দলিল বার করলেন মিস্টার শার্প। কিছু দলিল ছাপানো, কিছু হাতে লেখা। টেবিলের ওপর বাণ্ডিলগুলো রেখে সসম্মানে পিছু হটে বেরিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বললেন—"রাজা ব্রাঘা জবাহির মথুরানাথকে স্বপক্ষে জ্ঞাপন করার সম্মান লাভের জন্য আমি আজ ধন্য।"

ডক্টর সারাসিনের মনের মধ্যে তখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া চলছে। খানিকটা বিশ্বাস আর খানিকটা কৌতুক—এই মনোভাব নিয়ে কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন ডক্টর। তিলমাত্র সন্দেহও আর অবশিষ্ট রইল না মনের মধ্যে। মিস্টার শার্প যে একটা কথাও বানিয়ে বলেন নি, তার ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে দলিল দস্তাবেজের প্রতিটি লাইনে। ছাপানো দলিলে লেখা রয়েছে :

১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে মহারাণীর প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় লর্ডদের সমীপে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা হল বেগম গোকুলের ওয়ারিশ সম্পর্কে। বাংলার বাগিনারা অঞ্চলের বেগম ইনি। এঁর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে বিস্তর জমিজমা, বহু প্রাসাদ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, ধনরত্ন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিল্লী এবং আগ্রার আদালতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল বেগম গোকুল রাজা

লক্ষ্মীসুরের বিধবা বউ। বিত্তব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পর ইনি জ্যাঁ জ্যাকুইস ল্যাংগেভল নামে এক ফরাসিকে বিয়ে করেন।

ফরাসি ভদ্রলোকটি আগে ছিলেন ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনীতে ড্রাম-মেজব হিসেবে। তাবপর ইনি নানতেস থেকে সওদাগবী জাহাজে চেপে সমুদ্রপাড়ি দেন।

ভদ্রলোক কলকাতায় পৌঁছে বাংলাব অভ্যন্তবে প্রবেশ করেন এবং বাজা লক্ষ্মীসুবেব ছোট্ট দেশীয় সৈন্যবাহিনীব সামবিক উপদেষ্টা নিয়োজিত হন। পবে ইনি সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন এবং বাজার মৃত্যুর পব বিধবা বেগমকে বিয়ে কবেন।

আগ্রাতে বসবাসকাবী বহু ইংবেজদেব নানাবিধ উপকাব কবেন ল্যাংগেভল। বিনিময়ে বৃটিশ সবকার তাঁকে বৃটিশ নাগরিকত্ব দান কবেন এবং বাজা উপাধি দিয়ে সম্মানিত কবেন।

বেগম মাবা যান ১৮৩৯ সালে। ল্যাংগেভল মারা যান তাব দু'বছর পবে।

সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবী তাঁদেব একমাত্র পুত্র, জন্মাবধি জড়বুদ্ধি ছিল বলে ট্রাস্টি নিযুক্ত হয় সম্পত্তি দেখাশুনা কববাব জন্যে। ১৮৬৯ সালে ছেলেটি মাবা যায়।

বিপুল সম্পত্তি তখন বেওয়ারিস পবিগণিত হয়। আগ্রা এবং দিল্লীর কোর্টেব আদেশানুসাবে এবং স্থানীয় সবকাবেব অনুমত্যানুসাবে স্থাবর-অস্থাবব যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী কবে দেওয়াব অনুমতি চাওয়া হচ্ছে প্রিভি কাউন্সিলেব কাছে যথাবিধি সম্মান সহকাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগ্রা এবং দিল্লীব আইনেব কাগজপত্র, বিক্রীব দলিল এবং ফ্রান্স তোলপাড় কবে উত্তরাধিকাবী অন্বেষণেব চমকপ্রদ বিববণ পড়ে ডক্টব সাবাসিনেব মনের মধ্যে বইল না কোনো দ্বিধা।

বাহান্ন কোটি সত্তব লক্ষ ফ্রাঁ। জমা বয়েছে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের স্ট্রংরুমে। কয়েকটা জন্ম এবং মৃত্যুব সার্টিফিকেট দাখিল কবতে পাবলেই টাকাব পাহাড় উঠে আসবে তাঁব সিন্দুকে।

ভাগ্যদেবী সহসা এ ভাবে সদয় হলে যে কোনো গোবেচারা মানুষের মুণ্ডু ঘুবে যাওয়া স্বাভাবিক। ডক্টব সাবাসিনও ঈষৎ উত্তেজিত হলেন। ঘবময় পায়চাবী কবলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে উত্তেজনা মিলিয়ে গেল। মানসিক দুবলতাব জন্যে নিজেই নিজেকে তিবস্কার কবলেন। চেয়াবে বসে ধ্যানস্থ ঋষির মত আত্মসমাহিত হয়ে বইলেন অনেকক্ষণ। আবেগ উত্তেজনা উবে গেল দেহমন থেকে।

আচম্বিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ডক্টর। ফের ঘরের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করলেন। অন্তর্নিহিত বিচিত্র রোশনাইতে ঝিকমিক করতে লাগল দুই চক্ষু। যেন একটা মহৎ সৎ উদার পরিকল্পনার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে মনের মধ্যে। বিষয়টা তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করলেন, উৎসাহিত হলেন। শেষকালে বোঝা গেল অভিনব অঙ্কুরটি মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে মনের মাটিতে।

ঠিক এই সময়ে টোকা শোনা গেল দরজায়। মিস্টার শার্প ফিরে এলেন।"

নরম স্বরে বললেন ডক্টর—"আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করার জন্যে এক হাজার বার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সন্দেহ আমার ঘুচে গেছে মশায়। অনেক কষ্ট করেছেন আমাকে খুঁজে বার করতে, কৃতজ্ঞ রইলাম সেজন্যে।"

"না, না, সে কী কথা! এ যে আমার কর্তব্য। ভাল কথা, মহামান্য রাজাও নিশ্চয় মক্কেল থাকছেন আমাদের?"

"তা আর বলতে। পুরো ব্যাপারটার তদারকি আপনারাই করুন। শুধু একটা অনুরোধ। দয়া করে আমাকে ঐ উদ্ভট উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবেন না।"

"উদ্ভট! দু'কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং দামের খেতাবকে উদ্ভট বলছেন!" মিস্টার শার্প এই জাতীয় একটা বিস্ময়োক্তি প্রকাশ করতে গিয়েও যেন সামলে নিলেন। শুধু বললেন—"যাতে আপনি খুশী হন, তাই হবে। এখন হুকুম করুন, আমি লণ্ডনে ফিরে যাই। সেখান থেকেই আপনার হুকুম মত কাজ করব।"

"দলিলগুলো কাছে রাখতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে। আমার কাছে নকল আছে।"

একলা বসে রইলেন ডক্টর সারাসিন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লেখায় মন দিলেন:

ব্রাইটন, আটাশে অক্টোবর, ১৮৭১

কল্যাণীয়েষু—

এইমাত্র অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল একটা সম্পদের অধিকারী হলাম।

আমার মাথা খারাপ হয়েছে ভেবো না। ছাপানো কাগজপত্রগুলো এইসঙ্গে দিলাম। পড়লেই বুঝবে আমি একটা ভারতবর্ষীয় খেতাবে উত্তরাধিকারী হয়েছি এবং বহু কোটি ফ্রাঁ আমার নামে জমা রয়েছে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের সিন্দুকে।

খবরটা শুনে তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তা আঁচ করতে পারছি।

মনে রেখো, এই সৌভাগ্য আমাদের ঘাড়ে অনেক কর্তব্য চাপিয়ে দিল। সেই-সঙ্গে আসছে বিস্তর বিপদ। টাকার যথাব্যবহার করতে না পারলেই বিপদ ঘিরে ধরবে চারদিক থেকে।

ঘণ্টাখানেক আগে খবরটা আমি জেনেছি। প্রথমেই আনন্দ হয়েছিল। ক্রমেই তা ফিকে হয়ে আসছে বিরাট দায়িত্বের কথা ভেবে। এই সম্পদ আমাদের বরাতে সৌভাগ্যর বদলে দুর্ভাগ্য আনতে পারে। বিপুল এই বৈভব যদি বিজ্ঞানের শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয় আমাদের হাতে, যদি তা সভ্যতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সভ্যতার প্রগতিতে দানবিক মেশিনরূপে নিযুক্ত হয়—তবেই আসবে চরম সার্থকতা!

এ-নিয়ে পরে আলোচনা করব। তোমার মনের প্রতিক্রিয়া চিঠি লিখে আমাকে জানাও। তোমার মা-কে এ-খবর তুমিই জানাবে। তিনি বুদ্ধিমতী। বিচলিত হবেন না জানি।

ম্যাক্স-কে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিও। ভাবীযুগের জন্যে যত পরিকল্পনাই করি না কেন, ম্যাক্স জড়িত থাকবে সব কিছুর সঙ্গে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা

ফ্রাঁসোয়া সারাসিন

গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমেত চিঠিটা পাঠানো হল যে ঠিকানায়। তা এই :

মঁসিয়ে অক্টেভিয়াস সারাসিন।

ছাত্র, চারুশিল্প এবং কারিগরি বিদ্যার উচ্চ-বিদ্যালয়।

৩২, রু ডু রয় ডি সিসিলি, প্যারিস।

চিঠি লেখা শেষ হতেই গায়ে ওভার কোট চাপিয়ে টুপী মাথায় দিয়ে সম্মেলনে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর এবং পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই বিস্মৃত হলেন বিপুল বৈভব বৃত্তান্ত।

২ ॥ দুই বন্ধু

হাঁদারাম বলতে যা বোঝায়, ডক্টর সারাসিনের ছেলে অক্টেভিয়াস ঠিক সে রকম নয়। সে মাথামোটা নয়—ধীমানও নয়, সুন্দর নয়—অসুন্দরও নয়, ঢ্যাঙা নয়—বেঁটেও নয়, ফর্সা নয়—কালোও নয়। বাদামের রঙের মতই তার গায়ের রঙ দিব্বি বাদামী। দেখলেই বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তির সময়ে প্রথম প্রচেষ্টা তার বিফলে যায়। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় খুব একটা ভাল ফল করতে না পেরেও উতরে যায় কোন মতে।

অক্টেভিয়াসের চরিত্র এমনই যে ঝট করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার ক্ষমতাতীত।

ছেলের চরিত্র যদি জানতেন, ডক্টর সারাসিন অমন চিঠি লিখতেন না। যদি জানতেন ছেলের মধ্যে পুরুষকারের অভাব আছে, নিজের চেষ্টায় কিছু করার সাধ্য তার নেই, তাহলে নিশ্চয় চিঠি লেখার আগে দ্বিধায় পড়তেন। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষও স্নেহান্ধ পিতা হতে পারেন।

একদিক দিয়ে অক্টেভিয়াসের কপাল ভালো। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় এমন একটা দুর্মদ চরিত্রের প্রভাবে এসে পড়েছিল যে তাকে শাসন করেছে কতকটা নিষ্ঠুরভাবে—কিন্তু তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যেই।

বন্ধুটির নাম ম্যাক্স ব্রাকমান। অক্টেভিয়াসের চাইতে এক বছরের ছোট। কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান প্রতিভায়, এমন কি দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তিতেও অনেক উঁচুতে।

বারো বছর বয়েসে অনাথ হয় ম্যাক্স ব্রাকমান। ডক্টর সারাসিনের বাড়ীর ছেলে হয়ে গিয়েছিল ম্যাক্স।

ম্যাক্সের আদি নিবাস অ্যালসেশ-এ। সেই হিসেবে তাকে অ্যালসেশিয়ান বলা যায়। দেবতার আসনে বসিয়েছিল ডক্টর সারাসিন এবং তাঁর স্ত্রীকে। ভালবাসত তাঁদের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে।

কলেজে ঢুকে পড়াশুনা বা খেলাধূলায় প্রথম স্থান দখল করা তার কাছে কায়েমী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বছরে গাদা গাদা পুরস্কার না পেলে ম্যাক্সের মনে হত জীবনটাই বৃথা।

বিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক ম্যাক্সের বিশাল শরীর আর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে বিচ্ছুরিত হত অফুরন্ত প্রাণ চাঞ্চল্য, নিখুঁত করোটির গড়ন দেখে বোঝা যেত অসাধারণ বুদ্ধিসত্তা সঞ্চিত রয়েছে সেখানে। অক্টেভিয়াস যে-বছর কলেজে ভর্তি হল, ম্যাক্সও সেই বছর কলেজ ছাত্র হল।

ম্যাক্স পেছনে লেগে না থাকলে অক্টেভিয়াস কোনো কালেই কলেজ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারত না। পুরো একটা বছর বন্ধুকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ম্যাক্স। ঠেলা মেরে মেরে তাকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।

১৮৭০ সালে যুদ্ধ লাগল। পড়াশুনা তখন সবে শেষ হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্যাক্স যোগ দিল সৈন্যবাহিনীতে—অটোও এল তার সঙ্গে।

যুদ্ধ শেষ হলে ফের পড়াশুনা শুরু করল দুই বন্ধু। কলেজের কাছেই সাদামাটা একটা ঘর নিয়ে মন দিল অধ্যয়নে।

ম্যাক্স শয্যাত্যাগ করত রোজ ভোর পাঁচটায়। অটোকেও টেনে তুলত। ক্লাসে যেত কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে। আমোদ-আহ্লাদের সময়েও চোখের আড়াল করত না বন্ধুকে।

১৮৭১ সালের উনত্রিশে অক্টোবর সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ঘরে বসে ছিল দুই বন্ধু। একই টেবিলের দুপাশে বসে দুজনে—মাঝে শেড লাগানো টেবিল ল্যাম্প।

ব্যবহারিক গণিতের একটা কঠিন সমস্যা নিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়েছিল ম্যাক্স। অটো তন্ময় হয়েছিল কফি চোঁয়ানো নিয়ে। ঠিক সেই সময়ে টোকা পড়ল দরজায়।

"মঁসিয়ে অক্টেভিয়াস সারাসিনের নামে চিঠি আছে" শুনে বিলক্ষণ পুলকিত হল অটো।

"বাবার চিঠি! বাবার হাতে লেখা চিঠি।"

আচমকা ম্যাক্সের ধ্যানভঙ্গ হল অটোর চীৎকারে।

"কি ব্যাপার?" অটোর ফ্যাকাশে মুখ দেখে শুধোয় ম্যাক্স।

"পড়ো!" চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বিমূঢ় কণ্ঠে বলল অটো।

চিঠিটা একবার পড়ল ম্যাক্স, দুবার পড়ল। দলিলগুলোয় চোখ বুলোলো, তারপর বলল—"অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

বলে, পাইপে তামাক ঠেসে রত হল ধূমপানে।

উদ্বিগ্ন চোখে বন্ধুর হাবভাব দেখতে লাগল অটো। শুধোলো অনেকক্ষণ পরে—"তোর কি মনে হয় বলতো! সত্যি?"

"আলবৎ সত্যি। যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তোর বাবার। হঠ করে এরকম ব্যাপার নিয়ে চিঠি লেখার মানুষ তিনি নন। তাছাড়া, দলিলগুলো পড়লেই তো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।"

পাইপটা ততক্ষণে পুরোপুরি ধরে গেছে। সুতরাং আবার কাজ শুরু করল ম্যাক্স।

স্থাণুর মত বসে রইল অটো। দুহাত শিথিল ভাবে ঝুলতে লাগল দুপাশে। কফি পান করার কথাও মনে রইল না। সে যে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না, মুখ খুলল শুধু তা প্রমাণ করার জন্যে।

বলল—"ম্যাক্স! এ যে অসম্ভব! এত কোটি টাকা ভাবা যাচ্ছে না!"

"তা ঠিক। এত টাকার মালিক ফ্রান্সে একজনও নেই। আমেরিকায় জনাকয়েক আছেন, ইংল্যাণ্ডে আছে পাঁচ-ছ জন—সারা দুনিয়ায় পনেরো থেকে কুড়ির বেশী নয়।"

"শুধু টাকা নয়—টাকার সঙ্গে একটা খেতাবও ফাউ পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশী খেতাব…কি যেন নামটা ?…রাজা ! জীবনে খেতাবের স্বপ্ন দেখিনি আমি, কিন্তু পেলে ছাড়তে যাবো কেন ? নিছক সারাসিনের চাইতে রাজা সারাসিন শুনতে কত ভালো বল তো !"

ম্যাক্স কথা বলল না, পাইপ থেকে কয়েক তাল ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়ার তালগুলো যেন স্পষ্ট বলে উঠল—"দূর ! দূর !"

অটো বলল—"কোনোদিন নামের আগে 'শ্রী' লাগানোর কথাও ভাবিনি। কিন্তু 'রাজা' খেতাব লাগিয়ে ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজা বাদশার সমান হওয়ার সম্মান যদি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়—"

"দূর ! দূর !" জবাব দিল পাইপে ধূম্রকুণ্ডলী।

ফের অংকে মন দিল ম্যাক্স।

অটোর মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে টাকার স্বপ্নে। অস্থিরভাবে আঙুল মটকাতে মটকাতে ছটফট করতে লাগল ঘরময়। শেষকালে ম্যাক্স-ও ধৈর্য রাখতে পারল না।

বলল—"অটো, খোলা হাওয়ায় ঘুরে আয়। মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

"ঠিক বলেছিস ! এখন আর অংক-টংক মাথায় ঢুকবেনা", বলেই দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে সোজা রাস্তায়।

সামনেই পড়ল জোরালো গ্যাসের বাতি। তলায় দাঁড়িয়ে পিতৃদেবের চিঠিটা আর একবার পড়ল অটো। না, স্বপ্ন নয়, সত্যি !

"পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ ! তার মানে বছরে আড়াই কোটি সুদ। তা থেকে আমাকে দশলক্ষ দিলেই তো রাজার হালে থাকা যাবে।"

আপন মনে বকর বকর করতে করতে আর দুপাশের সারি সারি দোকানের ঝলমলে পণ্যসম্ভার দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগল অটো !

বুলেভার্ড এসে গেছে। দুপাশে আলো ঝলমলে রাশি রাশি মহার্ঘ জিনিসপত্র। এতদিন এসব জিনিসের দিকে ফিরেও তাকায় নি সে ট্যাকগড়ের মাঠ বলে। কিন্তু এখন প্রতিটি জিনিস যেন চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। যত দামীই হোক না কেন, অটো ইচ্ছে করলেই সব কিছুর মালিক হতে পারে।

বিরাম নেই মুখের—"সব আমার, সমস্ত আমার। মিহি কাপড়, নরম কাপড় তৈরী হয়েছে শুধু আমার জন্যেই। ঘড়িওলারা টাইমপিস আর ক্রনোমিটার বানিয়েছে শুধু আমার জন্যেই। আমার চিত্তবিনোদনের জন্যেই ঝলমলে রোশনাই ছড়াচ্ছে থিয়েটার আর অপেরা হাউস, বাজছে বেহালা। আমাকে মজা দেওয়ার জন্যেই ঘোড়ার বিক্রেতারা বশ করেছে দুর্দান্ত ঘোড়া,

কাফে অ্যাংলেসে জলছে আলোর মালা। সারা প্যারিস আমার, শুধু আমার! হাত বাড়ালেই পাবো সব কিছু নাগালের মধ্যে। ও হ্যাঁ, বেড়াতে হবে! দেশ ভ্রমণে বেরোতে হবে! ভারতবর্ষে আমার সম্পত্তি আমাকেই দেখে আসতে হবে দিন এলে হাতীর দাঁতের দেবদেবী আর পুরুৎ সমেত একটা মস্ত মন্দিরও কিনে ফেলব। কিনব বিস্তর হাতী। কিনব চমকদার বন্দুক আর রাইফেল, যাবো বাঘ শিকারে। একটা জমকালো নৌকোও কিনতে হবে জল বিহারের জন্যে। নৌকো কেন? কলে চলা জাহাজই কিনব। যেখানে খুশী যাবো, যেখানে খুশী থামব। ভাল কথা, মাকে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। দোয়াই রওনা হব নাকি? কলেজ যেতে হবে অবশ্য। ধুত্তোর! কলেজ গিয়েই বা হবেটা কি?

"কিন্তু ম্যাক্সকে খবর দিতে হবে। ওর জানা দরকার, এ অবস্থায় আমি স্থির থাকতে না পেরে দৌড়েছি মা-বোনের কাছে সুখবর নিয়ে।"

পোস্টাপিসে ঢুকে বন্ধুকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল অটো। দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরবে—এই খবর জানিয়ে একটা ছ্যাকর গাড়ীতে চেপে রওনা হল রেলস্টেশনের দিকে।

ট্রেনে চেপেও উদ্দাম চিন্তার বিরাম রইল না। বাড়ী পৌঁছোলো রাত দুটোয়। ঘণ্টাধ্বনি করল। প্রচণ্ড শব্দে বাড়ী শুদ্ধ লোক এমন কি পাশের বাড়ীর লোকেদেরও ঘুম ছেড়ে গেল ঢং-ঢং শব্দে। অনেকগুলো মুখ উঁকি দিল জানলায় জানলায়।

"নিশ্চয় কেউ ভারী অসুখে পড়েছে।" বিস্মিত হল সকলে।

চিলেকোঠা থেকে মুখ বাড়িয়ে হেঁকে উঠল বুড়ো চাকর—"ডাক্তারবাবু বাড়ী নেই!

"আরে আমি! আমি অটো! দরজাটা চটপট খোলো দিকি!"

মিনিট দশেক পরেই চৌকাঠ পেরোলো অটো। হন্তদন্ত হয়ে ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে নেমে এল তার মা আর বোন। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে প্রকাশ পেল সীমাহীন উদ্বেগ। ব্যাপার কি? নিশুতিরাতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল কেন?

চিঠিখানা পড়তেই পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য।

প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন ম্যাডাম সারাসিন।

ফলে, বাকী রাতটা নানারকম ফন্দী আর পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ নিয়ে ব্যস্ত রইল মা-বেটা। ভবিষ্যত দর্শনে অপারগ জানেট নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে লাগল আর্মচেয়ারে।

ম্যাডাম সারাসিন বললেন—"হ্যাঁ রে, ম্যাক্সকে তোর বাবার চিঠিটা দেখিয়েছিস? তার কথা তো একবারও বললি না। কি বলল সে?"

"ম্যাক্সের কথা আর বোলো না মা।" বলল অটো "সুখ দুঃখে একেবারেই উদাসীন সে, দার্শনিকের চাইতেও জঘন্য। ওর ধারণা এত টাকার মালিক হলে ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।"

"কে জানে, ম্যাক্স হয়ত ঠিকই বলেছে," বললেন ম্যাডাম সারাসিন। "হঠাৎ রাশি রাশি টাকা পেলে অনেক খারাপ ফল দেখা দেয় তো।"

ঠিক এই সময়ে ঘুম ভাঙল জানেটের। কানে গেল মায়ের শেষ কথাগুলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বলল "মা, তুমি না একবার বলেছিলে ম্যাক্স কখনো ভুল করে না? ম্যাক্স যা বলেছে, আমিও তা বিশ্বাস করি মনে প্রাণে।" বলে, মা কে চুমু খেয়ে শোবার ঘরের দিকে রওনা হল জানেট।

৩॥ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর

স্বাস্থ্য সম্মেলন যেখানে চলছে, বিরাট সেই হল ঘরে প্রবেশ করে ডক্টর সারাসিন টের পেলেন হঠাৎ যেন তাঁর খাতির যত্ন বেড়ে গেছে। অস্বাভাবিক আদর অভ্যর্থনার আয়োজন চলছে। সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান রাইট অনারেবল লর্ড গ্যানডোভার এতদিন তাঁকেও দেখেও দেখতেন না, কোনো পাত্তাই দিতেন না। নাক উঁচু সেই ভদ্রলোক পর্যন্ত ডক্টরকে তোয়াজ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোকের মুখভাব ফ্যাকাশে, চামড়ায় অগুন্তি লাল ফুটকি, মাথায় হাল্কা চুলের পরচুলা। করোটি নামক কোটরের ভেতরটা যে বিলকুল ফোঁপরা, তা কপালের ওপর টেনে চুল আঁচড়ানোর ধরন দেখেই বোঝা যায়। তাঁর আড়ষ্ট চালচলন দেখলে হাসি পায়, উৎকট গাম্ভীর্য দেখলে উজবুক বলেই মনে হয়। তাঁর অস্বাভাবিক আর আড়ষ্ট অঙ্গভঙ্গীর জন্যেই বারবার মনে হয় ভদ্রলোককে কাঠ বা পিচবোর্ড দিয়ে তৈরী করা উচিত ছিল।

সম্মেলনে আহূত ফরাসি পণ্ডিত ডক্টর সারাসিন সম্পর্কে ভদ্রলোকের নীরব মন্তব্য ছিল অনেকটা এইরকম—"নমস্কার কীটাণুকীট! নগণ্য যন্ত্র আবিষ্কার, তুচ্ছ এক্সপেরিমেণ্ট আর দীনহীন জীবনযাপন—এইভাবেই কাটছে তোমাদের মত অপদার্থদের জীবন চক্র!" এ হেন লর্ড গ্যানডোভার একগাল হেসে সেদিন অভ্যর্থনা জানালেন অকিঞ্চিৎকর ফরাসি পণ্ডিতকে। সম্মেলনের অন্যান্য সদস্যরাও সটান দাঁড়িয়ে উঠল ডক্টর মঞ্চে আবির্ভূত হতেই।

হঠাৎ তোয়াজ দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন ডক্টর সারাসিন। এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসতে বসতে ভাবলেন, নিশ্চয় তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক সতীর্থরা। প্রথম দিকে আমোল না দেওয়ার অনুতাপে তাই এখন উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁকে সম্মান জানাতে। কিন্তু এ-ধারণা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল লর্ড গ্র্যানডোভারের কথা শুনে। আড়ষ্ট ভদ্রলোক মেরুদণ্ডটাকে বিশেষভাবে দুমড়ে মুচড়ে হেলে পড়লেন ডক্টরের দিকে এবং ফিসফিস করে এই ক'টি কথা বর্ষণ করলেন তাঁর কানে—

"খবরটা শুনলাম। আপনার দাম এখন থেকে দুকোটি দশলক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং।"

ডক্টর সারাসিন তো হতবাক! গত অধিবেশনে তিনি কাউকেই বলেন নি যে তাঁর অনেক টাকা আছে। ফুটো পয়সা ছাড়া তাঁর ট্যাঁকে যে কিস্সু থাকে না, এ-খবর সবাই জানে বলেই কেউ তাঁকে কল্কে দেয়নি। খবরটা চাউর করল কোন জন?

এমন সময়ে বার্লিননিবাসী ডক্টর ওভিডিয়াস কাষ্ঠ হেসে কপট কণ্ঠে বললেন—"আরে মশাই, আপনি তো এখন রথসচাইল্ডদের সমান হয়ে গেলেন! বেড়ে লিখেছে ডেলী টেলিগ্রাফে। অভিনন্দন রইল।"

বলে, ডেলী টেলিগ্রাফ নামক খবরের কাগজটা ডক্টর সারাসিনের হাতে তুলে দিলেন ভদ্রলোক। পড়লেন ডক্টর। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল খবরটার মধ্যে খুঁটিনাটির বহর দেখে। কিছুই বাদ দেয়নি রিপোর্টার।

খবরটা পাঁচকান হয়েছে জেনে মেজাজ খিঁচড়ে গেল ডক্টর সারাসিনের। মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করলেন, সাধারণ মানুষ এখন থেকে তাঁকে টাকার কুমীর রূপেই সম্মান জানাবে—প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক হিসেবে নয়।

কথাটা ভাবতেই বিষম মুষড়ে পড়লেন ডক্টর। অনুভব করলেন জোড়া জোড়া চোখ পরম কৌতূহলে নিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ওপর। চাহনির মধ্যে বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য নেই। কোটিপতিকে দেখতে হয় কিরকম এই নিয়েই তাদের কৌতূহল। দর্শকরা কিন্তু অবাক হল ডক্টরের মুখে বিষাদ-মেঘ পুঞ্জীভূত হতে দেখে।

বিষাদ-মেঘ অবশ্য কেটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আচম্বিতে ডক্টরের মনের মধ্যে উদিত হল কোটি কোটি মুদ্রাকে কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনাটি তিনি মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন। হঠাৎ-পাওয়া সম্পদের যথা-ব্যবহারের প্ল্যানটি খেয়াল হতেই মনের মেঘ কেটে গেল তাঁর— সহজ হয়ে উঠলেন ডক্টর সারাসিন।

ডক্টর স্টিভেনসন (গ্লাসগো) তখন তাঁর গবেষণা নিবন্ধ পাঠ করছিলেন।

তরুণ মূর্খদের শিক্ষিত করার অভিনব পন্থা বর্ণনা করছিলেন সুললিত কণ্ঠে। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই চেয়ারম্যানের অনুমতি ভিক্ষা করলেন ডক্টর বিশেষ একটা ঘোষণা উপস্থাপিত করার জন্যে।

যদিও ডক্টর স্টিভেনসনের পরেই তালিকায় নাম ছিল ডক্টর অভিডিয়াসের, লর্ড গ্ল্যানডোভার কিন্তু তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করলেন তাঁর প্রার্থনা।

ছোট্ট ভূমিকার পর বললেন সারাসিন—"আপনারা ঠিকই জেনেছেন। এই মুহূর্তে আমি বহু কোটির মালিক।

"আইনগতভাবে এই সম্পত্তি আমার হাতে এলেও, প্রকৃতপক্ষে আমি চিনির বলদ ছাড়া কিছুই নই। বিজ্ঞানের কাজে, বিজ্ঞানের উপকারে এ-টাকা খরচ করবার জন্যেই নিযুক্ত হয়েছি বলতে পারেন।" (তুমুল হই চই) "এ-টাকা আসলে আমার নয় এ টাকা ব্যয় হবে মানুষের কল্যাণে ··মানব-প্রগতির উদ্দেশেই উৎসর্গ করছি বিপুল এই সম্পদকে।" (ভীষণ চাঞ্চল্য—হর্ষধ্বনি—হাততালি।) অত্যাশ্চর্য ঘোষণায় বিদ্যুতচালিত হয়ে এক সঙ্গে সটান দাঁড়িয়ে উঠল সমস্ত সদস্যরা।

"মশাইরা, আমাকে হাততালি দিয়ে মাথায় তুলবেন না। আমার জায়গায় বিজ্ঞানপ্রেমী যে কোনো ব্যক্তি এলেও আমার পথই নিতেন।

"কেউ-কেউ হয়ত বলবেন, এ হল আমার আত্ম অহমিকা বা আত্ম-শ্লাঘার বহিঃপ্রকাশ।" (না। না।) 'তাতে কিছু এসে যায় না। ফল নিয়ে আমাদের কথা।"

"তাই দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করছি, দুকোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং আমার নয়—বিজ্ঞানের। মশাইরা, এ টাকা আগলানোর আর সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব আপনারা কি নেবেন?

"এত টাকার ব্যাপারে আমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধির ওপর খুব ভরসা রাখি না। তাই অছিরূপে নিযুক্ত করছি আপনাদের। আপনারাই ঠিক করুন কিভাবে কাজে লাগাবেন এত টাকাকে।" (বিপুল হর্ষধ্বনি—দারুণ উত্তেজনা—ভীষণ উৎসাহ।)

আবার দাঁড়িয়ে উঠল ঘরশুদ্ধ লোক। কেউ কেউ উৎসাহের চোটে দাঁড়িয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। প্রফেসর টার্নবুল (গ্লাসগো) মনে হল মূর্চ্ছা যাবেন। দম আটকে এল ডক্টর সিকোগনার (নেপলস)।

শুধু একজনই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য হারালেন না। অবিচল রইলেন দারুণ হট্টগোল আর অস্থিরতার মধ্যে। ইনি লর্ড গ্ল্যানডোভার। কারণ ইনি ধরে নিয়েছিলেন, বড় রকমের মস্করা করছেন ডক্টর সারাসিন।

উত্তেজিত সদস্যরা একটু শান্ত হতেই ফের শুরু করলেন ডক্টর সারাসিন—

"আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা আছে। এ-প্ল্যানকে বাস্তবরূপ দেওয়া খুব কঠিন নয়। যদি অনুমতি করেন তো বলতে পারি।"

ঘরশুদ্ধ লোক উৎকর্ণ হল কোটিপতি বৈজ্ঞানিকের প্ল্যান শোনার জন্যে। সশ্রদ্ধ চোখে চেয়ে রইল ডক্টরের পানে।

ভদ্রমহোদয়গণ, অসুখ বিসুখ মৃত্যুর কারণ অনেক। অনেক কারণের মধ্যে যে কারণটি নিয়ে সবার আগে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত তা হল শহর পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যবিধির অব্যবস্থা। জল এবং হাওয়ার শোচনীয় আয়োজনের জন্যেই লক্ষ লক্ষ শহরে মানুষরা রোগে ভুগছে, সংক্রামক ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হচ্ছে। যারা প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে, তারাও পঙ্গু দেহে দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিধির যাচ্ছেতাই প্রয়োগ ব্যবস্থা থেকেই মানুষের এত দুর্ভোগ। জল এবং হাওয়া—সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে দুটোরই প্রয়োজন। "মশাইরা, আসুন আমরা প্রথমে শহরে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় মন দিই। আসুন বৈজ্ঞানিক বনেদের ওপর একটা আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠা করা যাক।" (সাবাস! সাবাস!) "আসুন আমরা মিলে মিশে, প্রত্যেকের মনের শক্তিকে একত্র করে, একাগ্র করে এমন একটি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করি যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। দিকে দিকে অনুরূপ শহর গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে।" (সাধু! সাধু! ভীষণ করতালি—ছাদ বুঝি ভেঙে পড়ার উপক্রম হল হাততালির বজ্রনির্ঘোষে)

উৎসাহিত সদস্যরা আনন্দের চোটে নিজেদের মধ্যেই করমর্দন শুরু করে দিলে। তারপর ঘিরে ধরল ডক্টর সারাসিনকে এবং চেয়ার শুদ্ধ তাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে বিজয় গৌরবে নাচতে লাগল ঘরময়।

"ভদ্রমহোদয়গণ," অতিকষ্টে স্বস্থানে ফিরে আসবার পর বললেন ডক্টর, "আদর্শ এই নগরীকে কল্পনায় আনা খুব কঠিন নয়। আমরা প্রত্যেকেই মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্য সুন্দর সেই মডেল সিটিকে। কল্পনা অচিরেই বাস্তব হবে। মডেল সিটিতে বিরাজ করবে সুখ আর শান্তি, স্বাস্থ্য আর সমৃদ্ধি। দুনিয়ার সব ভাষায় অনূদিত হবে মডেল সিটির বর্ণনা। আহ্বান জানাবো বিশ্ববাসীকে। বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে আসুক মানুষ রামরাজ্যে, আসুক নিরাশ্রয় মানুষ, উদ্বাস্তু মানুষ, সৎ মানুষ। বিশ্বের বহু অঞ্চলে মানুষ মাথা গোঁজবারও ঠাঁই পায় না—এত লোক সে সব জায়গায়। সেখান থেকে চলে আসুক তারা মডেল সিটিতে। আসুক সেই সব দুর্ভাগা মানুষরা যারা বিদেশী আক্রমণে পরাভূত হয়ে নির্বাসনে রয়েছে (মশায়রা, তাদের অবস্থাটা

একবারটি কল্পনা করার চেষ্টা করুন। কি কষ্টে তাদের দিন কাটছে বলুন তো?) তাঁদের আমরা চাকরী দেব এই রামরাজ্যে। তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে উন্নত করব মডেল সিটিকে, তাঁদের মেহনৎ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলব আদর্শ নগরীকে, তাঁদের নৈতিক এবং ধীশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাব। মণিমাণিক্য সোনা রূপোর চাইতেও কিন্তু অনেক দামী এই সব মানুষের আত্মশক্তি।

"মহতী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব এই শহরে। দেশের যুব সম্প্রদায়কে সার সত্য শেখাব, প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানী করব, বলিষ্ঠ করব তাদের দেহকে, মনকে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে—ভাবী বংশধরেরা যাতে সৎ, বলিষ্ঠ, বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে। তারা যেন পঙ্গু না হয়। মুমূর্ষু না হয়।"

কথাগুলোয় মধ্যে যেন বিদ্যুৎশক্তি ছিল। সেকী প্রচণ্ড উত্তেজনা। দেখা গেল কথা শেষ হতে না হতেই। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই তুমুল হট্টগোলের। মিনিট পনেরো ধরে হুররে ধ্বনি আর হর্ষধ্বনির ঝড় বয়ে গেল হলঘরের মধ্যে।

ডক্টর সারাসিন চেয়ারে বসতেই আবার তাঁর দিকে হেলে পড়লেন লর্ড গ্ল্যানডোভার। চোখ টিপে বললেন কানের কাছে নিম্নকণ্ঠে

"ফন্দীটা ভালই এঁটেছেন। বাড়ী ভাড়ার অংশটা ভাবুন দিকি। অনেক খানদানী লোক আসবে আপনার শহরে। প্ল্যান সফল হবেই হবে। ব্যাধি পুঞ্জ আর ক্ষীণজীবিরা দলে দলে ঠাঁই নেবে আদর্শ নগরীতে। ডক্টর, আমাকে একটা ভালো বাড়ী দিতে ভুলবেন না।"

বেচারা ডক্টর সারাসিন। তার উচ্চাদর্শকে যে এ রকম স্বার্থপরতা এবং নীচ আদর্শের ঠুলি পরে দেখা হবে, তা ভাবতেই পারেন নি। মুখের মত জবাব দিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে সাধুবাদ জানালেন জনগণ হিতৈষী ডক্টরের মহতী পরিকল্পনাকে।

বললেন—"অনন্তকালের জন্য ব্রাইটন সম্মেলন সম্মানিত হল এ-ধরনের একটা উদার মহৎ বিশুদ্ধ ধারণার উৎস হওয়ার জন্যে। মানব-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মস্তিষ্কে এই পরিকল্পনা উদিত হতে পারত, কিন্তু কি আশ্চর্য এতদিন আমরা কেউই এদিক দিয়ে ক্ষণমাত্র চিন্তাও করিনি।

"কোটি কোটি মুদ্রা অপচয় ঘটেছে বিধ্বংসী যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ বিসংবাদের মাধ্যমে। সেই মুদ্রাগুলি যদি এই জাতীয় কল্যাণকর শুভ পরিকল্পনায় ব্যয় হত, মানব সভ্যতা কি আরো এক ধাপ এগিয়ে যেত না? কি আনন্দের কথা, নিরর্থক মারামারি কাটাকাটির পেছনে টাকা না খাটিয়ে

এই প্রথম বিপুল সম্পদকে নিযুক্ত করা হচ্ছে অভিনব পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে!"

বক্তা বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে—"আমি প্রস্তাব করছি আদর্শ এই নগরীর নাম রাখা হোক নগর-প্রতিষ্ঠাতা সারাসিনের নামে।"

প্রস্তাবটা তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হওয়ার আগেই বাধা দিলেন ডক্টর সারাসিন নিজেই। বললেন—"না, তা হবে না। আমার নামের সঙ্গে আমার পরিকল্পনাকে জুড়ে রাখা চলবে না। পুরাণ থেকে ধার করে, গ্রীক বা ল্যাটিন নামেও নামকরণ করাব বিরোধিতা করছি আমি। নামের মধ্যে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রাখার দরকার নেই। আমার ইচ্ছে এ-শহরের নাম হোক আমার দেশেব নামানুসারে। আজ থেকে এ শহরকে আমরা ফ্রাঙ্কভিল শহর বলেই ডাকব।"

সবাই সানন্দে সম্মতি জানাল ডক্টর সারাসিনের প্রস্তাবে এবং মন দিল শহর প্রতিষ্ঠার বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায।

'ডেলী টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত আদি সংবাদটি কিন্তু ইতিমধ্যে তর্জমা হয়ে চলেছে পৃথিবীব বিভিন্ন ভাষায এবং প্রকাশিত হচ্ছে নানান খবরের কাগজে।

জার্মান খবরটা 'নর্দান গেজেট' এর সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌছোতেই তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে তাকে স্থান দেওয়া হল।

তেসরা নভেম্বব খোল নলচে পালটে খবরটা পৌছোলো জেনা ইউনিভার্সিটির তাগড়াই প্রফেসর স্থলৎস-যের হাতে।

ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ অথবা ছেচল্লিশ। মজবুত শরীর, চওড়া চৌকো কাঁধ, বলিষ্ঠ আকৃতি, কপাল থেকে উর্ধে বিস্তৃত টাক, রগ আর মাথার পেছনে কয়েকগাছি চুল যেন শনের গুছি। নীল চোখ দেখলেই বোঝা যায় মনের চিন্তা কখনো এ চোখে প্রকাশ পায় না মুখের পরিধি বেশ বড়, দু সারি বড় বড় দাঁত দেখলেই মালুম হয় এ দাঁত যার ওপর চেপে বসবে তার নাভিশ্বাস উঠবেই। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট জোড়া অবশ্য বেশ পাতলা এবং অধরোষ্ঠের একমাত্র কাজ হল মেপে মেপে কথা বলা।

সব মিলিয়ে প্রফেসরের চেহারা অন্যের চোখে বিরক্তি উৎপাদন করে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথা ব্যথা নেই। ভদ্রলোক অতীব হৃষ্ট নিজের নিরানন্দ মূর্তি নিয়ে।

চাকর ঢুকল ঘরের মধ্যে। চোখ তুললেন প্রফেসর। ম্যাণ্টলপিসে

বসানো ভাবী সুন্দর একটা ঘড়ির দিকে তাকালেন। শ্রীহীন জিনিসপত্রের মধ্যে অমন সুন্দর একটা ঘড়ি নেহাতই বেমানান লাগছিল অবশ্য।

খেঁকিয়ে উঠলেন কর্কশ গলায়—"ছটা পঞ্চান্ন! চিঠিপত্র খবরের কাগজ আসার কথা ছটা তিরিশে। পঁচিশ মিনিট দেরী করেছ। ফের যদি দেখি দেরী হয়েছে, দূর হয়ে যেও। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটায় চিঠিপত্র চাই আমি।"

এই বলে টেবিলে কাগজপত্র বিছিয়ে বসলেন প্রফেসর এবং মুহূর্তের মধ্যে লিখতে শুরু করলেন তাঁর নতুন প্রবন্ধ। পরের দিন "ফিজিওলজিক্যাল রেকর্ডস" পত্রিকায় মুদ্রিত হবে প্রবন্ধটা। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্যে প্রবন্ধটির শিরোনাম এখানে দিচ্ছি—"সব ফরাসির মধ্যেই বিভিন্ন মাত্রায় পুরুষানুক্রমিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে কেন?"

রাত দুপুরে শেষ হল প্রবন্ধ লেখা। শেষ পৃষ্ঠায় নাম সই করে হৃষ্টচিত্তে শয়ন করলেন শয্যায়।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বুলোচ্ছেন প্রফেসর, ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, এমন সময়ে তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল কয়েকটি কথা—'সোনার পাহাড়ের উত্তরাধিকারী' আর 'ল্যাংগেভল'। শেষের নামটি বিদেশী এর ঘুম জড়ানো চোখের নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল, অথচ কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, উৎসটি কোথায়। মিনিট কয়েক খামোকা হাতড়ালেন স্মৃতির মণি কোঠা। বিফল হয়ে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন এবং অচিরে নাসিকা গর্জনের মারফৎ জানিয়ে দিলেন তিনি নিদ্রিত।

শরীর তত্ত্বের নিগূঢ় কারচুপির জন্যেই ল্যাংগেভল নামটা কিন্তু প্রফেসরের পেছন পেছন তাঁর স্বপ্নলোকেও পৌঁছে গেল। প্রফেসর নিজেও স্বপ্নতত্ত্বের এই রহস্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু থই পান নি। তাই নিশার স্বপ্নে ল্যাংগেভল তার সঙ্গে অনেক লুকোচুরি খেলল সারারাত ধরে।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নিজের অজ্ঞাতসারে ল্যাংগেভল নামটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন প্রফেসর।

আচম্বিতে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চকিত আলোর ঝলকে যেন ঝলসে উঠল তাঁর মস্তিষ্কের কোষগুলো।

ছোঁ মেরে গতকালের কাগজটা তুলে নিলেন প্রফেসর। কপাল টিপে ধরে খুঁটিয়ে পড়লেন পুরো খবরটা। কালরাতে এ-খবর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল তার। আস্তে আস্তে আলো ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর মনের আকাশে। কেননা, খবর পড়া শেষ হতেই ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়ানোর ধৈর্যও আর রইল না।

ম্যায়ার প্রেসের সামনে ছিটকে গিয়ে দর্পণের পাশে ঝোলানো ছোট্ট ছবিটা নামিয়ে আনলেন দেওয়াল থেকে এবং মুছে ফেললেন পেছনের ধুলোর স্তর।

ঠিক ধরেছেন প্রফেসর। ছবির পেছনে জার্মান ভাষায় আবছা কালিতে যা লেখা রয়েছে, তার মানে এই :

"থেরেসা স্লুৎস (কুমারী নাম ল্যাংগেভল

সেই দিনই সন্ধ্যের ট্রেনে রওনা হলেন প্রফেসর।

৪ ॥ দুজন দাবীদার

নভেম্বর মাসের ছ তারিখে সকাল সাতটায় শ্যারিং ক্রসস্টেশনে পৌঁছোলেন প্রফেসর স্লুৎস। দুপুরে হাজির হলেন ৯৫ নম্বর সাদামটন রো'যে।

বিশাল আকারের মেহগনী টেবিলে বসেছিলেন মিস্টার শার্প। ঘরটা সাদাসিদে, ফেল্ট কার্পেট দিয়ে মোড়া মেঝে। এদিকে ওদিকে ছড়ানো খান কয়েক চামড়ার চেয়ার আর অনেকগুলো খোলা বাক্স।

চেয়ার থেকে ঈষৎ উঠে ব্যস্তবাগীশ কারবারীদের মত তৎক্ষণাৎ মিছিমিছি কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করেছেন মিস্টার শার্প। উদ্দেশ্য, তিনি যে কত ব্যস্ত, তা দেখানো। মিনিট কয়েক তিনি কাগজ নাড়া নিয়ে তন্ময় হওয়ার ভান করলেন। প্রফেসর স্লুৎস কষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দোর গোড়ায়।

অবশেষে বললেন মিস্টার শার্প— আমি কিন্তু মশায় খুবই ব্যস্ত। যা বলবার অল্প কথায় বলুন। হাতে সময় খুব কম। মিনিট কয়েকের মধ্যে বক্তব্য শেষ করে ফেলুন।"

অভ্যর্থনার বহর দেখে প্রফেসর কিন্তু বিন্দুমাত্র দমে গেলেন না। সামান্য হাসলেন।

বললেন—"কি কথা বলতে এসেছি শোনবার পর কিন্তু আরো কয়েক মিনিট কথা বলতে ইচ্ছে করবে।"

"বলুন, বলুন।"

"আমি এসেছি বার্লিডুক নিবাসী জ্যাকুইস ল্যাংগেভলের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে। আমি তাঁর বড়দি থেরেসা ল্যাংগেভলের নাতি। ১৭৯২ সালে আমার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল আমার দাদু মার্টিন স্লুৎসয়ের সঙ্গে। দাদু তখন ব্রান্সউইকের সৈন্যবাহিনীতে সার্জন ছিলেন। উনি মারা যান ১৮১৩ সালে। দিদিমাকে তাঁর ভাই তিনখানা চিঠি লিখেছিলেন। তিনখানা

চিঠিই আছে আমার কাছে। আমার জন্ম আর কুলপঞ্জী সম্পর্কেও অনেক আইন সম্মত দলিল আছে।"

প্রফেসরের অনাবশ্যক দীর্ঘ বাগবহুল বচন মালা দিয়ে এ কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করা সঙ্গত হবে না। এই একটি ব্যাপারে উনি ওঁর যা স্বভাব, ঠিক তার উল্টো হয়ে গেলেন। অর্থাৎ মুখে যেন খই ফুটতে লাগল। সেকি কথার তোড়! উদ্দেশ্য তাঁর একটাই। জার্মান জাতি যে সব জাতের উর্দ্ধে, তা প্রমাণ করা। একটা ফরাসি এত টাকা লুটে নিয়ে গিয়ে ফরাসি দেশের সেবায় লাগাবে, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। দাবীদার যদি একজন জার্মান হত প্রফেসর কখনো এগিয়ে আসতেন না।' কিন্তু একটা ফরাসি ইত্যাদি, ইত্যাদি · ।

ডক্টর সারাসিন কিন্তু ল্যাংগেভেলের নিকট আত্মীয়। সে তুলনায় ঈষৎ দূর সম্পর্কের আত্মীয় হচ্ছেন প্রফেসর। দাবীদার হিসেবে তাঁর দাবীও তেমন জোরদার নয়। ধুরন্ধর আইনবিদ মিস্টার শার্প চকিতের মধ্যে তা উপলব্ধি করলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে মনে আরেকটা মতলব ফাঁদলেন। উনি ভেবে দেখলেন দুই দাবীদারের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এবং দর কষাকষি করে দুপয়সা পকেটস্থ করা এমন কিছু কঠিন নয়।

এই ভেবেই তিনিও কথার জাল বিছোলেন। বাগাড়ম্বর করে বলে গেলেন ডক্টর সারাসিনের দাবী কতখানি জোরদার। কথার ফাঁকে বললেন, প্রফেসরের দাবী নিয়ে যদিও বা তাঁর কোম্পানী কোর্টে যায়, দাবী ধোপে টিঁকবে না।

প্রফেসর বোকা নন। তিনি ইঙ্গিত বুঝলেন এবং সলিসিটরকে শেষের সম্ভাবনাটা তলিয়ে দেখতে বললেন। অর্থাৎ কোর্টে যাওয়ার দরকার কী? সলিসিটর কলকাঠি নাড়লেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

মিস্টার শার্প তাই শুনে আরো বিনয় সহকারে নিবেদন করলেন, ফুরসৎ মত তিনি প্রফেসরের দাবী নিয়ে তলিয়ে দেখবেন। মাত্র কয়েক মিনিটের জায়গায় যে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল, তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্যও করলেন না।

মিস্টার শার্প টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পরের দিনই ডেকে আনলেন ডক্টর সারাসিনকে এবং বিস্মিত হলেন ডক্টরের অকপট স্বীকারোক্তি শুনে। জার্মান থেকে দাবীদার এসেছেন? আশ্চর্য কী! ডক্টরের বেশ মনে পড়ে দু'এক পুরুষ আগে তাঁর বংশের একজন মহিলা জার্মান বিয়ে করেছিলেন। নাম-ধামগুলো ঠিক মনে নেই অবশ্য।

মিস্টার শার্প ডক্টরের খোলাখুলি কথা শুনে তো অবাক। নিজে দাবীদার হয়ে প্রতিপক্ষ দাবীদারের দাবীর সমর্থনে এমন কথা যে কেউ বলতে পারে, তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

ধড়িবাজ আইনজ্ঞ হিসেবে তখন তিনি ডক্টরকে বোঝাতে লাগলেন, জার্মান দাবীদার যদি মামলা ঠুকে দেয়, তাহলে তার বিষময় পরিণাম কি-কি হতে পারে। এরকম একটা মোকদ্দমা তিরাশি বছর চলবার পর স্রেফ টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুদে-আসলে গোটা সম্পত্তিটাই খরচ হয়ে গিয়েছিল মামলা চালাতে গিয়ে। এ-মামলাও বছর দশেক তো এমনিতেই চলবে। ইত্যবসরে কোটি কোটি মুদ্রা জমা পড়ে থাকবে ব্যাংকে।

ডক্টর সারাসিন নিশ্চুপদেহে দীর্ঘ বক্তিমে শুনছিলেন বটে, কিন্তু ভেতর ভেতর দমে গিয়েছিলেন ভীষণভাবে। ঘাটে এসে নৌকো ডুবছে যেন। নাগালের মধ্যে এসেও ফস্কে যাচ্ছে বিপুল বৈভব। আদর্শ নগরীর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে।

কথা শেষ হতেই শুধোলেন—"কি করতে হবে এবার বলুন।"

করবার তো অনেক কিছুই আছে, জানালেন মিস্টার শার্প। বৃটিশ আইন খারাপ তো নয়, তবে বড্ড মন্থর। তবে একদিন না একদিন সম্পত্তি ডক্টরের হেপাজতেই আসবে।

ভীষণ মুষড়ে পড়ে সলিসিটরের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর। স্পষ্ট বুঝলেন, হয় মোকদ্দমায় নামতে হবে, নয় স্বপ্নকে ভুলতে হবে।

ইতিমধ্যে মিস্টার শার্প ডাকিয়ে আনলেন প্রফেসরকে। কাঁচা মিথ্যে বলে গেলেন গড়গড় করে। ডক্টর সারাসিন নাকি প্রফেসরের দিদিমাকে চেনেনই না।

বুদ্ধিমান প্রফেসর কথার ফুলঝুরির মধ্যে থেকে আসল কথাটি বেছে নিলেন এবং সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন—"ফরাসি ডক্টরের সঙ্গে রফা করতে গেলে কত দিতে হবে শুনি?"

সরাসরি কাজের কথায় আসায় মিস্টার শার্প ঈষৎ হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু কোনো আভাস দিলেন না। বিদায় হলেন প্রফেসর। জেনে গেলেন তাঁর দাবী স্রেফ ফোঁপরা দাবী। তবে কিছু পাইয়ে দেওয়াটা নির্ভর করছে সলিসিটরের ওপর। সুতরাং পুরো ক্ষমতা দেওয়া রইল মিস্টার শার্পের ওপর।

পরের দিনই ডক্টরকে ডাকিয়ে আনলেন সলিসিটর এবং ভড়কে গেলেন তাঁর নির্বিকার মুখভাব দেখে। তবে কি মোচড় দিতে গিয়ে পার্টি ফস্কে

গেল? সাত তাড়াতাড়ি তিনি জানালেন জার্মান প্রফেসর রক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। ডক্টর কি রাজী হবেন?

ডক্টর সারাসিন এই কদিন এই লাইনেই চিন্তা করেছেন। তিনি সলিসিটরকে যা খুশী ব্যবস্থা করার ঢালাও অনুমতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

মিস্টার শার্প যা চাইছিলেন, এতদিনে তা পেলেন। দু'পক্ষই পুরোপুরি নির্ভর করছে তাঁর ওপর। আপোষ মীমাংসা এখন আর অসম্ভব নয়। তৎসত্ত্বেও তিনি দিন সাতেক খেলালেন প্রফেসর এবং ডক্টরকে।

সাতদিন পর বুঝলেন, সময় হয়েছে, এবার কথাটা পাড়া যায়। ডক্টরকে চিঠি লিখে জানালেন, প্রফেসর রক্ষা করতে রাজী হয়েছেন।

শেষ মুহূর্তে একজন ব্যাংকারকে হাজির করলেন। নাম তার স্টিবলিং। সেই ভদ্রলোকের হৃদয় নাকি গলে গিয়েছে দুই দাবাদারের উৎকণ্ঠা দেখে। তাই দুজনের প্রত্যেককে দিতে চাইলেন এক কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং। নিজের কমিশন বাবদ রাখবেন বাড়তি দশ লক্ষ।

যথাসময়ে সই হয়ে গেল দলিলপত্র। দুই দাবীদার হাতেনাতে পেলেন এক কোটি মুদ্রার এক-একটি চেক। অ্যাংলো স্যাক্সন জাতির জয় জয়কার পড়ে গেল এরকম একটা অত্যাশ্চর্য বিবাদের সুচারু নিষ্পত্তির জন্যে।

সেইদিনই রাত্রে কিন্তু কবডেন ক্লাবে প্রিয় বন্ধু স্টিবলিংকে নিয়ে ভালমন্দ খেতে বসলেন মিস্টার শার্প। খানাপিনা শুরু হল স্যাম্পেন পান করে উত্তম স্বাস্থ্য কামনা করা হল ডক্টর সারাসিনের এবং প্রফেসর সুলৎসের। শেষ বোতল ফুরোতেই হুল্লোড় করে উঠলেন মিস্টার শার্প—

"হুররে! জয় হোক ব্রিটানিয়ার! এবার তো কেল্লা মার দিয়া!'

আসল ব্যাপার হচ্ছে কি ঠিকমত দাও পিটতে না পারার জন্যে মিস্টার শার্পের ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাঁর বন্ধু স্টিবলিং। তার মতে এরকম মওকা পেয়ে এত অল্পে ডক্টর সারাসিনকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।

প্রফেসর সুলৎস-য়ের ধারণাও কিন্তু স্টিবলিং-য়ের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। ডক্টর সারাসিনের মত কল্পনাপ্রবণ অসতর্ক 'কেল্ট'কে আরও দুয়ে নেওয়া যেত। তাই স্টিবলিং-য়ের মত ইনিও মনে করেন, মিস্টার শার্প ডাহা বোকামি করেছেন ওরকম মূর্খ দুধেলা গাইকে এত সহজে রেহাই দিয়ে!

ডক্টর সারাসিনের পরিকল্পনা শুনেছিলেন প্রফেসর। প্ল্যানটা যে একেবারেই উদ্ভট এবং শেষ পর্যন্ত বানচাল হবেই, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। আদর্শ নগরী কোন মতেই সম্ভব নয়।

প্রফেসর নিজে রসায়নবিদ। তাছাড়া বিস্তর নিবন্ধতে তিনি প্রমাণ

করেছেন, এক সময়ে জার্মান জাতটা পৃথিবীর আর সব নিকৃষ্ট জাতকে গ্রাস করবেই করবে। বিধাতার অমোঘ বিধানে দিদিমার সঙ্গে যেদিন দাতুর বিয়ে হয়েছিল, সেইদিনই নিয়তির ইঙ্গিত বোঝা গিয়েছিল। অর্থাৎ জার্মান আর ফরাসিরা উত্তরকালে প্রফেসর স্থলৎস আর ডক্টর সারাসিনের মাধ্যমে মুখোমুখি হবে এবং জার্মান জাত ধ্বংস করবে ফরাসি জাতকে। ডক্টরের অর্ধেক সম্পদ বাগানো গিয়েছে। এবার সেই টাকা দিয়েই সর্বনাশ করা যাক তাঁর।

ডক্টর সারাসিনের প্রকৃত মতলব ভালভাবে জানবার জন্যে কংগ্রেসের সব কটা অধিবেশনে হাজির রইলেন প্রফেসর। কান খাড়া করে শুনলেন মডেল সিটি স্থাপনার খুঁটিনাটি। তারপর একদিন সদলবলে ডক্টর সারাসিন অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলেন প্রফেসরের সর্বনাশা ঘোষণা: ফ্রাঙ্কভিল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর নিজেও এমন একটা দুর্ভেদ্য নগরী প্রতিষ্ঠা করবেন যা ফ্রাঙ্কভিলের মত উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক উইয়ের ঢিপিকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে! প্রফেসরের এক্সপেরিমেণ্ট বিশ্বে আদর্শ স্থানীয় হবে, একটা নতুন ধরনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবে পৃথিবীবাসীর সামনে!

ডক্টর সারাসিনের মনে বিশ্বপ্রেম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে এ কথাও তিনি জানতেন যে তাঁর সতীর্থদের সকলেই বিশ্বপ্রেমিক নামের যোগ্য নয়। তাই প্রফেসরের হুমকি তিনি মনে রাখলেন। দিন কয়েক পরে ম্যাক্সকে চিঠি লিখতে বসে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই ঘটনাটির বর্ণনাও দিলেন। প্রফেসরের চেহারা চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনা পড়ে তরুণ ম্যাক্স কিন্তু বুঝল, হুমকিটা ফাঁকা নয়। প্রতিপক্ষ অতিশয় ভয়ংকর।

সবশেষে ডক্টর লিখলেন—"দুঃসাহসী, উৎসাহী, শক্তিমান, বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন যুবাপুরুষদের আমার দরকার শুধু নগর প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়—প্রতিরক্ষার জন্যেও বটে!"

জবাবে লিখল ম্যাক্স—

এই মুহূর্তে নগর প্রতিষ্ঠার কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। তবে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। সময় হলেই আমাকে দেখতে পাবেন। প্রফেসর স্থলৎস-কে একটা দিনের জন্যেও চোখের আড়াল করব না জানবেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনার অনুগত থাকব। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমার খোঁজ না পেলেও উদ্বিগ্ন হবেন না।

৫ ॥ স্টালটাউন্

বেগম গোকুলের কুবেরের সম্পত্তি দুই উত্তরাধিকারীকে ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়ার পর অতিবাহিত হয়েছে সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর। স্থান, যুক্তরাষ্ট্র। জায়গাটা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দশ লীগ দূরে অরিগাঁও-য়ের উত্তরদিকে। পাহাড় ঘেরা অঞ্চল।

আল্পস্ পর্বতের শিখর চূড়ায় শোভিত মনে হলেও এখানকার পাথুরে স্তর আর মৃত্তিকার তলায় নিহিত রয়েছে শুধু কয়লা আর লোহার স্তূপ।

পাশ দিয়ে গেলে কানে ভেসে আসবে কলে চলা হাতুড়ির প্রচণ্ড নির্ঘোষ। পায়ের তলায় অনুভূত হবে বারুদ বিস্ফোরণের চাপা গুমগুম ধ্বনি। মনে হবে যেন পাতাল রাজ্য জুড়ে থিয়েটার-রঙ্গমঞ্চে আশ্চর্য নাটকের মহড়া চলছে।

পাহাড় ঘিরে পাকদণ্ডীতে ছড়ানো ছাই আর কয়লা গুঁড়ো। কয়লা কালো বিষণ্ণ পথঘাট। ধাতুর গাদ জমানো রয়েছে পাহাড়ের আকারে। আগাছায় ঢাকা পড়েনি সেই কৃত্রিম পাহাড় শ্রেণী। এখানে সেখানে মুখব্যাদান করে রয়েছে পাতাল-বিবর—খনি-গহ্বরের প্রবেশ পথ। পরিত্যক্ত খনির অন্ধকারাচ্ছন্ন রন্ধ্রপথের মুখ ঢেকে গেছে বুনো কাঁটা গাছে। বাতাস ভারী উঠেছে ঘন ধোঁয়ায় এবং মনে হচ্ছে যেন শবাধারের কৃষ্ণ কালো পর্দা ঝুলছে মাটির ওপরেই। কীটপতঙ্গর ডাক বা প্রজাপতির ডানামেলা সে অঞ্চলে নেই।

এ জায়গার নাম 'স্টালফিল্ড' অর্থাৎ 'ইস্পাত-ক্ষেত্র'।

পাঁচ বছরের মধ্যেই পর্বতবেষ্টিত কঙ্করাকীর্ণ অনুর্বর এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে আঠারোটা গ্রাম। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়ী কাঠের তৈরী। দেখতে একরকম। বাড়ীগুলো তৈরী হয়েছে শিকাগোতে—তৈরী অবস্থায় এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে অগুন্তি শ্রমিকদের জন্য।

গ্রামগুলোর ঠিক মাঝখানে কয়লার স্তূপের পাদদেশে অদ্ভুত দর্শন বিশাল কতকগুলো সৌধ। কিম্ভূতকিমাকার কিন্তু বিরাটকায় অট্টালিকাগুলো একই প্যাটার্ণের। দরজা জানালা সমান মাপে তৈরী, ছাদের রঙ টকটকে লাল। বলয়াকারে সারি সারি চোঙার মত চিমনি ঘিরে আছে বিকট দর্শন সৌধ শ্রেণীকে। গলগল করে অহরহ ধোঁয়া বেরুচ্ছে চিমনির মুখ দিয়ে—ভেসে যাচ্ছে তমাল কালো মেঘের মত। আকাশ ঢেকে গেছে যেন কালো পর্দায়। যবনিকা ফুঁড়ে মধ্যে মধ্যে লকলক করে উঠছে অগ্নিশিখা। সেই সঙ্গে শোনা

যাচ্ছে গুড়গুড় গুমগুম শব্দ। যেন দূরায়ত মেঘগর্জন অথবা বেলাভূমিতে তরঙ্গ ভঙ্গের মত একটানা একঘেয়ে নির্ঘোষ।

এই হল স্টালটাট অথবা স্টীল টাউন! জার্মান সিটি—প্রফেসর সুলৎস-য়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বেগম গোকুলের অর্ধেক সম্পত্তিকে লোহার কারবারে লাগিয়েছেন জেনার ভূতপূর্ব কেমিস্ট্রির অধ্যাপক এবং এই ক'বছরের মধ্যে ইস্পাত শিল্প তথা কামান শিল্পে দুনিয়ার সেরা হতে পেরেছেন।

যে কোনো ধরনের কামান বন্দুক নির্মাণে জুড়ি নেই তাঁর। সরু, মোটা ভারী, হাল্কা—সবরকম আগ্নেয়াস্ত্র তিনি বানান এবং বিক্রী করেন রাশিয়া, তুবস্ক, রুমানিয়া, জাপান, ইটালী, চীন দেশে—বিশেষ করে জার্মানীতে।

বিপুল সম্পত্তির দৌলতেই যেন আলাদীনের আশ্চয প্রদীপের ম্যাজিকে রাতারাতি গড়ে উঠেছে এই নগরী—ঠাঁই নিয়েছে তিরিশ হাজার শ্রমিক। এদের অধিকাংশ জার্মান। কয়েক মাস যেতে না যেতেই পৃথিবী জোড়া সুনাম কিনেছে প্রফেসরের কামান, বন্দুক, ইস্পাত।

নিজের এলাকা থেকেই কয়লা আর লোহা তুলে আনেন প্রফেসর। কারখানায় বানিয়ে নেন ইস্পাত, তারপর কামান।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা যা পারেন না, প্রফেসর তা পারেন।

যত বড়ই হোক না কেন এবং যত ভারীই হোক না কেন, অর্ডার মুখ থেকে খসতে না খসতেই চকচকে কামান ঢালাই করে দেবেন তিনি—যেদিন দেবার কথা, ঠিক সেই দিনই দেবেন—একটা দিনও বাড়তি নেবেন না।

অন্যান্য কাজের মতই কামান ঢালাইয়ের কারিগরিতে তিনি এমন কোনো গুপ্ত কৌশল রপ্ত করেছেন" অপরে জানেনা, সুতরাং তাঁকে রোখে কে। প্রফেসরের তৈরী কামানের গুণ অনেক। প্রথমতঃ এতবড় কামান ইতিপূর্বে কেউ ঢালাই করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কামান ছুঁড়তে গিয়ে কখনো ফেটে চৌচির হয় না। স্টালটাট ইসপাতের বিশেষ গুণের জন্যেই এরকমটি হয়। রহস্যজনক কেমিক্যাল ফরমুলাটি নিয়ে বহু গল্প মুখে মুখে শোনা যায় বটে, কিন্তু অমূল্য সেই গুপ্ত রহস্যর সন্ধান কেউ কখনো পায়নি।

গুপ্ত রহস্যটিকে কিন্তু স্টালটাট শহরে কড়া পাহারা দিয়ে আগলে রাখা হয় দিবস রজনীর প্রতিটি মুহূর্তে।

স্টীলটাউনে কারো স্বাধীনতা নেই।

গোটা শহরটা পরিখা আর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের গায়ে যে কটা তোরণ আছে, তার প্রতিটিতে মোতায়েন থাকে অত্যন্ত কড়া ধাতের প্রহরীর দল। তাদের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে ভেতরে ঢুকতে হলে চাই

সই করা, শীলমোহর লাগানো এবং পালটা দস্তখৎ করা হুকুমনামা। যার পকেটে তা নেই, তাকে তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে হবে বাইরের ছাউনিতে।

নভেম্বর মাস, ভোরের দিকে একজন তরুণ শ্রমিক এসে পৌঁছোলে স্টালটাট শহরে। লৌহ-নগরীতে প্রবেশের অনুমতি-পত্র নিশ্চয় তার কাছে ছিল। তাই সরাইখানায় তার জীর্ণ পোর্টম্যান্টো ব্যাগটা রেখে দিয়ে পা চালালো গ্রামের নিকটতম তোরণ অভিমুখে।

তরুণ শ্রমিকের চেহারাটি দেখবার মত। পেশীবহুল বলিষ্ঠ মূর্তি।

বাদামী গোঁফের ফাঁক দিয়ে মহাফুর্তিতে শিস দিচ্ছে নওজোয়ান।

ফটক এসে গেছে। শান্ত্রীরা তার অনুমতি পত্র দেখেই পথ ছেড়ে দিল।

সেইসঙ্গে বললে নিরস কণ্ঠে—"সেকশন K, ৯ নম্বর রাস্তা, ৭৪৩ নম্বর কারখানা, দেখা করবে ফোরম্যান সেলিগম্যানের সঙ্গে। ডানদিকের গোল রাস্তা ধরে সিধে চলে যাও K সীমান্তে—সেখানে কুলির সঙ্গে দেখা করবে। নিয়ম জানা আছে তো? নিজের সেকশন ছাড়া অন্য সেকশনে ঘুরঘুর করলেই গলা ধাক্কা খাবে।"

এগিয়ে চলল তরুণ শ্রমিক।

দেখল, সব কিছুই দানবিক ছকে নির্মিত। চাকার নাভি বিন্দু থেকে শিকগুলো যেভাবে রশ্মি আকারে বাইরে বিচ্ছুরিত থাকে, স্টীল সিটির পরিকল্পনাতেও অবিকল সেই নক্সা অনুসরণ করা হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে এক একটা সেকশন। একই পরিখা এবং প্রাচীর দিয়ে প্রতিটি সেকশন পাশের সেকশন থেকে একেবারেই আলাদা করা এবং পুরোপুরি স্বয়ং সম্পূর্ণ।

সীমান্ত এসে গেল। রাস্তার পাশেই অতিকায় ফটক। পাথরের গায়ে হরফটি পেল্লাই আকারে খোদাই করা রয়েছে।

ফটক প্রহরায় এবার কিন্তু শান্ত্রীর বদলে মোতায়েন রয়েছে একজন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক। পা দুটো কাঠের এবং বুকে ঝুলছে অনেকগুলো পদক।

অনুমতি পত্রে শীলমোহর করে দিয়ে বলল সে—"বাঁ দিকে, ৯ নম্বর রাস্তা।"

দ্বিতীয় প্রাচীর পেরিয়ে এল নওজোয়ান এবং অবশেষে এসে পৌঁছোলে সেকশনে।

গুরুগম্ভীর নিনাদে কানে বুঝি তালা লেগে যাচ্ছে। ধূসর সৌধগুলি অগুন্তি গবাক্ষ হুহাট করে দাঁড়িয়ে আছে বিকটাকার দৈত্যের মত।

পাঁচ মিনিট লাগল ৯ নম্বর রাস্তায় পৌঁছোতে। সেখান থেকে সটান ৭৪৩ নম্বর কারখানা এবং ছোট্ট দপ্তরে পৌঁছোতে লাগল আরো কয়েকটা

মিনিট। কাগজপত্র, বই-খাতা এবং পোর্টফোলিও ঠাসা অফিসে বসেছিল ফোরম্যান সেলিগমান।

অনুমতিপত্র হাতে নিয়ে সবকটা শীলমোহরের ছাপ খুঁটিয়ে দেখল ফোরম্যান। চোখ বুলিয়ে নিল নওজোয়ানের চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত।

বলল—"কাজটা লোহাপেটার। তোমার বয়স তো দেখছি খুবই কম।"

"কাজের সঙ্গে বয়েসের কোনো সম্পর্ক নেই। সাত মাস ধরে লোহা পিটে আসছি আমি। গায়ের জোরের সার্টিফিকেট দিয়েছেন নিউইয়র্কের হেড ওভারসিয়ার।" পরিষ্কার জার্মান ভাষায় গড়গড় করে জবাব দিল নওজোয়ান। কথার টান শুনে কিন্তু যেন সন্দেহ হল ফোরম্যানের।

শুধোলো—"তুমি অ্যালসেশিয়ান?"

"না, সুইস। কাগজপত্র দেখলেই বিশ্বাস হবে আপনার।"

কাগজপত্র দেখে হৃষ্টচিত্তে বলল ফোরম্যান—"চাকরীতে যখন বহাল হয়েছো, তখন আমার কাজ শুধু তোমার ডিউটি কি হবে তা দেখিয়ে দেওয়া।"

এই বলে অনুমতিপত্র থেকে 'জোহান' এই নামটা রেজিস্ট্রি খাতায় লিখে নিল ফোরম্যান। নওজোয়ানের হাতে তুলে দিল একটা নীল কার্ড। তাতে লেখা তার নাম জোহান এবং ক্রমিক সংখ্যা ৫৭,৯৩৮।

বলল—"রোজ সকাল সাতটায় হাজির হবে গেটে। অনুমতিপত্র আর এই কার্ড দেখাবে। র‍্যাক থেকে তোমার নম্বর লেখা টোকেন নিয়ে ভেতরে আসবার সময়ে আমাকে দেখিয়ে যাবে। সন্ধ্যে সাতটার সময়ে যখন বেরোবে, তখন টোকেনটা কারখানার দরজার কাছে রাখা বাক্সে ফেলে যাবে—বাক্স খোলা থাকবে ঠিক সেই সময়ে।"

নওজোয়ান বললে—"নিয়ম-কানুন আমি জানি। আমি শহরে থাকব তো?"

"না। বাইরে থাকবার ব্যবস্থা করে নিও। ক্যান্টিনে অবশ্য সস্তায় খেতে পাবে। তোমার মাইনে হবে প্রতিদিন এক ডলার। তিন মাস অন্তর মাইনে বাড়বে। বেয়াড়াপনার একমাত্র শাস্তি হল চাকরী থেকে বরখাস্ত। আজ থেকেই কাজ শুরু করছো?"

"নিশ্চয়।"

"তার মানে আধ-বেলার মাইনে পাবে," বলে নওজোয়ানকে ভেতরে নিয়ে গেল ফোরম্যান।

চওড়া পথ বেয়ে হাঁটছে দুজনে। পথের শেষ একটা ময়দানের মত বড় হলঘর। পেশাদার চোখ দিয়ে যন্ত্রপাতির এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল নওজোয়ান।

সুদীর্ঘ হলঘরটার দু-পাশে দু-সারিতে সাজানো সুউচ্চ থাম। কাঁচের ছাদ ফুঁড়ে যেন মেঘলোকে পৌঁছেছে থামগুলো।

এই হল কারখানার চিমনি। একটা দুটো নয়—একটা ঘরেই পঞ্চাশটা চিমনি। পঞ্চাশটা পাডলিং ফার্নেসের সঙ্গে যুক্ত। নওজোয়ানের কাজটাও পাডলারের কাজ।

বিরামবিহীনভাবে চলছে দানবিক শক্তির খেলা। সে দৃশ্য দর্শক দেখে আঁৎকে উঠবে, গলিত লোহার স্রোত, সোঁ-সোঁ গর্জন, ফুলঝুরির মত অত্যুজ্জ্বল ফুলকির ধারা, হাতুড়ির নির্ঘোষ, আগুনরাঙা ফার্নেসের চোখ ধাঁধানো দীপ্তি আর বুক কাঁপানো বিশালতার সামনে অনভ্যস্ত মানুষ মাত্রই অসহায় শিশুর মত এতটুকু হয়ে যেতে বাধ্য।

পাডলাররা যেন এক-একটি অসুরবিশেষ। অমানুষিক শক্তিধর প্রতিজনে। চারশ পাউণ্ড ওজনের গরম লোহার বল পাকানো এবং অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির সামনে আগুনের প্রচণ্ড আঁচ সয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা সহজ কথা নয়।

নিজের শক্তি দেখানোর জন্যেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটিয়ে একটা আঁকশি টেনে নিয়ে গলিত লোহা ঠেলতে আরম্ভ করল নওজোয়ান। কিছুক্ষণ তাই দেখে সন্তুষ্ট হয়ে অফিসে ফিরে গেল ফোরম্যান।

কিন্তু নওজোয়ান বোধহয় সকালে খেতে ভুলে গিয়েছিল। অথবা প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে গেলে যাওয়ার দরুন ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘণ্টা কয়েক পরেই।

সর্দার খবর পাঠালো ওপরওয়ালাকে। তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ল চীফ-ইঞ্জিনীয়ারের ঘরে।

সেখানে আরেক দফা পরীক্ষা করা হল তার কাগজপত্র।

আমতা আমতা করে ছোকরা বললে—"সত্যি কথাই বলি তাহলে। ব্রুকলিনে আমার চাকরী হয়েছিল ঢালাইয়ের কাজে। বেশী মাইনের লোভে ভেবেছিলাম পাডলারের কাজ করব।"

"পঁয়ত্রিশ বছরেও যে কাজ করার শক্তি আসে না পঁচিশ বছরে সে কাজ তুমি পারবে না। ঢালাই জানা আছে?"

"ফার্স্ট ক্লাশে দুমাস ছিলাম।"

"এখানে থার্ড ক্লাশ থেকে শুরু করো। ছোকরা তোমার কপাল ভালো, তাই এত সহজে সেকশন পালটাতে পারলে!"

অনুমতি-পত্রের ওপর কয়েক লাইন লিখে একটা তারবার্তা পাঠালো চীফ-ইঞ্জিনীয়ার।

নওজোয়ানকে বললে—"এ সেকশনে আর তুমি নেই। যাও 'O' সেকশনে। ইঞ্জিনীয়ার খবর পেয়েছেন।"

একই রকম কড়াকড়ির মধ্যে K সেকশন থেকে O সেকশনে এসে পৌঁছোল তরুণ শ্রমিক। এখানকার ঢালাই ঘরে কিন্তু আওয়াজ অনেক কম। ছকে বাঁধা হিসেবে চলছে কাজকর্ম।

ফোরম্যান জানাল—"এ কারখানায় শুধু ছোট কামান বানানো হয়। ফার্ষ্ট ক্লাশ শ্রমিকরা ঢালাই করে বড় কামান।'

'ছোট্ট' কারখানার আকার অবশ্য লম্বায় সাড়ে চারশ ফুট এবং চওড়ায় দুশ ফুট। পাশাপাশি থাকে চারটে, আটটা এবং বারোটা পর্যন্ত কড়া বসানো। সব মিলিয়ে একসাথে দু'শ কড়া চাপা রয়েছে সারি সারি উনুনে।

এ-কাজ নওজোয়ানের কাছে নতুন নয়। সমান উচ্চতার দোসর জুটিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখিয়ে দিল ঢালাইয়ের কাজ তার কাছে কিছুই নয়। দিনের শেষে সর্দার খুশী হয়ে অভয় দিল তাকে। আশ্বাস দিল, শীগগিরই মাইনে বাড়বে এভাবে কাজ করলে।

সন্ধ্যে সাতটা বাজতেই O সেকশন থেকে বেরিয়ে এল তরুণ শ্রমিক। সরাইখানায় গিয়ে পোর্টম্যান্টো নিয়ে গ্রামে ঢুকল আচ্ছাদনের খোঁজে। অচিরেই তা পাওয়া গেল একজন মহিলার বাড়ীতে সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে অন্যান্য শ্রমিকদের মত তাড়িখানায় না গিয়ে দরজা বন্ধ করে লম্ফ জ্বালিয়ে বসল তরুণ শ্রমিক। কারখানা থেকে আনা এক-টুকরো লোহা উল্টেপাল্টে দেখল আলোর সামনে। তারপর ব্যাগ থেকে বার করল একটা জাবদাখাতা। খাতার অর্ধেকভর্তি নানারকম অ ক আর ফরমূলায়।

সধূম দীপশিখার পাশে খাতা রেখে সাংকেতিক হরফে লিখতে বসল দিনপঞ্জী। এ-হরফ শুধু সে জানে, আর কেউ নয়। য লিখল, তা এই :

"দশই নভেম্বর—স্টালটাট। পাডলিংয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। শুধু যা দু-ধরনের তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রুপ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে প্রশংসনীয় ভাবে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন গতিতে বিরামবিহীনভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা শুধু জার্মান শক্তিতেই সম্ভব।

কোথাও তাল কাটেনা। সত্যিই দেখবার মত। উৎপাদনের মধ্যে এখনো পর্যন্ত রহস্যজনক কিছুর সন্ধান পাইনি। লোহার টুকরোটা মামুলি নিদর্শন। যে কোনো ভাল কারখানায় এমনি লোহা তৈরী করা যায়।

"কয়লাটা অবশ্য খুবই মিহি। এ রকমটি সচরাচর দেখা যায় না। প্রচুর ধাতব গুণ নিহিত রয়েছে এ-কয়লায়। তবুও বলব রহস্য কিছুই নেই এর মধ্যে।

"একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। যে কোনো আকরিক বস্তুকে পুরোপুরি শোধন করা হয় এ কারখানায়—যাতে পরিপূর্ণ শুদ্ধ ধাতু দিয়ে মনের মত জিনিস গড়ে নেওয়া যায়। বাকী রহস্যটা ভেদ করতে হলে আমাকে প্রথমেই জানতে হবে, যে দুর্গল মৃত্তিকা দিয়ে ফানেল তৈরী হয়েছে, তার ভেতরে কি-কি উপাদান আছে। এটা আবিষ্কার কবতে পারলেই আমাদেব শ্রমিককে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এখানকার লোহা আমরাও বানাতে পাবব। যাই হোক, সবে তো দুটো সেকশন দেখলাম। এখনো রয়েছে চব্বিশটা সেকশন, কেন্দ্রীয় ভবন, প্ল্যান আর মডেল ডিপার্টমেণ্ট, সিক্রেট ক্যাবিনেট। কে জানে গুপ্ত গুহায় কি ধরনেব বিপজ্জনক মন্ত্রণা দানা বাঁধছে প্রতিটি মুহূর্তে! বেগম গোকুলের অর্ধেক সম্পদেব মালিক হয়ে যে হুমকি ছেড়েছিলেন প্রফেসর সুলৎস, কে জানে তাব উদ্যোগপব সমাপ্ত হয়ে এল কিনা!"

লেখা শেষ হল। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পব শ্রান্ত নওজোয়ান এবার এলিয়ে পড়ল সাদামাটা জার্মান শয্যায়। পাইপ জ্বালিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। তাল তাল ধোঁয়া ভক ভক করে উঠতে উঠতে যেন স্পষ্ট বলতে লাগল—

"দূর! দূর! দূর! দূর!"

তারপর বলল বিড়-বিড় করে—"স্বয়ং শয়তান এসে বাধা দিলেও সুলৎস-এর গোপন রহস্য আমি মুঠোয় আনবই আনব। ফ্রাঙ্কভিলকেও বাঁচাবো!"

এই বলে ডক্টর সারাসিনের নাম জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল নওজোয়ান। কিন্তু কী আশ্চর্য! স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠল। সুন্দরী জানেটের মূর্তি!

৬॥ অ্যালব্রেক খনিগহ্বর

কারখানায় ম্যাক্সের পদোন্নতি ঘটছিল ধাপে ধাপে। থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাস এবং আরো ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ ফার্স্ট ক্লাসে উঠে এসেছিল তিন মাসের মধ্যেই। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত হাড়ভাঙা

খাটুনি খেটে যেত ইঞ্জিনীয়ার পরিচালিত ক্লাসে। সেখানে জ্যামিতি, বীজগণিত আর কলকব্জার নক্সা আঁকা—এই তিনটে বিষয় এত দ্রুত শিখে নিচ্ছিল যে মাস্টারমশায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তার প্রতিভা দেখে। দুমাস যেতে না যেতেই নওজোয়ান 'জোহান'কে নিয়ে সাড়া পড়ে গেল লৌহ-নগরীতে। এ রকম চতুর এবং মেধাবী শ্রমিক গোটা স্টালটাটে নেই। তিন মাস অন্তে সুপারিশ লিখলেন ইঞ্জিনীয়ার—"ছাব্বিশ বছরের জোহান প্রথম শ্রেণীর ঢালাই-শ্রমিক। ছেলেটিকে পরিচালকদের নজরে আনতে চাই। কেতাবী বিদ্যে, হাতে-কলমে দক্ষতা এবং আবিষ্কারের প্রতিভা—এই তিনদিক দিয়ে ছেলেটি আর পাঁচজন থেকে অনেক ওপরে।"

কিন্তু কর্মকর্তাদের নজরে আসতে গেলে আরো কিছু গুণাবলীর দরকার ছিল। ম্যাক্সের বরাতে তাও জুটল—মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

একদিন রোববার ম্যাক্সের বিধবা বাড়িওয়ালির একমাত্র ছেলে কার্লকে আসতে না দেখে ম্যাক্স খোঁজ নিতে গেল ওর মায়ের কাছে। তখন বেলা দশটা। অথচ তার খনি থেকে উঠে আসার কথা দুঘণ্টা আগে! মায়ের উদ্বিগ্ন অন্তর দেখে ম্যাক্স অভয় দিল তাকে। বলল, খনির নীচে গিয়ে দেখে আসবে কি করছে কার্ল।

পথে বেরিয়ে ঘরমুখো শ্রমিকদের জার্মান-ভাষায় জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স—কিন্তু কার্লের খবর দিতে পারল না কেউ।

বেলা এগারোটা নাগাদ অ্যালব্রেক খনির মুখে পৌঁছোলো ম্যাক্স। ওভারসিয়ার তখন সানডে-সাজে সেজেছে। লোকটার প্রাণে দয়ামায়া আছে। ম্যাক্সের উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করল।

বলল—"বেশ তো, নীচে গিয়ে দেখে আসা যাক।"

"গ্যালিবার্ট অ্যাপারেটাস আছে তো?" শুধোয় ম্যাক্স।

"ঠিক বলেছো। খনির তলায় কোনদিক থেকে বিপদ আসবে কে জানে," এই বলে ওভারসিয়ার আলমারী থেকে বার করল দস্তার আধার। প্যারিসের পথেঘাটে কোকো বিক্রী করে যারা, তাদের পিঠে বাঁধা আধারের মত দেখতে। আসলে খুব চাপের মধ্যে বাতাস ঠেসে রাখা হয়েছে এই সব চোঙার মধ্যে। রবারের নল বেরিয়েছে আধারের গা থেকে। নলের একপ্রান্তে লাগানো মোষের শিংয়ের মাউথপিসটা দাঁতে কামড়ে থাকতে হয়। নাক বন্ধ করতে হয় কাঠের চিমটে দিয়ে। বাতাসের ভাঁড়ার সঙ্গে নিয়ে খনি শ্রমিক এমন অঞ্চলে অভিযানে যেতে পারে যেখানে নিঃশ্বাসের বাতাস নেই।

সরঞ্জাম নিয়ে খাঁচায় চেপে বসল দুজনে। খাঁচা নামছে নীচে, ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলো গিয়ে পড়ছে পাশের দেওয়ালে।

দুঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। ইতিমধ্যে আরো তিনজন পাহারাদার যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।

শেষে বহুবছর ধরে পরিত্যক্ত একটি অঞ্চলে পৌঁছে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল, দেওয়াল হড়হড়ে হয়ে রয়েছে শ্যাওলায়। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওভারসিয়ার। শুধোলো সন্দিগ্ধ কণ্ঠে—"মাথাব্যথা করছেনা? মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাথা টিপটিপ করছে বটে!" একযোগে সায় দিল সঙ্গীরা।

"আমারও" বললে ম্যাক্স "একবার তো মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। নিশ্চয় চোক-ড্যাম্প* আছে কোথাও! দেশলাই আছে পকেটে?"

"নাও হে ছোকরা, জ্বালাও," দেশলাই এগিয়ে দিল ওভারসিয়ার।

দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি নীচু করল ম্যাক্স, মেঝের কাছাকাছি যেতেই ফুস করে নিভে গেল শিখটা।

"ঠিক ধরেছি। বাতাসের চেয়ে ভারী বলে গ্যাসটা জমে রয়েছে পায়ের কাছে। সাবধান! যাদের গ্যালিবার্ট অ্যাপারেটাস নেই, তারা সরে যাও।"

ম্যাক্স আর ওভারসিয়ার দাঁতের ফাঁকে মোষের শিংয়ের মাউথপিস চেপে নাকে ক্লিপ এঁটে এগোলো সামনে। ফিরে এল মিনিট পনেরো পরে। বাতাস নিয়ে ফের ঢুকল পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গে। তৃতীয় অভিযানে ফল পাওয়া গেল! বহুদূরে দেখা গেল একটা আবছা নীলাভ আলো। অন্ধকারের মধ্যে ইলেকট্রিক লণ্ঠন জ্বলছে!

ছুটল দুজনে। স্যাঁৎসেঁতে দেওয়ালের গায়ে পড়ে কার্ল বয়ারের দেহ ততক্ষণে হিমশীতল হয়ে গিয়েছে। নীল ঠোঁটে আর কোটরাপ্রবিষ্ট চোখ দেখে কাউকে বলতে হল না কি ঘটেছে!

নিশ্চয় হেঁট হয়ে পোকা কুড়োতে গিয়েছিল বেচারা—চোক ড্যাম্প নিমেষ মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে হরণ করেছে তার প্রাণপাখীকে!

৭॥ কেন্দ্রীয় ভবন

ঘণ্টা দশেক পরে কুলি ব্যারাকে পৌঁছে ম্যাক্স তার টোকেন নিতে গিয়ে দেখল হুকে একটা হুকুম পত্র গাঁথা রয়েছে।

---

* Choke damp অর্থাৎ Carbonic acid gas (অঙ্গারাম্ল বাষ্প)

"জোহান আজ দশটার সময়ে ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসে যেন হাজির হয়। কেন্দ্রীয় ভবন, A ফটক, A রাস্তা।"

"যাক, শেষ পর্যন্ত ডাক এসেছে!" মনে মনে ভাবল ম্যাক্স। "এই হল প্রথম ধাপ, বাকীটুকু আসবে যথাসময়ে।"

শ্রমিক বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে একটা জিনিস জেনে নিয়েছিল ম্যাক্স। রোববার হলেই লৌহ নগরীতে আড্ডা মারতে বেরোতো সে এবং সংগ্রহ করত মূল্যবান সংবাদ। কেন্দ্রীয়-ভবন জায়গা চারদিক থেকে এমনভাবে আগলে রাখা হয়েছে যে ওদিকে রোজ যাওয়ার আশা দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। অনেক রকম বিচিত্র গল্প শোনা যায় কেন্দ্রীয় ভবন সম্বন্ধে। কৌতূহলের বশে যারা দুঃসাহস দেখাতে গিয়েছিল, লুকিয়ে চুরিয়ে কেন্দ্রীয় ভবনে নাক গলাতে গিয়েছিল। বরাবরের নাকি তারা মিলিয়ে গিয়েছে ধরাধাম থেকে। ওখানে যারা কাজ করে, তাদের নাকি চাকরীতে যোগদান করার আগে অনেক কিছু শপথ করতে হয়। অঙ্গীকার করতে হয় ওখানে যা দেখবে শুনবে তা আর কাউকে বলবে না—এর অন্যথা ঘটলেই নির্দয়ভাবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় একটা গুপ্ত আদালতে। একটা পাতাল রেল আছে কেন্দ্রীয় ভবন পর্যন্ত গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ভূগর্ভপথে যায় কেন্দ্রীয়-ভবনে, সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন বসে এবং রহস্যজনক অনেক মানুষ এসে ভাষণ দেয়।

তাই অত তীব্র কৌতূহল নিয়ে কেন্দ্রীয় ভবনের দিকে এগোলো ম্যাক্স এবং অচিরে জানতে পারল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কতখানি কড়া। কোথাও কোনো ফাঁক নেই—কোনো ত্রুটি নেই।

ম্যাক্সের পথ চেয়ে বসেছিল শান্ত্রীরা। ধূসর ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক বসেছিল কুলি ব্যারাকে। তাদের কোমরের বেল্টে ঝুলছে তরবারি এবং রিভলবার।

কুলি ব্যারাকের গেট দুটো। একটা ভেতরে, একটা বাইরে। একই সময়ে কখনো খুলে রাখা হয় না দুটো গেট।

অনুমতি পত্র খুঁটিয়ে দেখে সই করার পর ইউনিফর্মধারী শান্ত্রী দুজন মস্ত রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিল ম্যাক্সের। তারপর ওর বাহু ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল মুখে একটি কথাও না বলে।

দুই থেকে তিন হাজার পা হাঁটবার পর একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ম্যাক্স। একটা দরজা খোলার শব্দ হল। পাল্লা ফের বন্ধ হয়ে যেতেই খুলে দেওয়া হল চোখের বন্ধন।

মস্ত ঘর। কয়েকটা চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড, একটা লম্বা টেবিল আর রেখাচিত্র আঁকার যাবতীয় সরঞ্জাম। উঁচু জানলার ঘষা কাঁচ ভেদ করে উজ্জল সূর্যালোক ধুইয়ে দিচ্ছে ঘরের অভ্যন্তর।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল দুজন পুরুষ। দেখে মনে হল যেন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।

একজন বলল ম্যাক্সকে—"কিসের জোরে তুমি দশজনের একজন হতে পেরেছো, আমরা তা যাচাই করব। যদি দেখি তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা সন্তোষজনক, মডেল ডিভিশনে কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রশ্নের জবাব দিতে তৈরী তো?"

সবিনয় জানালো ম্যাক্স, সব রকম পরীক্ষার জন্যেই সে প্রস্তুত।

পরীক্ষক দুজন পর্যায়ক্রমে রসায়ন শাস্ত্র, জ্যামিতি আর বীজগণিত থেকে অনেক রকম সমস্যা হাজির করল ম্যাক্সের সামনে। প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিয়ে গেল ম্যাক্স।

—"ড্রাফটসম্যান হওয়ার দিকে তোমার ঝোঁক আছে দেখছি।"—বলল একজন পরীক্ষক।

"ছোটবেলা থেকেই।"

"দুঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে এই ডিজাইনটা যদি ঠিকমত আঁকতে পারো, তাহলে মডেল ডিভিশনে কাজ পাবে।" এই বলে একটা স্টীম-ইঞ্জিনের এবং খুবই গোলমেলে ধরনের ডিজাইন বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোকরা।

একলা বসে কাগজ নিয়ে তন্ময় হল ম্যাক্স।

দুঘণ্টা পরে পরীক্ষকরা ফিরে এলেন। ডিজাইন দেখে তাক লেগে গেল। সুপারিশ লিখলেন এইভাবে—"এরকম প্রতিভার ড্রাফটসম্যান আর একজনও নেই আমাদের মধ্যে।"

শাস্ত্রী দুজন এবার ম্যাক্সকে নিয়ে গেল ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে—চোখ দুটো অবশ্য বাঁধা রইল আগের মতই।

কাগজপত্র দেখে নিয়ে বললেন ডিরেক্টর জেনারেল—"মডেল ডিভিশনে স্টুডিওতে বহাল হলে এখন থেকে। নিয়মকানুন কিন্তু খুব কড়া।"

"আমি তো জানিই না কি নিয়ম এখানকার।"

"প্রথম, যতদিন চাকরী থাকবে, ততদিন নিজের স্টুডিও ছেড়ে অন্য কোথায় যাবে না। বিশেষ অনুমতি না পেলে একদম নড়বে না। এখন থেকে তোমাকে স্টুডিওর মধ্যেই থাকতে হবে। দ্বিতীয়, মিলিটারী নিয়মানুবর্তিতার আওতায় এখন থেকে রয়েছ মনে রাখবে। শাস্তির বহর

যেমন মিলিটারী রীতি মাফিক হবে, পদোন্নতিও ঘটবে মিলিটারী কায়দায়। তৃতীয়, ডিভিশনের কোনো কথা কাউকে বলতে পারবে না, এই মর্মে শপথ করতে হবে। চতুর্থ, তোমার চিঠিপত্র সবসময়ে খুলে দেখা হবে। চিঠি লিখবে কেবল নিজের পরিবারবর্গকে এবং একমাত্র তাদের চিঠিই পৌঁছে দেওয়া হবে তোমার কাছে।"

"সংক্ষেপে, আমাকে জেলে পোরা হচ্ছে।" মনে মনে বলল ম্যাক্স। মুখে বলল—"খুব ভাল নিয়ম। আমি নিয়ম মতই চলব কথা দিচ্ছি।"

"হাত তুলে শপথ করো। আজ থেকে চার নম্বর স্টুডিওর ড্রাফটসম্যান হলে। থাকার ব্যবস্থা সেখানেই হবে, খাবার পাবে ফার্স্ট ক্লাশ ক্যান্টিনে। মালপত্র এনেছো?"

"কিজন্যে ডাকা হয়েছে জানতাম না বলে আনিনি।"

"ঠিক আছে, মালপত্র এসে যাবে'খন। ডিভিশনের বাইরে আর যেওনা।"

মনে মনে ভাবল ম্যাক্স—ভাগ্যিস সাংকেতিক হরফে খাতা বোঝাই করে'ছলাম। দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

সেই দিনই একটা মস্ত বাড়ীর চারতলায় থাকার ব্যবস্থা হল ম্যাক্সের। বাড়ীর সামনে বিরাট বাগান। প্রথমটা খুব খারাপ লাগল না। খাবার ঘরে গিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে দেখলে বেশীর ভাগই শান্তশিষ্ট, ভদ্র এবং পরিশ্রমী।

সারা শীতকাল কাজ আর পড়াশুনা নিয়ে কাটিয়ে দিল ম্যাক্স। প্রতিটি বিষয়ে তার জানার আগ্রহ, ঝটপট শিখে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সব ব্যাপারেই অসাধারণ প্রগতি দেখতে দেখতে তাকে খ্যাতিমান করে তুলল অধ্যাপক এবং সতীর্থদের মধ্যে। তার মত ধুরন্ধর ড্রাফটসম্যান লৌহনগরীতে যে আর দ্বিতীয় নেই, সে বিষয়ে কারো মনে সংশয়ের বাষ্পও রইল না। ম্যাক্সের সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে কারো দ্বিমত ছিল না বলেই কোনো কঠিন সমস্যা কাউকে বিব্রত করলেই সঙ্গে সঙ্গে তা হাজির করা হত তার সামনে সমাধানের জন্যে। কর্ম-প্রধানরাও বিন্দুমাত্র ঈর্ষান্বিত না হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎময় এই যুবকের সামনে হাজির হত জটিল হেঁয়ালী নিয়ে।

মডেল ডিভিশনে এত নাম ডাক সত্ত্বেও মনে শান্তি ছিল না ম্যাক্সের। লৌহ-নগরীর মূলরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান এখনো সে পায়নি।

ম্যাক্সের দিন কাটছে লোহার রেলিং ঘেরা চৌহদ্দির মাঝে। জায়গাটার ব্যাস তিনশ গজ। ধাতুবিদ্যার উচ্চতম বিষয়ও তার মস্তিষ্কের কাছে ছেলে খেলা হলেও কাজের বেলা সে স্টীমইঞ্জিনের ড্রইং ছাড়া অধিক প্রতিভার

স্ফুরণ দেখানোর সুযোগ পেত না। যত রকমের স্টীমইঞ্জিন হতে পারে, তার প্রতিটির ড্রইং আশ্চর্য নিখুঁতভাবে এঁকে দিত ম্যাক্স। যুদ্ধজাহাজ থেকে আরম্ভ করে ছাপাখানা পর্যন্ত, ক্ষুদে মেশিন থেকে শুরু করে পেল্লায় মেশিন পর্যন্ত, স্বল্প শক্তির মেশিন, মাঝারি শক্তির মেশিন, দানবিক শক্তির মেশিন—যাই হোকনা কেন—ম্যাক্স হাড়ভাঙা খেটে তা সুচারুভাবে এঁকে দেবে। কিন্তু তার অধিক প্রতিভা কাউকে দেখাতে পারত না। ডিভিশনের বিশেষ ধরনের কাজের সাঁড়াশির মধ্যে মস্তিষ্ক শক্তিকে ঠেসেঠুসে রাখা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না।

সেকশন A তে চারমাস রইল ম্যাক্স, কিন্তু স্টীল সিটির নক্সা সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারল না। জানার সুযোগ তো নেই, ডিভিশনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যা জানল, তা শুধু ডিভিশন সম্পর্কেই—ইস্পাতনগরীর বাকী রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। স্টালটাউন শহর নির্মিত হয়েছে অনেকটা মাকড়শার জালের প্যাটার্নে। জালের ঠিক মাঝখানে আছে বুল-টাওয়ার অর্থাৎ ষণ্ড স্তম্ভ ঠিক যেন একটা অসুর অট্টালিকা, বড়, বরব, সুবিশাল আদিম অরণ্যের মহীরুহের মত যার শীর্ষদেশ বুঝি মেঘলোকে অবস্থিত।

গুজবের মধ্যে সার সত্যটি জেনে নিয়েছে ম্যাক্স। ক্যান্টিন হলে খেতে বসে অনেককেই বলতে শুনেছে, ঊর্ণনাভের মতই রহস্য নিকেতনের ঠিক কেন্দ্রে ওৎ পেতে বসে আছেন স্বয়ং হের সুলংস। ষণ্ড-সৌধের কেন্দ্রস্থলে আছে বহুশ্রুত সেই গুপ্তকক্ষ ইস্পাত-নগরীর অধিপতির নিবাসও সেখানে। খিলান দেওয়া গুপ্তকক্ষর ভেতরে বাইরে এমন ব্যবস্থা আছে যে আগুন তার কিছুই ধ্বংস করতে পারবে না। যুদ্ধ জাহাজের মতই দুর্ভেদ্য এবং অজেয় করে গড়া হয়েছে ইস্পাত রাজার ডেরাকে। দরজাগুলো পুরু ইস্পাতের এবং এমন অদ্ভুত স্প্রিং লাগানো যে বাইরে থেকে জোর করে খুলতে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটবে, মুহুর্মুহু বন্দুক গর্জে উঠবে আততায়ীকে লক্ষ্য করে। যে কোনো আধুনিক ব্যাঙ্ক এরকম ব্যবস্থার মন্ত্রগুপ্ত আয়ত্ত করতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। সবাই জানে, হের সুলংস একটা অতি-ভয়ংকর যুদ্ধ ইঞ্জিন নির্মাণে ব্যস্ত। কল্পনাতীত শক্তিধর এই আয়ুধ সমগ্র পৃথিবীকে নতজানু হতে বাধ্য করবে জার্মানীর পদতলে।

অনেকবার ষণ্ড-সৌধে হানা দেওয়ার কথা ভেবেছিল ম্যাক্স। অনেক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নাড়া চাড়া করেছিল মনের মধ্যে। ছদ্মবেশে গোপনে চোরা গোপ্তা হানতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো ফন্দীই মনে ধরেনি। উপলব্ধি করেছে, বৃথা প্রচেষ্টা। চীনের প্রাচীরের মত দুর্লঙ্ঘ্য ঐ প্রাচীরের

পাদদেশে অনুক্ষণ মোতায়ন থাকে বিশ্বস্ত শাস্ত্রীর দল, সারারাত ঝলমলে আলোয আলোকিত থাকে প্রাচীরের প্রতিটি ইঞ্চি। সুতরাং লুকিয়ে চুরিয়ে খণ্ড-সৌধে প্রবেশ সম্ভব নয়। যদিও বা সম্ভব হয়, খণ্ড খণ্ড সত্য ছাড়া মূল সত্য জানতে পারবে কি ম্যাক্স? না। ইস্পাত নগরীর সম্পূর্ণ রহস্য তখনো নাগালের বাইরেই হয়ত থেকে যাবে।

মার্চ মাস এল। বহু শতবারের মত সেদিনও ম্যাক্স গুপ্ত শপথ আওড়াচ্ছে মনে মনে, এমন সময়ে ধূসর পরিচ্ছদ পরিহিত কর্মচারীরা এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসে।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই হুকুম দিলেন ডিরেক্টর জেনারেল—"সেরা ড্রাফটসম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছেন হের স্থলৎস, তুমি-ই যাও। আজ থেকে তুমি লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হলে।"

সফল হল এতদিনের নীরব প্রতীক্ষা। খুলে গেছে খণ্ড সৌধের দরজা! গুপ্ত রহস্যের দরজায় এসে পৌঁছেছে ম্যাক্স।

মনের খুশী মনে চেপে রাখতে পারল না ম্যাক্স।

ডিরেক্টর জেনারেল আরো বললেন—"তোমার মঙ্গল হোক, ভবিষ্যতে আরো বড় হবে, এই আশা করছি। তোমার মত প্রতিভার যোগ্য সমাদরে আমি খুশী হলাম। যাও।"

লম্বা পোর্টম্যান্টোর মধ্যে জামাকাপড় ঠেসে নিয়ে ধূসর-ব্যক্তির পেছন পেছন এত কিংবদন্তীর কেন্দ্র খণ্ড সৌধের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাক্স। এতদিন দূর থেকে দেখেছে বুরুজ চূড়ার মেঘ ছোঁওয়া শিখরদেশ, আজ দেখল তার সামনে

দেখল এক অকল্পনীয় দৃশ্য। আচম্বিতে ইউরোপীয় কলকারখানার মামুলী পরিবেশন থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঝৰব আদিম অরণ্যে আনীত হলে বুঝি এমনি দৃশ্য দেখা যায়। ঘিঞ্জি ঘাঁটি শহরের বুকে একী দেখছে ম্যাক্স?

লেখকের কল্পনায় দুর্গম অরণ্যপ্রদেশ যেভাবে স্বর্গোদ্যানের রূপ নেয়, হের স্থলৎসের সাজানো বাগিচা বুঝি তার চাইতেও নয়ন মনোহর।

বাতাস উষ্ণ—নিরক্ষ অঞ্চলের উদ্ভিদময় অঞ্চলে যেমনটি দেখা যায়। নিশ্চয় গরম বাতাসের পাইপ আছে কোথাও। নইলে এমন অত্যাশ্চর্য দৃশ্য সম্ভব হয় কি করে? কিন্তু খুঁটিয়ে দেখেও মাথার ওপর কাঁচের আচ্ছাদনের চিহ্ন দেখা গেল না। নীলাকাশ ছাড়া কোথাও কিছু নেই!

আচমকা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে পড়ল, খুব কাছেই একটা

কয়লা খনিতে প্রকৃতি স্বয়ং আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন বারো মাস। হের স্থলৎস নিশ্চয় এই পাতাল-উত্তাপকে কাজে লাগিয়েছেন। ধাতুর নল দিয়ে তাপ এনে হট-হাউস গড়ে নিয়েছেন পাকাপাকিভাবে।

সবুজ তৃণভূমি দেখে তু'চোখ ভরে গেল তরুণ অ্যালসেশিয়ানের। চমৎকৃত হল নন্দনকাননের মত অপরূপ বাগিচার আশ্চয শোভা দেখে। নাসারন্ধ্রে ভেসে এল বিস্ময়কর সুবাস। আকাশ বাতাস ম ম করছে হরেকরকম ফুলের সুগন্ধিতে। ছমাস ঘাসের একটা পাতাও না দেখার পর এ-দৃশ্য যে কতখানি আনন্দদায়ক, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

কাঁকর বিছোনো পথ মাড়িয়ে একটা ঢালু প' বেয়ে নেমে এল ওরা। তুপাশে রাজকীয় স্তম্ভশ্রেণী, পায়ের তলায় মার্বেল সোপান, পেছনে বিশাল চৌকোণা সৌধশ্রেণী।

স্তম্ভশ্রেণীর পেছনে দেখা গেল জনা সাত আট ভৃত্য টকটকে লাল পরিচ্ছদ পরে কাজ করছে। জমকালো পোশাক পরা আরও একজন কর্মচারী মস্ত টাব্জি বয়ে নিয়ে চলেছে। স্তম্ভশ্রেণীর মাঝে মাঝে সাজানো রয়েছে ব্রোঞ্জের মহামূল্য শামাদান। সোপান শ্রেণীতে পা দিল ম্যাক্স। পায়ের তলায় জমি যেন গুড়গুড়-গুমগুম করে কাঁপছে। বুঝল, পাতাল রেল চলছে।

মস্ত মিউজিয়ামের মাঝে এসে দাঁড়াল ম্যাক্স। হরেকরকম তুষ্প্রাপ্য জিনিস সাজানো প্রকাণ্ড হলঘরে। খুঁটিয়ে দেখবার সময় পেল না। পরপর কয়েকটা সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে দিয়ে যেতে হল ওকে। প্রথমটা কালো এবং সোনালী রঙ দিয়ে সাজানো, দ্বিতীয়টায় লাল আর সোনালী বর্ণের সমাবেশ, তৃতীয়টায় শুধু হলুদ আর সোনালী রঙের ছড়াছড়ি। শেষ ঘরটিতে পাঁচ মিনিট প্রতীক্ষার পর ওকে নিয়ে যাওয়া হল সবুজ আর সোনালী রঙে মোড়া একটি আশ্চর্য সুন্দর পড়বার ঘরে।

হের স্থলৎস একটা লম্বা ক্লে পাইপ মুখে দিয়ে ধূমপান করছিলেন—পাশে জগভর্তি বীয়ার। চারিদিকে রুচি সুন্দর বিলাস বৈভবের মাঝে এ দৃশ্য দেখে মনটা ধাক্কা খায়—মনে হয় চকচকে পেটেন্ট লেদারের জুতোয় যেন এক খ্যাবড়া কাদা লেগে রয়েছে।

না উঠে, মাথা না ঘুরিয়ে হিমশীতল কণ্ঠে বললেন ইস্পাত-সম্রাট—

"তুমিই সেই ড্রাফটসম্যান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার নক্সা আমি দেখেছি, ভাল। স্টীমইঞ্জিন ছাড়া আর কিছু মাথায় ঢোকেনা বুঝি?"

"আর কিছু করবার সুযোগ কোনদিন পাইনি।"

"ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?"

"কিছু কিছু। অবসর সময়ে নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পড়াশুনা করেছিলাম।"

শুনে যেন চমৎকৃত হলেন হের স্থলৎস।

এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ম্যাক্সের পানে।

"কামানের নক্সা আঁকতে পারবে তো? দেখা যাক তোমার দৌড়। হাজার খেটেও গর্দভ শোন-য়ের সমান হতে পারবে না! কাজ জানত সে, ডিনামাইট নিয়ে চ্যাংডামি করতে গিয়ে পটল তুলেছে আজ সকালে! আর একটু হলে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে মারত! উজবুক কোথাকার!"

সমবেদনার ছায়াও নেই কণ্ঠস্বরে! শুনে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল ম্যাক্সের। কিন্তু হের স্থলৎসের মুখবিবর থেকে এর বেশী কিছু প্রত্যাশাও করা যায় না।

৮॥ ড্রাগন বিবর

নওজোয়ান আলসেশিয়ানের প্রগতি-কাহিনী যাঁরা পড়ছেন, তাঁরা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন দুদিনেই ষণ্ড-সৌধের অন্তঃপুরে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসবে ম্যাক্স ব্রাকমান। ম্যাক্সের মত অসাধারণ ধীমান যুবাপুরুষ হের স্থলৎসের হৃদয় জয় করে বসবে, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এক কথায়, হরিহর আত্মা হয়ে উঠেছেন দুজনে। কাজ করেন একসঙ্গে, খান একসঙ্গে, বেড়ান একসঙ্গে। এমন কি পাইপ নিয়ে ধূমপান আর বীয়ারের বোতল নিয়ে মদ্যপান পর্যন্ত একই সঙ্গে করেন দুই মূর্তিমান। এরকম মনের মত সহকারী ইতিপূর্বে পাননি প্রফেসর। ছেলেটি অতিশয় চতুর। মুখ থেকে কথা খসার আগেই মনের কথা ধরে ফেলে। মস্তিষ্কে উদ্ভূত যে কোনো আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করে নিমেষ মধ্যে।

প্রাক্তন-অধ্যাপক তাই বড় খুশী ম্যাক্সের ওপর। দিনের মধ্যে দশবার নিজেই বলছেন নিজেকে—"সাবাস ব্রেন বটে। হীরের টুকরো ছেলে! রত্নর মত রত্ন!"

আসল ব্যাপারটা এই: ম্যাক্স অতি চৌকস ছেলে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সে তার ভয়ংকর প্রভুর ভয়ানক চরিত্রটিকে মনে মনে এঁকে নিয়েছিল। হের স্থলৎস যে আত্মদম্ভে স্ফীত এবং খোশামোদপ্রিয় তা ধরে ফেলেছিল। অহংকারে সদাই মট মট করছেন তিনি। সুতরাং তাঁর অহংকারে

সুড়সুড়ি দেওয়ার ফন্দী আঁটল ম্যাক্স। কাজটা কঠিন কিছু নয়। নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুযোগ বুঝে প্রাক্তন প্রফেসরের অহং-ভাবকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা।

ক'দিন যেতে না যেতে ওষুধ ধরল। পিয়ানোবাদক যেমন অক্লেশে যে কোন রাগিণী সৃষ্টি করতে পারে স্রেফ বীড টিপে, ম্যাক্সও তেমনি প্রফেসরের মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোষাজ-সাগরে নিমজ্জিত রাখল তাঁকে দিনের পর দিন।

কায়দাটা অতীব সহজ। মনিবের ফরমাশ মত যে কোনো কাজ নিখুঁত-ভাবে শেষ করে ইচ্ছে করে দু'একটা খুঁত রেখে দিত ম্যাক্স। এমন খুঁত যা সহজে চোখে পড়ে এবং সহজে শোধরানো যায়। হের স্থলৎস দেখেই লাফিয়ে উঠতেন। পুলকিত হতেন ভুল ধরার আনন্দে।

বছর ঘুরতে চলল, মনিবের সঙ্গে এত দহরম-মহরম সত্ত্বেও কিন্তু আসল সিক্রেটটি ম্যাক্স জানতে পারল না। স্টীল-সিটির সিক্রেটটি ভুল করেও ভাঙলেন না হের স্থলৎস ম্যাক্সের কাছে। ম্যাক্স কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল, হের স্থলৎস নিছক মুনাফার জন্যে কঠোর সাধনা করছেন না। একটা গুপ্ত লক্ষ্যের দিকে অবিচল গতিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন। নিশ্চয় একটা অতি-ভয়ংকর দানবিক যুদ্ধাস্ত্র উনি আবিষ্কার করেছেন। বুল-টার্গেটের একমাত্র গুপ্তরহস্য হল সেই মারণাস্ত্রটি, অভিনব এই আয়ুধটি।

পাঁচই সেপ্টেম্বর রাত্রে খেতে বসে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটাল ম্যাক্স।

ভেবে দেখল, সময় হয়েছে। পরিকল্পনামাফিক ঝুঁকি নেওয়ার সময় এসেছে। আর দেরী নয়।

হের স্থলৎস বলছিলেন—"সসেজ আর বীয়ার ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে ভেবে পাই না।"

"বেঁচে মরে থাকে," ধুয়ো ধরে বলল ম্যাক্স। "নরককুণ্ড থেকে টেনে তুলে জার্মানীর সঙ্গে জুড়ে দিলে উদ্ধার হয়ে যেত বিশ্ববাসী।"

"হবে। হবে। সব হবে।" দু'চোখ নাচিয়ে বললেন ইস্পাত-সম্রাট। "জাপানের লাগোয়া এক-আধটা দ্বীপ নিতে পারলেই দেখবে লম্বা লাফ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে পাক দিয়ে আসব।"

তামাকভর্তি পাইপ পৌঁছে দিয়ে গেল খানসামা। মহানন্দে পাইপ ধরিয়ে ফুক-ফুক ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন হের স্থলৎস। বিশেষ এই মুহূর্তটিকে কাজে লাগাবে বলেই নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করল ম্যাক্স।

তারপর নৈঃশব্দ্যভঙ্গ হল তার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে—"বিশ্ব-বিজয় ব্যাপারটায় কিন্তু আমার একদম আস্থা নেই!"

"বিশ্ব-বিজয়! সে আবার কী?" কি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভুলে মেরে দিয়েছিলেন হের স্থলৎস।

"জার্মানদের বিশ্ব-বিজয়।"

"জার্মানদের বিশ্ব-বিজয় তুমি বিশ্বাস করো না?"

"না।"

"তাই নাকি? তাই নাকি? ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো! জানতে পারি কি কেন এত সংশয়?"

"শেষ পর্যন্ত ফরাসী গোলন্দাজরা জার্মানদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবে বলে! আমার স্বদেশবাসী সুইশরাও জানে, ফরাসিরা যদি আগেভাগে হুঁশিয়ার হয়ে যায়, তাহলে দু'জন জার্মানকে ঠাণ্ডা করতে একজন ফরাসিই যথেষ্ট। ১৮৭০ সালে যে শিক্ষা তারা পেয়েছে, তা ভোলবার নয়। অর্থাৎ গুরুমারা বিদ্যে শিখে গুরু নিপাত করতে হয় কি করে, তা জগৎবাসীকে দেখিয়ে দেবে।"

প্রতিটি শব্দ থেমে স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করল ম্যাক্স। নিরস স্বরে, নিরুত্তাপ স্বরে ওজন দিয়ে বন্দুকের বুলেটের মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল প্রতিটি কথা। ওর ভেতরের আতীব্র ঘৃণা মূর্ত হয়ে উঠল অতীব স্পষ্ট উক্তির মধ্যে।

বিকট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিলেন হের স্থলৎস, চোখ তো নয়, যেন আগুনের জোড়া মালসা। অকস্মাৎ বিস্ময়ের তোড়ে দম আটকে এসেছিল ভদ্রলোকের। দেহের সমস্ত রক্ত ধেয়ে এসেছিল মুখে—এমন বেগে রক্তসঞ্চার ঘটছিল ভয়াল ভয়ংকর মুখের প্রতিটি অনুপরমাণুর মধ্যে যে চকিতের জন্যে শংকিত হল ম্যাক্স। অবরুদ্ধ ক্রোধে কপালের শির ছিঁড়ে অক্কা পাবেন না তো মহাপাপিষ্ঠ হের স্থলৎস? কিন্তু না, অন্তত এ যাত্রা ধাক্কা সামলে উঠলেন হের স্থলৎস।

কথার খেই তুলে নিল ম্যাক্স—"কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি। শত্রুপক্ষ চুপচাপ থাকলেও হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। আপনি কি মনে করেন গত যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা নতুন কিছু আবিষ্কার করে নি? বোকার মত আমরা কেবল আমাদের কামানের ওজন বাড়িয়েই চলেছি, আর ওরা নিশ্চয় সাংঘাতিক ধরনের নতুন কিছু বানাচ্ছে যার প্রতাপে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হবে আমাদের।"

"নতুন কিছু! সাংঘাতিক ধরনের নতুন কিছু!" কথা আটকে গেল

ভূতপূর্ব অধ্যাপকের। তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন—"ছোকরা, আমরাও বসে নেই!"

"তা ঠিক। পূর্বপুরুষরা ব্রোঞ্জ দিয়ে যা বানিয়েছেন, আমরা সেই জিনিসই বানাচ্ছি ইস্পাত দিয়ে। কামানের সাইজ আর পাল্লাকে ডবল করেই ভাবছি না জানি কি করলাম।"

"ডবল!" চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল হের স্থুলৎসের—"ডবলের চাইতেও অনেক বেশী হে ছোকরা।"

ম্যাক্স নির্দয় কণ্ঠে কিন্তু বলেই চলল—"সংক্ষেপে, আমরা তস্কর ছাড়া কিসসু নয়। পাঁচজনের কীর্তি চুরী করতে মহা ওস্তাদ আমরা। কর্কশ সত্যিটা এবার বলেই ফেলি। এই শহরেই দেখুন না, অভিনব কিছু আবিষ্কার করার মত প্রতিভার অভাব আছে আমাদের মধ্যে। মৌলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমরা অষ্টরম্ভা—এবাসিরা কিন্তু নতুন নতুন জিনিস বার করেই চলেছে এবং চলবেও।"

অনেকটা সামলে নিয়েছেন হের স্থুলৎস। অন্ততঃ বাইরে থেকে আর বোঝা যাচ্ছে না ভেতরে যেন লক্ষ ভিসুভিয়াস ফুঁসছে বাইরেও শান্ত হয়ে এলেও এখনো ঠোঁট কাঁপছে, মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে গিয়েছে। প্রথমে শক খেয়ে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। এখন মুখভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে উত্তেজনা যেন তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছে।

কি করবেন হের স্থুলৎস? আতীব্র এই অপমান মুখ বুঁজে সয়ে যাবেন দিক হতে দিগন্তে যার নামডাক, যাঁর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়—সসাগরা পৃথিবীর নৃপতিকুল এবং গণতন্ত্র প্রধানেরা পদতল লেহন করে, বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প-নগরী এবং কামান কারখানার একছত্র অধিপতি যিনি, কীটানুকীট একটা সুইশ ড্রাফটম্যান কিনা টিটকিরি দেয় তাকে। হের স্থুলৎসের আবিষ্কার প্রতিভা নেই। হের স্থুলৎস ফরাসি গোলন্দাজদের তুলনায় নিকৃষ্ট কামানবাজ। আর বলছে কোথায়? তারই আস্তানায় বসে। লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে বাঘের গুহায় বসে বাঘের সামনেই কিনা ল্যাজ নাড়ছে শেয়ালের মত! ওরে আহাম্মক! ওরে বদমাস! ওরে বালখিল্য অপোগণ্ড! হের স্থুলৎসের কীর্তি দর্শন করলে সহস্রবার ঘূর্ণিত হবে তোর মস্তিষ্ক, বাক্যহারা হবি নিমেষমধ্যে, গর্দভের মত যুক্তিজাল ভুলেও উচ্চারণ করতে সাহস করবি না! না, না, না! সহ্য করা যায় না এই স্পর্ধা!

আচমকা উঠে দাঁড়ালেন হের স্থুলৎস। এমনবেগে ছিটকে গেলেন যে

পাইপটা পড়ে গিয়ে দুটুকরো হয়ে গেল। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানলেন ম্যাক্সের প্রতি, দাঁতে দাঁত পিষে বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—

"এস হে ছোকরা! হের স্কুলৎসের মৌলিক প্রতিভা আছে কিনা দেখে যাও!"

বড় জব্বর খেলা খেলেছে ম্যাক্স। প্রাণটাকে পণ করে দান দিয়েছিল, কিন্তু জিতে গেছে। তার কড়া সমালোচনায় আগুন ধরে গিয়েছে দাম্ভিক জার্মানের অহমিকায়। রণহুংকার ছেড়েছে ইস্পাত-শার্দুল!

হের স্কুলৎস দ্রুত পদক্ষেপে গেলেন পড়াশুনার ঘরে। সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে হনহন করে গিয়ে দাঁড়ালেন বইয়ের আলমারীর সামনে। একটা তক্তা স্পর্শ করতেই বইয়ের সারির পেছনে লুকোনো একটা ফোকর দুহাট হয়ে গেল সমানে। দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা' দরজার পরেই একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে বুল-টাওয়ারের পাদদেশ পর্যন্ত।

একদম তলায় পৌঁছে পকেট থেকে ছোট্ট একটা চাবী বার করলেন ইস্পাত-সম্রাট। দেখেই বোঝা গেল, এ-চাবী কখনো কাছ ছাড়া করেন না তিনি। ওক কাঠের একটা প্রকাণ্ড দরজায় চাবী ঢুকিয়ে ঘোরাতেই দুহাট কপাটের ওপারে দেখা গেল আর একটা দরজা। প্যাডলক ঝুলছে কপাটে—ঠিক যেমনটা লোহার সিন্দুকে দেখা যায়।

এ দরজাও খুলে ফেললেন হের স্কুলৎস। চকিতের জন্যে ম্যাক্স দেখল, দরজাটা সাধারণ দরজা নয়। বিস্ফোরক কলকব্জা দিয়ে ভেতর থেকে সুরক্ষিত। কিন্তু পেশাগত কৌতূহল চরিতার্থ করার সুযোগ পেল না ম্যাক্স। হনহন করে এগিয়ে চললেন ক্রুদ্ধ হের স্কুলৎস

আর একটা দরজা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এ দরজায় তালা নেই। ছিটকিনিও নেই। হের স্কুলৎস ঈষৎ ঠেলা দিলেন পাল্লায়। বিশেষ কায়দায় বিশেষ স্থানে ঠেলতে হল অবশ্য। অমনি আপনা থেকেই খুলে গেল পাল্লাদুটো।

তৃতীয় প্রতিবন্ধক সরে যেতেই সামনে পড়ল একটা লোহার সিঁড়ি। শ দুই ধাপ উঠতেই এসে গেল ষণ্ড-সৌধের শিখর দেশ। গোটা স্টীলটাউন সিটিটাকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

ছাদের ওপর একটা কামান সাজানোর প্রকোষ্ঠ। কামানের গোলাতেও চিড় খাবে না দুর্ভেদ্য এই প্রকোষ্ঠ। কামান ছোঁড়বার জন্য অগুন্তি ছিদ্র রাখা হয়েছে প্রকোষ্ঠের প্রতিটি দেওয়ালে। মাঝে রয়েছে একটা ইস্পাতের কামান।

এতক্ষণ মুখ বুজে হাঁটছিলেন ভূতপূর্ব প্রফেসর—একটি কথাও বলেন নি। কামানের সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীর গর্জন করে শুধু বললেন—"দেখেছো ?"

ম্যাক্স জীবনে এমন কামান দেখেনি। কামান যে এতবড় হতে পারে, তা সে জানত না। ওজন কমসেকম তিন শ টন তো হবেই। মুখের ফাঁদটাই তো প্রকাণ্ড—ব্যাস পাঁচফুট। কামান বসানো রয়েছে ইস্পাতের গাড়ীতে, গাড়ীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন রয়েছে স্টীল রেল লাইনের ওপর দিয়ে। ব্যবস্থাটা এত ভালো যে একটা বাচ্চা ছেলেও অক্লেশে টেনে নিয়ে যেতে পারে যেদিকে খুশী। খাঁজ কাটা চাকার দৌলতেই তা সম্ভব অবশ্য। কামান গাড়ীর পেছনে একটা স্প্রিং। কামান দাগবার পর পেছনে যে ভয়াবহ ধাক্কা পড়ে, তাকে সামলে নেওয়ার জন্যেই এই স্প্রিং। অতিশয় জোরালো স্প্রিং। প্রতিবার গোলা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আগের অবস্থায় এসে দাঁড়াবে অদ্ভুত কামান।

তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল ম্যাক্স। সপ্রশংস কণ্ঠে শুধু শুধোলো—"ছেঁদা করার ক্ষমতা কতখানি ?"

"বিশ হাজার গজ দূর থেকে চল্লিশ ইঞ্চি পুরু স্টীল প্লেটকে পরিষ্কার এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে ছুটবে—মনে হবে ছুরি দিয়ে কেউ মাখন কাটা হল।"

"পাল্লা ?"

"পাল্লা ? শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। বলছিলে না, সেকেলে কামান বন্দুককে টেক্কা দেওয়ার মত কামান বানানোর ক্ষমতা, আবিষ্কার করার মত মগজ আমার নেই। তাই শুনে রাখো, এ কামানের পাল্লা তিরিশ মাইল।"

'আঁা! তিরিশ মাইল!"

"হ্যাঁ, তিরিশ মাইল। গোলা কিন্তু একটুও এদিক ওদিক হবে না। যেখানে টিপ করে ছুঁড়ব, হিসেব মত সেখানে গিয়ে পড়বে—তিরিশ মাইল দূর থেকেও লক্ষ্য ভেদ করবে।"

'বলেন কী! তিরিশ মাইল পাল্লার কামান! বারুদ কি দিচ্ছেন ? নিশ্চয় নতুন ধরনের বারুদ বানিয়েছেন ?'

"তা বানিয়েছি। সব বলব বলেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি," অদ্ভুত স্বরে বললেন হের সুলৎস। "আমার গুপ্ততত্ত্ব আর গুপ্ত থাকবে না তোমার কাছে। ছোকরা, বড় দানা গান পাউডারের যুগ ফুরিয়েছে। আমি কাজে লাগাই গান-কটনকে। সাধারণ বারুদের চাইতে এর ক্ষমতা চারগুণ বেশী। সে

ক্ষমতাকে আমি আরও পাঁচগুণ বাড়িয়ে নিয়েছি দশভাগের আট ভাগ হিসেবে নাইট্রেট অফ পটাশ মিশিয়ে।"

"কিন্তু ইস্পাত যত ভালোই হোক না কেন," বলল ম্যাক্স। "এরকম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বেশীক্ষণ সইতে পারবে না। তছাড়া চার পাঁচবার দাগবার পরেই দফারফা হয়ে যাবে আপনার কামানের—কোনো কাজেই আর লাগবে না।"

"একটা গোলা ছুড়তে পারলেই যথেষ্ট।"

"খরচ অনেক পড়বে।"

"দশলক্ষ মুদ্রা। কামানটার দাম তাই।'

"একটা গোলা ছোড়ার জন্যে দশলক্ষ।"

"তাতে কি এসে গেল? এক একটা গোলায় দশলাখের হাজার গুণ মানুষ তো মরবে।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল ম্যাক্স কিন্তু নিমেষ মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। মারণ মেশিনের প্রলয় ক্ষমতার বহর শুনে নিঃসীম আতংকে হিম হয়ে এসে ছল তনুমন

বলল সহজ কণ্ঠে—"কামান তৈরীর ইতিহাসে নতুন হলেও আবিষ্কার হিসেবে নতুন কিছু না। গোলাগুলির জগতে বিরাট কিছু সন্দেহ নেই। কিন্তু কামান তো আগেই ছিল। আপনি আরো একটা ভালো কামান করেছেন, তার বেশী কিছু না। একে আবিষ্কার বলে না।"

"আবিষ্কার বলে না!" ভুরু কোঁচকিয়ে বললেন হের সুলৎস। "ছোকরা তোমাকে সব বলব বলেই নিয়ে এসেছি। এসো আমার সঙ্গে।"

জলচাপে চালিত একটা লিফট-এ চেপে স্টীল সম্রাট নেমে এলেন ম্যাক্সকে নিয়ে নীচের তলায়। সেখানে সাজানো সারি সারি ক্ষেপণাস্ত্র। আকারে প্রকাণ্ড—ঠিক যেন কামান থুলে নামিয়ে রাখা হয়েছে। চোঙার মত দেখতে।

"আমার কামানের গোলা" বুঝিয়ে দিলেন হের সুলৎস।

ম্যাক্স এবার মানতে বাধ্য হল, এমন বস্তু জীবনে সে দেখেনি কামানের গোলা কি কখনো এমন হয়? অতিকায় নলের মত গোলা। লম্বায় ছফুট, ব্যাস তিনফুট। রাইফেলের কার্তুজের মত সারা গা সীসে দিয়ে মোড়া। পেছনটা স্টীল চাদর দিয়ে বন্ধ করা। সামনে লাগানো স্টীলের ছুঁচোলো টুপী। ধাক্কা লেগে যাতে বারুদ জ্বলে যায়, সে ব্যবস্থাও রয়েছে।

গোলার বৈশিষ্ট্য কি, বাইরে থেকে দেখে তা বোঝাবার জো নেই। কিন্তু

ম্যাক্সের মন বলল, এ-গোলা সাধারণ গোলা নয়। সাংঘাতিক ধরনের বিধ্বংসী কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে খোলটার মধ্যে। অতি ভয়ংকর সেই বস্তুর রুদ্রলীলা, কল্পনাতীত সংহার-মূর্তি জানেন শুধু হের স্লুলৎস।

ম্যাক্সের মুখে কথা নেই দেখে শুধোলেন স্টীল সম্রাট—"আঁচ করতে পারছো কিছু?"

"আজ্ঞে, না! কামানের গোলাকে এত লম্বা, এত ভারী করার কি দরকার ছিল? চেহারাটা বিদকুটে করা হল কেন?"

"চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। ঐ মাপের মামুলী গোলাব ওজন যা, এর ওজনও তাই—বেশী নয়। কানখাড়া করে এই বেলা শুনে নাও! আসলে একটা কাঁচের খোলস, বাইরে ওককাঠের মোড়ক। ভেতরে ঠাসা তরল কার্বন ডাই অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলের চাপের সত্তর গুণ বেশী চাপ দিয়ে বিশেষ এই গ্যাসটিকে তরল অবস্থায় ভরে রাখা হয়েছে। ওপর থেকে আছাড় খেলেই কাঁচ আর কাঠ ভেঙে যাবে, খোলস ফেটে তরল কার্বনডায় অক্সাইড বেরিয়ে আসবে গ্যাসের আকারে। বিপুল পরিমাণ কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ধেয়ে যাবে বাতাসের মধ্যে দিয়ে, শূন্য তাপাংকের একশ ডিগ্রী নীচে নেমে যাবে তাপমাত্রা। বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে তিরিশ গজের মধ্যে প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী চক্ষের পলকে জমে যাবে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পরলোকে যাবে। তিরিশ গজ কম করে বললাম, মারণ ক্ষমতা ছড়াবে আরো বহুদূর—একশ কি দুশ গজ দূর পর্যন্ত তো বটেই।

"সবচেয়ে অসাধারণ যা ঘটবে, তা হল গ্যাসের দীর্ঘস্থায়ী মানুষ মারার ক্ষমতা। এ গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী হয় বলে মাটি জড়িয়ে থাকবে দীর্ঘকাল। বিস্ফোরণের অনেক ঘণ্টা পরেও বিপজ্জনক থাকবে সারা তল্লাটটা। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে নাক গলাবে তাকেই মরতে হবে। একটা গোলা ছুঁড়ে দুরকম ফল দেখা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে লোক মারবে তো বটেই—অনেকক্ষণ ধরে আগলে রাখবে শ্মশান পুরীকে—ঘেঁষতে দেবেনা কাউকে। তাছাড়া আমার প্ল্যানমাফিক, এ গোলা জখম করবে না—স্রেফ মেরে ফেলবে। মড়া ছাড়া কিসসু আর পাওয়া যাবে না!"

আবিষ্কারের গৌরবে যেন ফুলে উঠলেন হের স্লুলৎস। আনন্দে ডগমগ হয়ে দাঁত কপাটি বার করে ফেললেন।

বললেন—"কল্পনা করো এমন একটা শহর যা অবরোধের মধ্যে রয়েছে এবং আমার আবিষ্কৃত অনেকগুলো নয়া কামান সেইদিকেই তাগ করা রয়েছে। একটা কামান দাগলেই যদি তিন বিঘে জমির সব কিছু ধ্বংস করা যায়। তাহলে

সাড়ে সাতহাজার বিঘের একটা শহরকে নিশ্চিহ্ন করতে লাগবে হাজার খানেক কামান। ধরে নাও, সব কটা কামান টিপ করা হয়েছে, আকাশ বাতাস দিব্বি পরিষ্কার, ইলেকট্রিক বোতাম টিপলেই একই সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যাবে আশ্চর্য গোলা। এক মিনিটও যাবে না, দেখবে সাড়ে সাতহাজার বিঘের মধ্যে জ্যান্ত কেউ নেই! কার্বনিকঅ্যাসিড গ্যাসের মহাসমুদ্রে ডুবে থাকবে গোটা শহরটা। আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল গত বছর। অ্যালব্রেক খনিতে একটা বাচ্চা ছেলে কার্বনডায়অক্সাইডে নাক ডুবিয়ে মারা গেছে, খবর পেলাম ডাক্তারের রিপোর্টে। নেপলসের ডগ গ্রটো দেখে আসার পর থেকেই অবশ্য প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা মরতেই বুদ্ধি খুলে গেল আমার। কার্বনডায়অক্সাইডের কৃত্রিম সমুদ্র বানাতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! গ্যাসের পাঁচ ভাগের একভাগও বাতাসে মিশে গেলে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না তার মধ্যে।"

ম্যাক্স নির্বাক হয়ে দেখছিল। বজ্রাহত হলে বুঝি মানুষ এমনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। হের স্লুলৎসের লম্ফঝম্প ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মানুষ না পিশাচ? সহসা বললেন মানুষ-পিশাচ—"একটা সমস্যার সমাধান করতে পারছি না কিছুতেই।"

"কী?"

"কামানটা যদি নিঃশব্দে ছোঁড়া যেত তাহলে চাঁদনী রাতে চুপিসারে মারতে পারতাম। কিন্তু যা আওয়াজ কামানের! সাধারণ কামানের মত এই আওয়াজটাকে যদি মেরে আনা যেত আহা! আহা! নিঃশব্দ মৃত্যু নেমে আসত শহর শুদ্ধ লোকের ওপর!"

শ্মশান দৃশ্যটা কল্পনা করে স্বপ্ন স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলেন হের স্লুলৎস। সম্বিৎ ফিরল ম্যাক্সের কথায়।

বলল—"সব তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার বর্ণনা মত হাজারটা কামান বানানোর খরচ কম নয়। সময় লাগবে বিস্তর।"

"টাকা? টাকা উপচে পড়ছে আমাদের। সময়? তা তো আছেই!"

* গ্রটোডেল ক্যানো নেপলসের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে কুকুর বা ছোট আকারের চতুষ্পদ কোনো প্রাণী দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। মানুষ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কিন্তু বেঁচে যায়, কারণ, প্রায় ফুট দুয়েকের মত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস মাটি কামড়ে থাকে আপেক্ষিক গুরুত্বের দরুন।

খাঁটি জার্মানের মতই বললেন হের স্থলৎস, প্রতিটি অক্ষরে বিচ্ছুরিত হল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়।

ম্যাক্স বললে—"যাই বলুন না কেন, কার্বনডায়অক্সাইড ঠাসা কামানের গোলা এমন কিছু নতুন আইডিয়া নয়। দম আটকে মেরে ফেলার জন্যে এর আগেও এরকম ক্ষেপণাস্ত্র বানানো হয়েছে। তবে হ্যাঁ বলতে পারেন, আপনার গোলার ধ্বংস করার ক্ষমতা অনেক বেশী। তুলনা নেই সে দিক দিয়ে। খুঁত অবশ্য আছে।"

"খুঁত?"

"গোলার চেহারা যা দেখছি, তিরিশ মাইল গেলে হয়।"

"এ-গোলা বানানো হয়েছে শুধু ছ মাইল যাওয়ার জন্যে," হাসতে হাসতে বললেন হের স্থলৎস। "এদিকে এসো। এই দ্যাখো। এটা কিন্তু শেলের গোলা। তিরিশ মাইল উড়ে যাবে অনায়াসে। এর ভেতরে কি আছে জানো? একশটা ছোট ছোট কামান। টেলিস্কোপের মত একটার সঙ্গে আর একটা ঢোকানো আছে। শূন্য পথে লক্ষ্যবস্তুতে নামবার আগে গোলার একশটা কামান আকাশ থেকে ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করতে থাকবে। আগুন বোমা ছড়িয়ে পড়বে শহরময়। উড়ন্ত কামানের আগুন গোলায় দাবানল জ্বলে উঠবে গোটা শহরে—ঘরে ঘরে পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়বে মৃত্যু। বেশী দেরী নেই, শীগগিরই রিহার্সাল দেব উড়ন্ত কামানের আমার আবিষ্কারে তিলমাত্র অবিশ্বাস যদি কারো থাকে, শহরে দেখে আসতে পারে পাইকারী হারে মৃত্যুর দৃশ্য। ... মড়া সরানো ... লাগাতে পারে।'

বিকট হাসি হাসলেন স্থলৎস। মাড়িশুদ্ধ বত্রিশটা হাড়ের চক্ষু ঝকমক করে উঠল মুখবিবরে। ম্যাক্সের অদম্য বাসনা হল প্রচণ্ড ঘুসি মেরে সব কটা দাঁত গলার মধ্যে চালান করে দেওয়ার।

মানুষ পিশাচ হৃষ্টস্বরে বললেন—"কি বললাম শুনেছো তো? শীগগিরই মহড়া হবে আজব ক্ষেপণাস্ত্রের।"

"কিভাবে? কোথায়? কখন?" গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স।

"কিভাবে আবার, একটা গোলা ছিটকে যাবে কামানের মধ্যে থেকে। কাসকেড পাহাড় টপকে যাবে। কোথায় পড়বে? কেন, পাহাড়ের ওদিকে যে একটা শহর রয়েছে। এখান থেকে ঠিক তিরিশ মাইল দূরে। নরক গুলজার করে তুলব একটি মাত্র গোলায়। কখন? আজকে কত তারিখ? পাঁচই সেপ্টেম্বর। তেরোই

সেপ্টেম্বর রাত পৌনে বারোটায় আমেরিকার মাটি থেকে অদৃশ্য হয়ে হয়ে যাবে ফ্রাঙ্কভিল শহরে!"

রক্ত হিম হয়ে এল ম্যাক্সের ধমনীতে। কপাল ভালো তার, হের স্বলৎস তখন ধ্বংস-দূতের প্রশস্তি নিয়ে তন্ময়—ম্যাক্সের পাংশু মুখ নজরেও পড়ল না।

অনেকটা সহজ গলায় বললেন প্রফেসর—"এখন বুঝেছো তো ছোকরা, ফ্রাঙ্কভিল শহরে ডক্টর সারাসিন যে পথে চলেছেন, আমরা চলেছি ঠিক তার উল্টো পথে। ওরা চায় জীবনটাকে টেনে লম্বা করতে, আমরা চাই ছেঁটে ছোট করতে। সৌভাগ্যক্রমে, আমার এক্সপেরিমেন্টের সুবিধে করার জন্যেই ফ্রাঙ্কভিল শহরটাকে গড়ে তোলা হয়েছে আমার আওতার মধ্যেই। আহা! খাসা মহড়া হবে নিরালা শহরটার ওপর! অশেষ ধন্যবাদ ডক্টর সারাসিনকে!"

নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিল না ম্যাক্স।

"কিন্তু," মুখ খুলল ম্যাক্স এবং সমস্ত সংযমকে ধূলিসাৎ করে কেঁপে গেল তার গলা, স্টীল-সম্রাট চকিতে চাইলেন তার মুখপানে। ম্যাক্স বলল কাঁপা-গলায়—"ফ্রাঙ্কভিলের বাসিন্দারা তো আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। আমি বেশ জানি, ওদের কারো সঙ্গে আপনার কোনো ঝগড়াও হয় নি।"

"ছোকরা," বললেন হের স্বলৎস, "ন্যায়-অন্যায়—পাপ-পুণ্য—ভাল-মন্দ—এ সবই হল ফাঁকা বুলি। সবার ওপরে জেনো একটা নিয়ম রয়েছে—এ নিয়ম বাঁচার নিয়ম। উল্টো দিকে যাওয়া মূর্খতা। নিয়মের বশবর্তী হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ঠিক করেছি ডক্টর সারাসিনের সাধের স্বপ্নকে মিলিয়ে দেব, ফ্রাঙ্কভিল শহরকে ধুলো করে ছাড়ব, আমার পঞ্চাশ হাজার জার্মান নিভিয়ে দেবে ওখানকার এক লক্ষ স্বপ্নবিলাসীর প্রাণপ্রদীপ। ওরা শহর সাজিয়ে বসে আছে নিমেষমধ্যে মরবার জন্যে এবং আমিই ওদের মারব—এই হল ওদের বিধিলিপি।"

তর্ক নিষ্ফল জেনে চুপ করে রইল ম্যাক্স।

শেল-চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। সিক্রেট কক্ষর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল খাবার ঘরে।

প্রশান্ত চিত্তে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিমায় বীয়ারের আধার মুখের কাছে তুলে ধরলেন প্রফেসর। ঘন্টা বাজিয়ে ভাঙা পাইপের বদলে আর একটা তামাক পাইপ চাইলে এবং চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন—

"আর্মিনিয়াস আর সিগিমার আছে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ডাকলেই যেন সাড়া পাওয়া যায়।"

চাকর চৌকাঠ পেরিয়ে যেতেই ইস্পাত-সম্রাট সটান চাইলেন ম্যাক্সের পানে। নিস্পলক চাহনি। ইস্পাতের মত কঠোর। নির্মম। নিষ্করুণ।

পলকহীন কঠোরতার সামনে এতটুকুও কুঁকড়ে গেল না ম্যাক্স—এমন কি চোখের পাতাও কাঁপালো না। পাল্টা চাহনি দিয়ে গেঁথে রাখল স্টীল-সম্রাটকে।

শুধোলো প্রশান্ত কণ্ঠে—"আপনি যা বললেন, সত্যিই কি তা করবেন?"

"হ্যাঁ। ফ্রাঙ্কভিল শহরের দ্রাঘিমা লঘিমা আমার মুখস্ত। তেরোই সেপ্টেম্বর পৌনে বারোটার সময়ে শহর মুছে যাবে ম্যাপ থেকে।"

"প্ল্যানটা গোপন রাখলেই কিন্তু ভাল করতেন।"

"মাই-ডিয়ার, দেখছি যুক্তি জিনিসটা তোমার মাথায় তেমন ঢোকে না। সেইজন্যেই তো কষ্ট হচ্ছে এত অল্প বয়সে তোমাব মৃত্যু দেখতে হবে বলে।"

চমকে উঠল ম্যাক্স।

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় বললেন হের স্থলৎস—"তোমার মাথায় কি এটুকুও ঢোকে নি? যে গুপ্ততত্ত্ব যার কাছে আমি ফাঁস করি—জন্মের মত তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থাটাও আমিই করি?"

ঘণ্টা বেজে উঠল। চৌকাঠে আবির্ভূত হল দুই দানব—আর্মিনিয়াস আর সিগিমার।

"আমার সিক্রেট জানতে চেয়েছিলে," বললেন প্রফেসর—"সিক্রেট জেনেছো। মৃত্যু ছাড়া তাই আর কোনো পথ খোলা নেই তোমার সামনে!"

জবাব দিল না ম্যাক্স।

হের স্থলৎস ফের বললেন—"তুমি বড্ড বেশী বুদ্ধিমান। আমার কাড়ির খবর জানবার পর তাই তো তোমায় আর বাঁচিয়ে রাখতে পারি না যদিও বলব তোমার ব্রেন অতি দুর্লভ। এ রকম আশ্চর্য মগজ গঠন লাখে একটা মেলে না। তোমার আগে এখানে যে ছিল ডিনামাইট ফেটে মরেনি—আমার গোপন অভিসন্ধি জেনে ফেলেছিল বলে সরে যেতে হয়েছিল। নিয়ম যা ছিল, তাই আছে। তোমার বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।"

অনিমেষে প্রফেসরকে দেখছিল ম্যাক্স। গলার স্বর, গোঁয়ারের মত টাক মাথা ঈষৎ কাৎ করে থাকা এবং চোখের নির্বিকার চাহনি থেকে হাড়ে হাড়ে বুঝল—এই শেষ। রেহাই আর নেই। প্রতিবাদ নিষ্ফল।

তাই শুধু শুধোলো—"কখন এবং কি ভাবে মরতে হবে?"

"অত ছটফট করো না হে," হৃষ্টকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। "মরবে ঠিকই, তবে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে। একদিন ভোরবেলা ঘুম আর ভাঙবে না। ব্যস।"

ইস্পাত-সম্রাটের অঙ্গুলি হেলনে ম্যাক্সকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল দুই অসুরাকৃতি পাহারাদার। একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আগলে রইল দরজা।

এই প্রথম ভেঙে পড়ল ম্যাক্স। মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা। ডক্টর, তাঁর সঙ্গীসাথী এবং অন্যান্য প্রিয়জনদের চেহারা মনের মধ্যে ভেসে উঠতেই থর-থর করে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ।

নিজের মৃত্যুর জন্যে সে ভীত নয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কভিল শহরকে আসন্ন প্রলয় থেকে বাঁচানো যায় কি করে, এই চিন্তায় উন্মাদ হবার উপক্রম হল ম্যাক্স।

৯॥ পালাও! পালাও!

সারারাত নানা কথা ভাবতে ভাবতে ভোরবেলা পাল্লা ঠেলেছিল ম্যাক্স। চমকে উঠল পাল্লা দুহাট হয়ে যেতে। সামনেই বাগান।

বাগানে পা দিল ম্যাক্স। দেখল, নামেই সে বাগানের মধ্যে স্বাধীন। যেখানে যাচ্ছে, ছায়াদানবের মত পেছন পেছন আসছে দুই অসুর। নাম দুটোও তেমনি। শুধু ঐতিহাসিক নয়, প্রাগৈতিহাসিক। এ রকম অসুরের নাম আদ্দিকালেই মানায়, এ কালে অচল! কেন্দ্রীয় ভবনে ধূসর ইউনিফর্মধারী দুই অসুরের কাজটা কী, এ নিয়ে আগে অনেক ভেবেছে ম্যাক্স। এখন বুঝল ওরা আসলে জল্লাদ। প্রফেসরের দেহরক্ষী না কচু! চেহারাও তো তেমনি। ষাঁড়ের মত গর্দান, হারকিউলিয়াসের মত ডেলা ডেলা মাংসপেশী, কাল রঙের প্যাঁচা মুখে ঝাঁটার মত গোঁফ আর ঝোপের মত গালপাট্টা। হের সুলৎস কাউকে ধরাধাম থেকে সরানো মনস্থ করলে এই জল্লাদ দুজন নিধন পর্বটি সম্পন্ন করে তাঁর হয়ে।

সারারাত দোরগোড়ায় শুয়ে থাকত দৈত্য দুজন। বাগানে বেরোলে পায়ে পায়ে ঘুরত। কোমরের রক্তলোলুপ ছুরিকা আর কার্তুজভরা রিভলবার দেখে বোকামি করার কথা কল্পনাও করত না ম্যাক্স।

সব চাইতে বড় কথা হল, দুটো দৈত্যই স্রেফ বোবা! কথা বলার ক্ষমতা নেই!

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। তাই মধুর হেসে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়ে ঠকেছে ম্যাক্স। জলন্ত চোখে কেবল চেয়ে থেকেছে দুই অসুর—জবাব পায়নি। বীয়ার খাইয়ে বশ করতে চেয়েছে—কিন্তু মুখ চুন হয়েছে—কটমট করে কেবল চেয়ে থেকেছে দৈত্যযুগল—মদ্য স্পর্শ করেনি। একটানা পনেরো ঘণ্টা দুই মূর্তিমানকে নজরে রাখার পর ম্যাক্স ওদের একটা দুর্বলতা আবিষ্কার

করল। দুই ষণ্ডার তামাক-পাইপ খাওয়ার বেশ নেশা আছে। তামাক ছাড়া আর কোনো দুর্বলতা নেই। পেছন পেছন লেগে থাকলেও তামাক খেতে কখনো ভুল করেনি। ম্যাক্স ঠিক করল ছোট্ট এই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগাতে হবে। কিভাবে তা ভেবে পেল না। কিন্তু দিনরাত ভাবতে লাগল কিভাবে কব্জায় আনা যায় দুই বিটকেলকে।

পরের দিন সকালবেলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আচম্বিতে ঝোপের মধ্যে একটা অদ্ভুত গাছ চোখে পড়ল ম্যাক্সের। গাছটা আকারে ছোট, ম্যাড়মেড়ে চেহারা, ওষুধ জাতীয় গাছগাছড়া বলেই মনে হল। পাতাগুলোও কোনোটা ডিমের মত, কোনোটা ছুঁচোলো। ফুলগুলো ঘণ্টার মত, একটা মাত্র পাপড়ি।

উদ্ভিদবিদ্যা মোটামুটি জানা ছিল ম্যাক্সের। সখের বিদ্যে। কিন্তু স্বল্প বিদ্যে নিয়েও সে আঁচ করল, চারাগাছটা মাদক-শ্রেণীর।

দেখাই যাক না ঝুঁকি নিয়ে। পাতা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মুখে ফেলে চুষতে লাগল ম্যাক্স। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল, তার ভুল হয় নি। কেননা, গা হাত পা কেমন জানি ভারী হয়ে এল। সেই সঙ্গে ইচ্ছে হল বমি করার। ম্যাক্স বুঝল, সব চাইতে সক্রিয় মাদক বেলেডোনার হদিশ পেয়েছে সে। প্রকৃতি স্বয়ং বেলেডোনার ল্যাবোরেটরী সাজিয়ে রেখেছেন তার হাতের কাছেই।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কৃত্রিম হ্রদের তীরে এসে পৌঁছোলো ম্যাক্স। বাগানের দক্ষিণপ্রান্ত ছুঁয়ে রয়েছে লেকটা। তারপর জলপ্রপাতের আকারে সরোবরের জল ঝরে পড়ছে—নদী হয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে বাগানের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু জলের ধারা শেষ হয়েছে কোথায়? এগিয়ে চলল ম্যাক্স। দেখল, বাগান যেখানে শেষ হয়েছে, স্রোতস্বিনীও সেখানে ফুরিয়েছে।

অর্থাৎ, জলের ধারা বাইরে যাচ্ছে পাতাল পথের কোন রন্ধ্রপথে।

পাওয়া গিয়েছে। বাইরে যাওয়ার অদৃশ্য পথ পাওয়া গিয়েছে। গাড়ী যাওয়ার মত পথ যদিও নয়, কিন্তু পথ তো।

হুঁশিয়ার মনটা অমনি বলে উঠল—"পাতাল প্রণালীর মুখ যদি লোহার জালতি দিয়ে বন্ধ থাকে?"

বেপরোয়া মনটা মুখিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"ঝুঁকি না নিলে কি কিস্তি মাৎ হয়? উকো থাকতে অত চিন্তা কিসের? ভালো ভালো উকো রয়েছে তো ল্যাবোরেটরীতে!"

দু'মিনিটের মধ্যেই মতলব ঠিক করে ফেলল ম্যাক্স। বিপজ্জনক একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে তার। হয় মরবে, নয় বাঁচবে!

গদাইলস্কর চালে বাগানের সেই বিশেষ ঝোপটির সামনে ফিরে এল ম্যাক্স। লাল ফুল ঝুলছে নার্কোটিক উদ্ভিদের বোটা থেকে। দুই অসুর-প্রহরীকে দেখিয়ে দেখিয়ে দুটো তিনটে পাতা ছিঁড়ে নিল সে।

হেলতে-দুলতে ফিরে এল ঘরে। খোলাখুলিভাবে পাতাগুলো শুকিয়ে নিল আগুনের আঁচে। তারপর হাতের তেলোয় রেখে গুঁড়িয়ে নিয়ে মিশোলো তামাক-চূর্ণের সাথে। রাখল পকেটে।

সমস্ত দৃশ্যটা কটমট করে দেখল দুই দৈত্য।

গেল আরো ছটা দিন। এক একটা রাত ভোর হয়, আর ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে যায় ম্যাক্স পরমায়ুটা আরো একটা দিন বাড়ল দেখে।

পরমায়ু বাড়ছে দেখে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল না ম্যাক্স। প্রতিটি দিনকে কাজে লাগল খুঁজে পথ পরিষ্কার করতে। বেলেডোনা চূর্ণ মিশোনো তামাক কিন্তু ভুল করেও কোনোদিন নিজে খেল না। পকেটে রাখল তামাকের দুটো প্যাকেট। একটাতে বিশুদ্ধ তামাক—আর একটাতে বেলেডোনা মিশোনো তামাক। প্রথমটা নিজের জন্যে, দ্বিতীয়টা দুই দৈত্যকে দেখানোর জন্যে। দিনের পর দিন তিল তিল করে আর্মিনিয়াস আর সিগিমারের কৌতূহল বাড়িয়ে চলল ম্যাক্স। ওদের চোখের সামনেই রোজ পাতা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে তামাক মেশায়। বারবার দেখে দেখে ক'দিন দেখার পর অনুকরণের ইচ্ছে জাগে ওদের মধ্যে। নিজেরাই পাতা গুঁড়িয়ে তামাকে মিশিয়ে পাইপ সেবন করে।...

এবং ম্যাক্সের মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দেয়।

মতলব ব্যর্থ হল না। ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে।

তেরোই সেপ্টেম্বরের ঠিক আগের দিন পেছনে তাকিয়ে ম্যাক্স দেখল রক্ষী দুজন সবুজ পাতা সংগ্রহে ব্যস্ত।

একঘণ্টা পরে দেখা গেল, পাতাগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হাতের থাবায় রেখে গুঁড়োনো হল, তামাক চূর্ণের সঙ্গে মেশানো হল এবং ধূমপানের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল। নেশাখোরদের আনন্দ তখন দেখে কে! দেখা গেল, দুজনেই ঠোঁট চাটছে লোভের তাড়নায়।

রক্ষী দুজনকে কেবল অজ্ঞান করাই তো ম্যাক্সের উদ্দেশ্য নয়। এতগুলো বাধা পেরিয়ে তাকে চম্পট দিতে হবে অবরোধের বাইরে। প্ল্যান তার মনেই আছে। পনেরো আনা সম্ভাবনা রয়েছে পলায়ন পথেই নিশ্চিহ্ন হওয়ার। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড যার মাথায় ঝুলছে, তার প্রাণে আবার ভয় কিসের?

সন্ধ্যে হল। খেয়ে নিয়ে বেরুলো ম্যাক্স। পেছন পেছন দুই রক্ষী।

দ্বিধা করল না ম্যাক্স। একটা মিনিটও নষ্ট করল না। মডেলের কারখানার দিকে হন হন করে গিয়ে বসল একটা বেঞ্চিতে। তামাক বার করে ঠাসল পাইপে, ধরিয়ে নিয়ে শুরু হল ধূমপান।

আর্মিনিয়াস আর সিগিমারের পাইপ ঠাসা ছিল আগে থেকেই। ওরাও বসল কাছের বেঞ্চিতে এবং ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পরমানন্দে।

বেশী দেরী হল না। শুরু হয়ে গেল মাদক-উদ্ভিদের বিষক্রিয়া।

পুরো পাঁচটা মিনিটও গেল না, বিরাট বিরাট হাই তুলতে লাগল ভীষণাকৃতি দুই অসুর। দেখতে দেখতে ঘোলাটে হয়ে এল চোখ, কানের মধ্যে শোনা গেল যেন দামামাধ্বনি, চামড়ার রঙ শুদ্ধ পাল্টে গেল—ছিল টকটকে লাল, হল কালচে লাল। শিথিলভাবে হাত ঝুলে পড়ল দুপাশে, মাথা নেমে এল বুকের ওপর।

সশব্দে পাইপ খসে পড়ল মেঝেতে।

শুরু হল নাসিকা গর্জন।

সময় হয়েছে। প্ল্যান অনুযায়ী চম্পট-নাটিকা শুরুর সময় এসেছে। প্রশংসনীয় তার সহ্যশক্তি! আশ্চর্য ধৈর্য! পরের রাতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে ফ্রাঙ্কভিল···রাত পৌনে বারোটায় মৃত্যুদূতকে প্রেরণ করছেন মহা শয়তান হের স্থলৎস।

ঝড়ের বেগে কারখানায় গিয়ে ঢুকল ম্যাক্স। কারখানা বটে, মিউজিয়ামও বটে। সারা বাড়ীতে সাজানো হরেক রকম মডেলের নমুনা।

প্রথমেই যন্ত্রপাতির র‍্যাক থেকে একটা ইস্পাতের ক্ষুদে করাত নিয়ে পকেটে পুরল ম্যাক্স। লোহা কাটতে জুড়ি নেই এ ধরনের উকো-করাতের।

এরপর পকেট থেকে বেরোলো দেশলাই। বেশ কিছু পলকা কাঠের মডেল আর ডিজাইনের কাগজ জড়ো করল একজায়গায়। আগুন ধরিয়ে দিল স্তূপে। তাতেও ক্ষান্ত হল না। জলন্ত কাঠ দিয়ে আরো কয়েক জায়গায় অগুন ধরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

দাহ্যপদার্থে ঠাসা মিউজিয়ামে লাফ দিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। লেলিহান শিখা আর ধোঁয়া দেখতে দেখতে গ্রাস করল গোটা বাড়ীটাকে। বেজে উঠল বিপদ জ্ঞাপক ঘণ্টা, ইলেকট্রিক তার বাহিত হয়ে অগ্নিসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা স্টালটাট শহরে। ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে এল দমকল বাহিনী চতুর্দিক থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাঙ্গপাঙ্গদের মদৎ দিতেই যেন আবির্ভূত হলেন নররূপী শয়তান—হের স্থলৎস।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বয়লারের চাপে এবং শক্তিশালী পাম্পের ঠেলায় দারুণ তোড়ে অনেকগুলো জলের ধারা গিয়ে পড়ল আগুনের ওপর। জলের ছোঁয়ায় আগুন যেন আরও রুদ্ররূপ ধারণ করল। করাল মূর্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেওয়ালে, ছাদে, সর্বত্র। ভয়ংকর সেই অগ্নিকাণ্ড দেখে বেশ বোঝা গেল, মডেল মিউজিয়াম ভস্মস্তূপে পরিণত হবেই।

হের স্থলৎস নিজেও তা বুঝলেন। তাই অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন হেঁড়ে গলায়—

"দশ হাজার ডলার দেব! ৩১৭৫ নম্বর মডেলকে যে তুলে আনবে, দশহাজার ডলার সে পাবে। ঘরের মাঝখানে কাঁচের কেসে ঢাকা ৩১৭৫ নম্বর মডেল! কে যাবে?"

হের স্থলৎসের বিখ্যাত কামানের মডেল এটি। মিউজিয়ামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মডেল। সব যাক, কিন্তু ঐটি তাঁর চাই।

কিন্তু কাঁচের আধারের কাছে যাবে কে? কড়িকাঠ ভেঙে পড়ছে, ঘন কালো ধোঁয়ায় এক হাত দূরেও চোখ চলছে না, পটপট শব্দে লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ ছিটকে যাচ্ছে, আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। নিঃশ্বেস নেওয়াই তো দুষ্কর। প্রাণের মায়া আছে প্রত্যেকেরই। তাই হের স্থলৎসের অতীব লোভনীয় পুরস্কারের লোভেও লালায়িত হল না কেউ।

কিন্তু প্রাণের মায়া ছিল না শুধু এক জনের। সহসা সে আগুন-ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে জ্যামুক্ত তীরের মত ছুটে এল হের স্থলৎসের সামনে।

সে ম্যাক্স!

বলল—"আমি যাব।"

"তুমি!" হের স্থলৎস তো হতবাক।

"হ্যাঁ, আমি!"

তৎক্ষণাৎ এসে গেল কয়েকটা গ্যালিবার্ট অ্যাপারেটাস। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হলে এ-যন্ত্র কাজ দেয় খুবই। একবছর আগে এমনি একটা যন্ত্রর সাহায্য নিয়ে অ্যালব্রেক খনি থেকে বালক কার্লের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল ম্যাক্স। যন্ত্রের ব্যবহার সে জানে। তাই চক্ষের নিমেষে নাকে কাঠের চিমটে লাগিয়ে, বাতাস ভর্তি আধার পিঠে বেঁধে, দাঁত দিয়ে বায়ু-নল কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধোঁয়ার মধ্যে।

ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মনে মনে বললে—"পনেরো মিনিট! ঠিক

পনেরো মিনিটের মধ্যে যা কিছু করবার করতে হবে। পনেরো মিনিট পর্যন্ত বাতাস থাকবে আধারে! ঈশ্বর সদয় হোন!"

না বললেও চলে যে, মডেল তুলে আনার জন্যে কোনো মাথাব্যথাই ছিল না ম্যাক্সের। এটা তার একটা অছিলা। তার প্রাণ ঝুলছে সরু সুতোর ওপর, বিপদ লক্ষ মুখ নিয়ে গ্রাস করতে চলেছে চতুর্দিক থেকে, ধোঁয়া ভর্তি হলঘরের মধ্যে দিয়ে অকুতোভয় ম্যাক্স ছুটে চলেছে অন্য প্রান্ত লক্ষ্য করে। আশেপাশে দুমদাম শব্দে পড়ছে জ্বলন্ত কড়িকাঠ, ছাদ। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় অগ্নিবৃষ্টির মধ্যেও অক্ষত অবস্থায় ছুটছে সে। সব শেষে গোটা ছাদটাই কর্ণ-বধিরকারী শব্দে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে—ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে ছিটকে মুক্ত অঙ্গনে গিয়ে পড়ল ম্যাক্স।

বাড়ীর বাইরে এসেই তীরের মত ধেয়ে গেল স্রোতস্বিনীর পাড়ে। তীরভূমি ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে পৌছোলো বাগানের শেষ প্রান্তে—জলধারার শেষও এই খানে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এতগুলি কাজ শেষ করল সে। এবার আসল কাজ। জলে ঝাঁপ দিল ম্যাক্স। স্রোতের প্রবল টানে আপনা হতেই ভেসে গেল সাত আট ফুট নীচে জলের মধ্যে। সাঁতরানোর কোনো দরকারই হল না।

সামনেই একটা সঙ্কীর্ণ প্রণালী। একটা পাইপ। নদীর জলে ভরাট।

"প্রাণ নির্ভর করছে পাইপটা কতখানি লম্বা, তার ওপর! পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি পাইপ পেরোতে না পারি, বাতাস ফুরোবে, মারা পড়ব।" মনে মনে বলল ম্যাক্স।

চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কিন্তু ঘাবড়ে গেল না ম্যাক্স, মাথা ঠাণ্ডা রাখল, অটুট রাখল উপস্থিত বুদ্ধি এবং মনোবলকে। দশ মিনিট গেল। হু-হু করে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ম্যাক্স। আচম্বিতে আছড়ে পড়ল একটা কঠিন বাধায়।

জল বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে আটকে গিয়েছে!

লোহার শিক দিয়ে বন্ধ করা পাইপের মুখ। কব্জার ওপর বসানো গরাদওলা সুবিশাল পাল্লা!

কিন্তু ভেঙে পড়ল না ম্যাক্স।

একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করল না। পকেট থেকে ক্ষুদে করাত বার করে ঘষতে লাগল পাল্লার মূল ছিটকিনির ওপর।

পাঁচ মিনিট চেপে চেপে করাত ঘষার পরেও অনড় রয়ে গেল গরাদ-পাল্লা। ম্যাক্সের শ্বাসকষ্ট সুরু হয়ে গিয়েছে। কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করছে।

রগদুটো দপদপ করছে রক্তোচ্ছ্বাসে। বেশ বুঝছে, অজ্ঞান হতে আর বেশী দেরী নেই।

আধারে যে-টুকু বাতাস অবশিষ্ট আছে, তার শেষ কণা টুকুকেও কাজে লাগানো মনস্থ করল ম্যাক্স। আস্তে আস্তে নিঃশ্বেস নিয়ে দমবন্ধ করে রাখল—বাতাস যাতে বাজে খরচ না হয়।

ছিটকিনিটা অর্ধেক কেটেছে, অথচ গরাদ-পাল্লা কিছুতেই নড়ছে না।

আচম্বিতে হাত ফসকে পড়ে গেল করাতটা!

"হা ঈশ্বর! তুমিও কি আমার বিপক্ষে? না, কখনোই না!"

দুহাতে গরাদ ধরে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড নাড়া দিল পাল্লায়। আত্মরক্ষার তাগিদে দেহের অনুপরমাণু থেকেও শেষ শক্তিবিন্দুকে এনে জড়ো করল অবশ দুই হাতে।

ঝাঁকুনি দিতে খুলে গেল গরাদ পাল্লা। ছিটকিনি ভেঙে গেছে। স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ডানপিটে শিরোমণি সর্বাঙ্গ শিথিল। মাঝে মাঝে নড়ছে হাত আর পা। ফুসফুস ভরে টেনে নিচ্ছে আধারে অবশিষ্ট শেষ বাতাসটুকু।

* * *

পরের দিন হের স্থলৎসের লোকজন অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলল। কিন্তু পোড়া কাঠ আর ছাইয়ের তলায় ডাকাবুকো অ্যালসেশিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। অর্থাৎ পুড়ে একদম ছাই হয়ে ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ছোকরা।

কেউ কিন্তু অবাক হল না। ম্যাক্সকে যাঁরা চিনত, তারা শুধু বললে, "এত সাহস ওকেই মানায়।"

মূল্যবান মডেলটি ধ্বংস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মডেল রহস্য যে জানত, গুপ্ত তত্ত্ব সহ সে-ও পরপারে রওনা হয়েছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হল ইস্পাত-সম্রাট।

১০ ॥ জার্মান পত্রিকার সেই নিবন্ধটি

এই ঘটনার একমাস আগে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল জার্মান সাময়িক পত্রিকা 'এই শতাব্দী'তে। প্রবন্ধটা ফ্রাঙ্কভিল শহরকে নিয়ে।

"প্রশান্ত মহাসাগরের নয়নমনোহর উপকূলে চমকপ্রদ এই শহরটা যেন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জাদু মন্ত্র বলে। আজব এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা নাকি জনৈক ফরাসি। অসম্ভব কিছু নয় যদিও।

কেননা, একথাও শোনা যায়, ফরাসি ভদ্রলোকটি নাকি আমাদের স্বনামধন্য ইস্পাত-সম্রাটের দূর সম্পর্কের কুটুম্ব। জার্মান রক্ত গায়ে থাকলে অসাধ্য সাধন করবেন, এ আর আশ্চর্য কী! পৃথিবীতে যেখানে নতুন কিছু হয়েছে, তার মূলে থেকেছে জার্মানরা। জার্মান বীজ না থাকলে অসাধারণ ফল লাভ সম্ভব কী?

"শহরটির স্থান মাহাত্ম্য উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র ধুইয়ে দিচ্ছে পাদ দেশ, উত্তর, দক্ষিণ, পূবদিকের হাওয়াকে রুখে দিচ্ছে পর্বতমালা—'প্রশান্ত' সমীরণ দিবানিশি ঝিরঝিরে স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে শহরেব সর্বত্র, ছোট একটা নদী মিশেছে সাগরে; বহুবার বহু জল প্রপাতের আকারে উঁচু থেকে নীচুতে সগর্জনে আছড়ে পড়ার দরুন জলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী বললেও চলে, জল অতিশয় টলটলে, নির্মল এবং সুপেয়। আর আছে একটা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়, সমুদ্রের দামাল ঢেউ সেখানে প্রশান্ত ছন্দে বয়ে যায়।

"আরো অনেক সুবিধে আছে জায়গাটার। মার্বেল পাথরের স্তূপ কেওলিনের স্তর, এবং আরো অনেক মূল্যবান ধাতুর খনি রয়েছে হাতের কাছে।

"১৮৭২ সালের জানুয়ারী মাসে জমি জরিপ, নক্সা, মাপজোপ এব আনুসঙ্গিক কাজকর্ম সাঙ্গ হল। তৎক্ষণাৎ শুরু হল কুলিদের কাজ। পাঁচশ ওভারসিয়ার আর ইউরোপীয়ান ইঞ্জিনীয়ারদেব তত্ত্বাবধানে বিশ হাজার চৈনিক কুলি মাঠে নামল গাঁইতি. কোদাল, শাবল নিয়ে।

"স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে ফ্রাঙ্কভিল শহবের অভিনব এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু সফল হয়েছে—মোদ্দা কথা হল এইটাই।

"শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেই কারণেই লিখেছেন—'খুব একটা আশা যদিও করিনা। কিন্তু যদি সফল হয় এক্সপেরিমেণ্ট, ফলাফল অভূতপূর্ব হবে নাকি? অধিকাংশ উদ্ভিদ আর পশুর মত মানুষও বাঁচবে নব্বই থেকে একশ বছর—মারা যাবে কেবল বার্ধক্য উপস্থিত হলে।'

"গতবছরে এই শহরে মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে মাত্র সওয়া এক! অথচ ইউরোপ আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর শহরগুলিতে বছরে মানুষ মারা যায় শতকরা তিনভাগ হারে!

"এমন একটা স্বপ্ন দেখতেও ভাল লাগে! এতো শুধু স্বপ্ন-নগরী নয়, মায়াপুরীও বটে। তবুও সবশেষে আমাদের তরফ থেকে একটা মন্তব্য রাখতে চাই। পরিকল্পনাটার সাফল্য সম্পর্কে আমরা উদাসীন হলেও বিশ্বাসী। বিরাট একটা গলদ চোখে পড়েছে আমাদের। কমিটির মধ্যে রইছে শুধু

ল্যাটিন রক্ত, জার্মান রক্ত একদম নেই। অথচ পৃথিবীতে যে কোনো মৌলিক সৃষ্টি যখন টিঁকে গেছে, দেখা গেছে তার পেছনে রয়েছে জার্মানরা। ভবিষ্যতেও নিখুঁত কিছু সৃষ্টি করতে গেলে জার্মান ছাড়া গতি নেই। ফ্রাঙ্কভিলের কর্মকর্তাদেরও একদিন হটে যেতে হবে—আমেরিকার মাটিতে না হলেও, রণাঙ্গনে তো বটেই। সেইদিনই কিন্তু গজিবে উঠবে সত্যিকারের মডেল সিটি।

১১॥ ডক্টর সারাসিনের সঙ্গে খানাপিনা

তেরোই সেপ্টেম্বর। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই কিন্তু প্রফেসর স্থলৎসের উড়ন্ত কামান উড়ে আসবে—ধ্বংস হবে ফ্রাঙ্কভিল শহর। পরমায়ু যে ফুরিয়ে এসেছে, তা কিন্তু কেউ জানে না, গভর্ণর থেকে আবম্ভ করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত—কেউই কল্পনাও করতে পারে নি কি ভয়ানক বিপদ হুমড়ি খেয়ে পড়তে চলেছে তাদের সাধের শহরেব বুকেব ওপর।

ডক্টব সাবাদিন তাঁই দুই সুহৃদকে খাওযার নেমন্তন্ন করেছিলেন। এঁদের একজন কর্ণেল হেনডন, ইনি যুদ্ধ-ফেরৎ, বাঁ-হাতটা হারিয়েছেন পিটসবার্গে, অন্য বণক্ষেত্রে হারিয়েছেন একটা কান। দাবা খেলায় কিন্তু তাঁর জুড়ি নেই। অপরজন মঁসিযে লেঞ্চ—ফ্রাঙ্কভিলেব নির্দেশদান বিভাগেব বড়কর্তা।

কথা হচ্ছে শহরেব প্রশাসন নিযে। নানারকম হাসপাতাল, সমিতি, গণপ্রতিষ্ঠান, নাগবিকদেব যা-যা উপকার করেছে, তাই নিযে জোব আলোচনা চলেছে খাবাব টেবিলে।

কথা বলতে বলতেই হাত বাডিযে কাগজটা নিলেন ডক্টর সারাসিন এবং যন্ত্রবৎ দৃষ্টিপাত কবলেন প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে। আচম্বিতে কথা বন্ধ হযে গেল তাঁব। বিস্ফারিত চোখে তাকিযে রইলেন বিশেষ সেই খবরটির দিকে। পবক্ষণেই ভীষণ বিস্মিত হয়ে পডতে শুরু করলেন। কণ্ঠস্বরে বিচ্ছুরিত হল সীমাহীন ঘৃণা-বিমিশ্র ক্রোধ। মানুষ এত নীচ হয়?

"নিউইয়র্ক, আটুই সেপ্টেম্বর—মানুষের অধিকাব খর্ব করার জন্যে সাংঘাতিক প্রচেষ্টার তোডজোড় চলছে। বিশেষ সূত্র থেকে জেনেছি, ফরাসি উদ্যোগে নির্মিত ফ্রাঙ্কভিল শহরকে হঠাৎ আক্রমণ করে ধ্বংস করার জন্যে

* ফ্রাঙ্কভিল শহরের যে ভবিষ্য-চিত্র জুল ভের্ণ মূল উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন, তা এ যুগে বৈচিত্র্যহীন এবং অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় বাদ দিতে হল। উনি বিশেষ ধরনের ইঁট তৈরীর প্ল্যান আর আইডিয়া গ্রহণ করেছিলেন লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সদস্য ডক্টর বেঞ্জামিন ওয়ার্ড রিচার্ডসনের কাছে।

ভয়ংকর প্রস্তুতি চলছে স্টালটাট শহরে। ল্যাটিন আর ম্যাক্সনদের এই লড়াইতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাথা গলাবেন কিনা জানা নেই, কিন্তু যে কোনো শুভবুদ্ধি মানুষের স্বরে স্বর মিলিয়ে আমরা বলব, শক্তির একি অপচয়? একি জঘন্য নীচ মনোবৃত্তি? এখনো সময় আছে, ফ্রাঙ্কভিল যেন আত্মরক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লাগে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১২॥ কাউন্সিল

ডক্টর সারাসিনকে ইস্পাত-সম্রাট যে কি পরিমাণ ঘৃণা করেন, তা কাকপক্ষীও জেনে গিয়েছিল। সবাই জানতো, ফ্রাঙ্কভিলের প্রতিদ্বন্দ্বী শহর হল স্টালটাট। কেউ কিন্তু ভাবতেও পারে নি শান্তিপূর্ণ একটা শহরকে রক্তে ভাসানোর জন্যে এতগুলি বছর ধরে আটঘাট বেঁধে চলেছে স্টালটাট। নিউইয়র্ক হেরাল্ডের—প্রবন্ধ পড়ে কিন্তু সংশয়ের ছায়াও রইল না। সংবাদদাতা লিখেছেন, পরিস্থিতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা চলবে না!

সুতরাং "কাউন্সিলের মিটিং ডাকতে চললাম," বলে ডক্টর সারাসিন বন্ধুদের নিয়ে পড়বার ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। তিনদিকের দেওয়াল কাঠের তক্তা দিয়ে মোড়া। আর একদিকের দেওয়ালে অদ্ভুত দর্শন কতকগুলো চোঙের—যেন ভেঁপু সাজানো রয়েছে সারি সারি।

ডক্টর বললেন—"টেলিফোনের দৌলতে ঘরে বসেই কাউন্সিল মিটিং করা যাবে। বাড়ী ছেড়ে বেরোতে হবে না সদস্যদের।"

বেল টিপে দিলেন ডক্টর। তৎক্ষণাৎ সদস্যদের বাড়ী বাড়ী খবর চলে গেল। তিন মিনিটও গেল না এক একটা ভেঁপুর মারফৎ খবর আসতে লাগল—হাজির। হাজির। হাজির।

কাউন্সিলের সবাই হাজির। মিটিং শুরু হতে পারে।

মাউথপিসের সামনে বসলেন ডক্টর। ঘণ্টাধ্বনি করে বললেন—

"মিটিং শুরু হল। মাননীয় বন্ধু কর্ণেল হেনডন একটা গুরুতর খবর জানাচ্ছেন আপনাদের।"

টেলিফোনের সামনে বসলেন কর্ণেল। নিউইয়র্ক হেরাল্ড থেকে খবরটা পড়ে শোনানোর পর বললেন, শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে কালবিলম্ব না করে প্রস্তুত হতে হবে।

কর্ণেল কথা শেষ করতে না করতেই প্রশ্ন করলেন ছ নম্বর—

"শত্রুদের যদি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, আত্মরক্ষা সম্ভব হবে কিনা, কর্ণেল কি তা ভেবেছেন ?"

কর্ণেল জানালেন, সম্ভব হবে বইকি। টেলিফোনের মাধ্যমেই চলল প্রশ্নোত্তরের আনাগোনা।

কদিনের মধ্যে শত্রুরা আসছে এবং ফাঙ্কফিল তৈরী হবে কখন ?

কর্ণেল এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, দিন পনেরোর মধ্যে ওরা হানা দিতে পারে।

দু নম্বরের প্রশ্ন—"আক্রমণের পথ চেয়ে বসে থাকবো, না, তার আগেই আক্রমণ যাতে আদৌ না হয়, সে চেষ্টা করব ?"

"যাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করব সবশক্তি দিয়ে।" জবাব দিলেন কর্ণেল। "ওরা যদি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আসে তো টর্পেডো দিয়ে উড়িয়ে দেব।"

ডক্টর তখন প্রস্তাব করলেন, কাউন্সিল মিটিংয়ে ঝানু কেমিস্ট আর গোলন্দাজদের ডেকে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হোক কর্ণেল হেনডন কি চান এবং কি তাঁর প্ল্যান।

এক নম্বরের প্রশ্ন—"প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কত টাকা লাগবে ?"

"দেড় থেকে দু কোটি ডলার।"

"নাগরিক সংঘকে এখুনি খবর দেওয়া হোক।"

প্রেসিডেন্ট সাবাসিন—"আমি সমর্থন জানাচ্ছি এ প্রস্তাবকে।"

সব কটা টেলিফোনের ঘণ্টা পর পর দুবার বেজে উঠল। অর্থাৎ সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। কারো বিরক্তি উৎপাদন না করে মাত্র আঠারো মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাউন্সিল মিটিং।

অত্যন্ত সহজে অথচ খুব তাড়াতাড়ি নাগরিক সংঘের জরুরী মিটিং ডাকা হল টেলিফোন মারফৎ। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত টাউন হলে জানিয়ে দিলেন ডক্টর সাবাসিন। সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজতে লাগল শহরময়। শহরের সর্বত্র পার্কের মাঝে সুউচ্চ স্তম্ভের-শীর্ষে লাগানো ছিল ইলেকট্রিক ঘণ্টাগুলো, স্তম্ভ ঘিরে জ্বলছিল আলোকিত ডায়াল প্লেট। ইলেকট্রিক ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়েছিল সাড়ে আটটার ঘরে

অসময়ে জরুরী তলব শুনে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল জনগণ। পিল পিল করে লোক জড়ো হল পার্কে—ঘড়ির কাঁটা দেখে বুঝল বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। সাড়ে আটটায় ডাক পড়েছে টাউন হলে। গুরুতর জাতীয় কর্তব্য সন্দেহ নেই.

সুতরাং দ্রুতপদে সবাই ছুটল টাউন হল অভিমুখে। একটানা পনেরো মিনিট ঘণ্টা বেজে চলল গোটা ফ্রাঙ্কভিল শহর জুড়ে।

পৌনে একঘণ্টা লাগল টাউন হল ভর্তি হতে। ডক্টর সারাসিন আসীন ছিলেন তাঁর জন্য সংরক্ষিত বিশেষ আসনে! কাউন্সিল সদস্যরা বসেছেন তাঁকে ঘিরে। কর্ণেল হেনডন বসে আছেন মঞ্চের সামনে। হুকুম হলেই শুরু করবেন বক্তৃতা।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য বেশীর ভাগ নাগরিক জেনে গিয়েছে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত টাউন হল থেকে টেলিফোন মারফৎ হুবহু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব কটা দৈনিকে। তৎক্ষণাৎ বিশেষ সংস্করণ ছেপেছে খবরের কাগজওয়ালারা এবং আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

টাউন হলটি আকারে বিরাট। কাঁচের ছাদ এবং গ্যাসের অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

অতবড় হল একেবারে ভরে গিয়েছে। তিল ধারণের স্থান আর নেই। অথচ কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ধীর স্থির ভাবে সুসংবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে সকলে। প্রশান্ত, প্রসন্ন, প্রফুল্ল মুখচ্ছবি। ভরাট স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে চোখে মুখে। যথা নিয়মে কঠোর কাজকর্মের মধ্যে থাকলে স্বাস্থ্য তো নিটোল হবেই। মনের ওপর তাই সংযম যথেষ্ট। ফলে, দুম করে রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করা বা আতংকে কাঠ হয়ে মাথার চুল খাড়া করে ফেলার মত ধাত নয় কারোরই।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় ঘণ্টা বাজালেন প্রেসিডেণ্ট সারাসিন। নৈঃশব্দ্য নেমে এল সারা হলঘরে।

উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল। আবেগময় ভাষার ধার দিয়েও গেলেন না। কি বলতে হবে, তা তিনি জানেন। সেই বক্তব্যই ধীর স্থিরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপিত করলেন জনগণের সামনে।

বললেন—"এ অবস্থায় কি করা দরকার আপনারাই ঠিক করবেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এ শহরের বাসিন্দা হয়েছেন, সেই আদর্শর রক্ষাকল্পেই জীবন পণ করে দাঁড়ান সবাই।"

বক্তিমে শেষ হতেই এমন হাততালির নির্ঘোষ শোনা গেল যার তুলনায় সহস্র বজ্রও বুঝি ভুঁইপটকার সামিল। সহর্ষ অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর সবাই অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন কর্ণেল হেনডনকে।

ডক্টর সারাসিন প্রস্তাব করলেন, এখুনি একটা প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করা হোক। সামরিক ব্যবস্থার সমস্ত ভার এই কমিটির ওপর ন্যস্ত করা হোক। প্রস্তাব গৃহীত হল সর্বসম্মতিক্রমে।

একজন সদস্য উঠে বললেন, প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্বের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করা হোক। হাত তুলে মঞ্জুর করা হল পুরো টাকা।

দশটা পঁচিশে মিটিং শেষ হল। নাগরিকরা ঘর ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। অত্যন্ত অদ্ভুত চেহারার এক-জন কিম্ভূতকিমাকার আগন্তুক আচম্বিতে উঠে পড়ল শূন্য মঞ্চে। যেন জাদু-মন্ত্র বলে শূন্য হতে আবির্ভূত হল রহস্যময় আগন্তুক। মুখ দেখে মনে হল ভয়াবহ উদ্বেগে শোচনীয় তার মনের অবস্থা, অথচ হাবভাব অতিশয় সংযত দৃঢ় এবং প্রশান্ত। সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে তাকে আসতে হয়েছে তা বোঝা গেল তার ছেঁড়া, কাদা মাখা জামা কাপড় আর রক্তমাখা কপাল দেখে।

তাকে দেখেই কিন্তু ঘর শুদ্ধ লোক থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হাতের ইসারায় সবাইকে মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হুকুম করল আগন্তুক।

কিন্তু সে কে? কোত্থেকে তার আগমন? প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সাহস হল না স্বয়ং ডক্টরেরও।

"একটু আগেই স্টালটাট শহর থেকে পালিয়েছি আমি" বললে বিচিত্র দর্শন মূর্তি। "আমাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন হের স্থলৎস। কিন্তু ঈশ্বর আমায় মুক্তি দিয়েছেন, ফ্রাঙ্কভিল শহরবাসীদের জীবন রক্ষার জন্যে। আপনাদের অনেকেই কিন্তু আমায় চেনেন। যদিও রক্ত আর কাদা মেখে আছি বলে এখন চেনা দুষ্কর, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ডক্টর সারাসিনও আমাকে চিনে উঠতে পারছেন না—তবুও জানবেন ম্যাক্স ব্রাকমানের ওপর তার অটল আস্থায় চিড় খায়নি আজও!"

"ম্যাক্স!" চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এলেন ডক্টর এবং অটো।

হাতের ইঙ্গিতে তাদের নিরস্ত করল ম্যাক্স

হ্যাঁ, আগন্তুক ম্যাক্স ব্রাকমানই বটে। স্রেফ দৈব সহায় হয়েছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। গরাদ-পাল্লা গায়ের জোরে খুলে স্রোতের টানে ভেসে গিয়েছিল সে—দুমিনিট পরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছড়ে পড়েছিল নদীতীরে স্টালটাট শহরের বাইরে। প্রাণটা বেরিয়েও বেরোতে পারেনি স্রেফ পরমায়ু ছিল বলে। দম বন্ধ হতে হতেও বেঁচে গিয়েছে ছিটে ফোঁটা বাতাসের দৌলতে।

নির্জন মরুভূমির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে রইল একটা দেহ। মড়ার মত নিথর দেহ। ঘন তমসা আবৃত করে রাখল তার অসহায় অসাড় দেহকে। জ্ঞান ফিরে এল ভোরের আলোয়। ভয়ংকর স্টালটাট কারা-নগরী থেকে

প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাল হৃদয় দেবতাকে। পর মুহূর্তে সমগ্র চিন্তাশক্তি কেন্দ্রীভূত হল শুধু একটি বিষয়ে—ডক্টর সারাসিন, এবং নাগরিকদের হুঁশিয়ার করতেই হবে। বাঁচাতেই হবে লক্ষ লোকের প্রাণ!

ভেতর থেকে যেন একটা শক্তি তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল মাটির ওপর। ফ্রাঙ্কভিল শহর সেখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে। সুদীর্ঘ এই পথ তাকে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। দুই শহরের মধ্যে রেলগাড়ী নেই, গরুর গাড়ী নেই, ঘোড়ার গাড়ীও নেই। অতিভয়ংকর স্টালটাট শহরকে সবাই এড়িয়ে যায়—তাই লোকজনও নেই। তা সত্বেও পা টেনে টেনে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে চলল ম্যাক্স। ফ্রাঙ্কভিল পৌঁছোলো রাত সওয়া দশটায়।

দেওয়ালের পোস্টার পড়ে জানল, নাগরিকরা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে বটে, কিন্তু বিপদটা যে কতখানি প্রলয়ংকর, তা জানতে পারেনি। বিপদ যে বেশী দূরে নেই, সে খবরও পায়নি। আর একটু পরেই ঘড়ির কাঁটা পৌনে বারোটার ঘরে পৌঁছোলেই শূন্য হতে অবতীর্ণ হবে মহাভয়ংকর রুদ্রদেব—উড়ন্ত কামানের আকারে—মৃত্যু আর ধ্বংসকে ছড়িয়ে দেবে শহরময়!

একটা মুহূর্তও অপচয় না করে শহরের মধ্যে দিয়ে বায়ুবেগে ছুটল ম্যাক্স। দশটা পঁচিশে পৌঁছোলো টাউন হলে। সভা ভঙ্গ হওয়ার মুখে লাফিয়ে উঠে পড়ল মঞ্চে।

চীৎকার করে বলল - "বন্ধুরা, এক মাস নয়, এক হপ্তাও নয়। আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রলয় শুরু হবে—লোহা আর আগুন বৃষ্টির মত ঝরে পড়বে আকাশ থেকে। নর পিশাচ স্লুলৎস এমন একটা হাতিয়ার বানিয়েছেন যা স্প্রিং টেপামাত্র তিরিশ মাইল দূর থেকে উড়ে এসে ফেটে পড়বে শহরের বুকে! এই মুহূর্তে মহাভয়ংকর সেই হাতিয়ারের নল ঘোরানো রয়েছে আমাদের দিকেই! বিকট সেই অস্ত্র আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। ছেলেপুলে আর মেয়েদের এখুনি পাতাল ঘরে, অথবা শহরের বাইরে, অথবা পাহাড়ের গুহায় পাঠিয়ে দিন। পুরুষরা আগুন নেভাবার জন্যে তৈরী হোন। নরপিশাচ হের স্লুলৎসের ক্ষমতা আপনাদের অবিদিত নয়। তাঁর প্ল্যান যদি সফল হয় এবং তাঁর হিসেবে যদি ভুল না থাকে, চক্ষের পলকে একসঙ্গে একশোটা আগুন জ্বলে উঠবে শহর জুড়ে। একশটা বিভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গে আগুন নেভানোর জন্যে তৎপর হতে হবে আমাদের! যাই হোকনা কেন,. নাগরিকদের বাঁচাতে হবে সবার আগে।"

এ ধরনের বক্তৃতা ইউরোপে দিলে ম্যাক্সকে পাগল আখ্যা দিয়ে উপহাস করা হত। কিন্তু আমেরিকায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে, তা সে যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, বিদ্রুপ করা হয় না। সুতরাং ডক্টর সারাসিনের উপদেশ মত সবাই ম্যাক্সের সতর্কবাণী মন দিয়ে শুনল এবং অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করল।

বক্তার অদ্ভুত চেহারা এবং আশ্চর্য বাচনভঙ্গীতে কাজ হল কিন্তু ম্যাজিকের মত। হুকুম অমান্য করার প্রশ্ন এল না কারো মনের মধ্যে। ডক্টর সারাসিন তার সঙ্গে কথা বলেছেন, এই যথেষ্ট।

তৎক্ষণাৎ খবরদাতারা ছুটে গেল শহরের দিকে। কিছু লোক বাড়ীর নীচে নির্মিত পাতাল ঘরে আশ্রয় নিল। বোমা পড়ুক মাথার ওপর, ধ্বংস হয়ে যাক বাড়ী-ঘর-দোর—অক্ষত থাকবে ভূগর্ভ-কক্ষ। বাদবাকী লোক ঘোড়ায় চেপে, পায়ে হেঁটে, গাড়ী চড়ে রওনা হল কাসকেড পাহাড়ের দিকে। টপাটপ পাথর টপকে উঠে পড়ল ওপরে। শক্তসমর্থ নাগরিকরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে রইল সব কটা চৌমাথায় এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায়। আগুন বৃষ্টি শুরু হলেই জল, মাটি আর বালি দিয়ে খর্ব করা হবে অগ্নির প্রতাপ।

টাউন হলে কিন্তু বিরাম রইল না প্রতিরক্ষা আলোচনার।

ম্যাক্সের মাথায় তখন অন্য একটা আইডিয়া ঘুর ঘুর করছিল। সবাই যা ভাবছে, তা নয়। বলছিল আপন মনে—

"পৌনে বারোটা। সত্যিই কি ভয়ংকর আবিষ্কার দিয়ে শহর ধ্বংস করতে সক্ষম হবে নবপিশাচ সুলৎস?"

আচম্বিতে পকেট থেকে বেরোলো ছোট্ট খাতা। ইঙ্গিতে সবাইকে নীরব থাকতে বলে পেন্সিল নিয়ে শুরু হল অংক কষা। খসখস করে অনেকগুলো সংখ্যা খাতার পাতায় লিখতে লিখতে সহসা পরিষ্কার হয়ে এল তার কুঞ্চিত ললাট—আলোকিত হল মুখচ্ছবি।

বলল সহর্ষে—"এক মুহূর্ত আগেও সমাধানটা মাথায় আনতে পারিনি! হের সুলৎস ভুল করেছেন! ওঁর হুমকি নিছক দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিসসু নয়! অত বড় বৈজ্ঞানিক এই প্রথম ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলেছেন! উনি যা-যা বলেছেন, তার কোনোটাই ঘটবে না। অসম্ভব! ওঁর তৈরী মহা ভয়ংকর গোলা ফ্রাঙ্কভিলের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে—ফাটবে না! যদি কিছু ঘটে তো ঘটবে ভবিষ্যতে!"

বলছে কি ম্যাক্স? বন্ধুদের মাথায় ঢুকল না তার বক্তব্য!

অংকটা তখন বুঝিয়ে দিল নওজোয়ান অ্যালসেশিয়ান। দৃপ্তকণ্ঠে এমন সহজভাবে বলল যে নিতান্ত অজ্ঞর কাছেও দিনের আলোর সুস্পষ্ট হয়ে গেল

হেঁয়ালিটা। অন্ধকারের বুকে যেন আলো ফুটে উঠল, উদ্বেগ তিরোহিত হয়ে প্রশান্তি দেখা দিল। মৃত্যুদূত ক্ষেপণাস্ত্র শুধু ফ্রাঙ্কভিল শহর কেন, ভূলোকের কোনো কিছুকেই ছুঁতে পারবে না। মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে চিরতরে।

ম্যাক্সের অংক যে নির্ভুল তা মেনে নিলেন ডক্টর সারাসিন। হলঘরের আলোকিত ডায়ালের দিকে আঙুল তুলে বললেন—

"আর মাত্র তিন মিনিট বাকী আছে। হের স্থলৎস ভুল করলেন কি ম্যাক্স ব্রাকমান ভুল করল—তা জানা যাবে তিন মিনিট পরেই।"

"আসুন," বলল ম্যাক্স।

ওর পেছন পেছন সবাই বেরিয়ে এল খোলা চত্বরে শ্বাসরোধী উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল তিনটে মিনিট। সুবিশাল ঘড়িতে সূচিত হল রাত পৌনে-বারোটা।

চার সেকেণ্ড পরে একটা কৃষ্ণকায় পিণ্ড দেখা গেল মাথার ওপর, আশ্চর্য-বেগে ধেয়ে এসেই বক্তৃহিম করা সোঁ সোঁ শব্দে মিলিয়ে গেল দূরে—বহুদূরে।

অট্টহেসে বললে ম্যাক্স—"যাত্রা শুভ হোক। ঐ গতিবেগে বরাবর গেলে হের স্থলৎসের গোলা ধরিত্রীর বুকে কোনো দিনও ফিরে আসবে না।"

দু মিনিট পরে দূরায়ত বজ্রগর্জনের মত একটা গুম গুম নির্ঘোষ শোনা গেল। বুল টাওয়ারের কামান গর্জন। ঘণ্টায় সাড়ে চারশ মাইল বেগে ক্ষেপণাস্ত্রটা* মহাশূন্যে উধাও হওয়ার পর একশ তেরো সেকেণ্ড পরে শব্দটা ভেসে এসেছে ফ্রাঙ্কভিল শহরে।

১৩॥ প্রফেসর খবর পেলেন

"ম্যাক্স ব্রাকমান লিখছে স্টালটাট শহরের প্রফেসর স্থলৎসকে—

ফ্রাঙ্কভিল, সেপ্টেম্বর ১৪

"ইস্পাত সম্রাটকে খবরটা দেওয়া দরকার বলে এই এই চিঠির অবতারণা করছি। জ্বলন্ত কারখানায় মডেল উদ্ধার করার চাইতে আমার প্রাণটা বেশী দামী ছিল। তাই পরশু রাতে আমি তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি।"

"আমি কে, এই গুপ্ত রহস্যটি আপনাকে জানানো আমার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। ভয় নেই। আমার গুপ্ত রহস্য জানবার অপরাধে আপনার শিরচ্ছেদ করার হুকুম দেব না।

*নিশ্চয় মুদ্রাকরের প্রমাদ। ঘণ্টায় ৪৫০ নয়, ভের্ন বলতে চেয়েছিলেন মিনিটে ৪৫০ মাইল।

"জোহান আমার আসল নাম নয়। জাতে আমি সুইশ নই। আমার জন্ম অ্যালসেশ। নাম, ম্যাক্স ব্রাকমান।

আপনার কথার দাম দিতে যদি হয়, তাহলে বলব আমি মোটামুটি ভাল ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা আমি ফরাসি। আমার স্বদেশ, স্বজন এবং সুহৃদবর্গের আপনি পরম শত্রু। আমার যা কিছু প্রিয়, তা ধ্বংস করতে আপনি বদ্ধ পরিকর। আপনার কুঅভিসন্ধি জানবার জন্যে জীবনপণ করেছিলাম। আপনার দুরভিসন্ধি বানচাল করবার জন্যে ফের জীবনপণ করব।

প্রথমেই জানাই, আপনার পয়লা নম্বর গোলার কেরদানি সন্তোষজনক হয় নি।

লক্ষ্য বস্তুতে গোলা পৌঁছোয়নি—পৌঁছোতে পারবেও না। আপনার কামানটা ভাল, তবে ঐ কামান নিক্ষিপ্ত গোলা কস্মিনকালেও কারো কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। কারো ঘাড়ে মাথায় এ গোলা পড়বার সম্ভাবনাও নেই। আগে থেকেই মনটা খচখচ করছিল কামানের কার্যকারিতা নিয়ে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। আপনার জয় হোক! হের সুলৎস দারুণ কামান বানিয়েছেন—আশ্চর্য এই আবিষ্কারে কারো ক্ষতি হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই।

শুনে খুশী হবেন, শহরের মাথার ওপর দিয়ে রাত এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট চার সেকেণ্ডে আপনার গোলাকে উড়ে যেতে দেখেছি। পশ্চিমদিকে উড়ে গিয়েছে আপনার ক্ষেপণাস্ত্র। উড়তে উড়তে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করে দিয়েছে। সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত এ গোলা ঐ ভাবেই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে মরবে—কারো মাথায় পড়বে না। সেকেণ্ডে দশহাজার গজ প্রাথমিক গতিবেগে কোনো ক্ষেপণাস্ত্রই মাটিতে আছাড় খাবে না। এই গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৃথিবীর আকর্ষণ। ফলে, পৃথিবী প্রদক্ষিণই লেখা ছিল আপনার গোলার কপালে।

এ-তথ্য আপনার জানা উচিত ছিল।

বুল টাওয়ারের কামানটি প্রথম মহড়াতেই নিশ্চয় বিগড়েছে। কিন্তু মাত্র দুলক্ষ ডলার খরচ করে যদি গ্রহজগৎকে একটা নবীন নক্ষত্র এবং বসুন্ধরাকে একটা দ্বিতীয় উপগ্রহ উপহার দেওয়া যায়, তবে সে আনন্দ কম নয়।"*

* কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির এইটাই বোধহয় প্রথম প্রচেষ্টা। ভের্নের ভবিষ্যদবাণীর মধ্যে কিন্তু দুটো দারুণ ভুল থেকে গিয়েছে। দুটোই টেকনিকাল ভুল। এজন্যে তাঁর খুব দোষ নেই যদিও, কেন না এ কাহিনী লেখবার সময়ে মহাকাশ

চিঠি নিয়ে একজন বার্তাবাহক দ্রুতগামী যানে ছুটে গেল স্টালটাট শহরে। হের স্থলৎসকে খোঁচা মারার লোভ সম্বরণ করতে না পারার জন্যে ম্যাক্সকে না হয় ক্ষমাই করা গেল।

ম্যাক্সই ঠিকই বলেছিল। উড়ন্ত গোলা ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করবে না কোনোদিনই এবং একবার কামান ছুঁড়েই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল স্থলৎসের দানবিক হাতিয়ার।

চিঠি পেয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করলেন হের স্থলৎস। আত্ম-অহমিকায় জব্বর চোট মেরেছে ছোকরা। চিঠি পড়তে পড়তে সারা দেহ তাঁর টকটকে লাল হয়ে উঠল এবং মাথাটা আচমকা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর যেন কেউ মুগুড় মেরেছে ব্রহ্মতালুতে। ঝাড়া সোয়া ঘণ্টা এই অবস্থায় রইলেন ভদ্রলোক। ধাতস্থ হওয়ার পর সর্বনাশা ক্রোধে ফেটে পড়লেন আর্মিনিয়াস আর সিগিমারের ওপর।

কিন্তু হার স্বীকার করবার পাত্র নন হের স্থলৎস।

এখন থেকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ম্যাক্সের সঙ্গে চলবে তাঁর লড়াই। অস্ত্রাগার তো খালি হয় নি। হাতে এখনো রয়েছে তরল কার্বনডায়অক্সাইড ভর্তি বিস্তর গোলা। অল্প পাল্লার কামানও রয়েছে।

প্রবল চেষ্টায় সামলে নিয়ে পড়বার ঘরে ঢুকে ফের কাজ নিয়ে তন্ময় হলেন ইস্পাত-সম্রাট।

বেশ বোঝা গেল, ফ্রাঙ্কভিল শহরের এবার আর নিস্তার নেই।

বিজ্ঞান শৈশবও পেরোয়নি। যে গতিবেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে আশা যায়, সেই গতিবেগ অর্থাৎ সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিবেগে কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হলে, সে গোলা বাতাসের ঘর্ষণে প্রদীপ্ত বাষ্পে পরিণত হবে অথবা চুরমার হয়ে যাবে। ক্ষেপণাস্ত্রের দু'একটা টুকরো যদিও বা ছিটকে বেরিয়ে যায়, টুকরোগুলি কস্মিনকালেও বসুন্ধরাকে অনন্তকাল ধরে প্রদক্ষিণ করবে না। উপবৃত্তের কক্ষপথে টুকরোগুলো পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরবে ক্ষিপ্তের মত, একবার কাছে আসবে, আবার দূরে যাবে; প্রতিবার ঘুরে আসার সময়ে মাটি ঘেঁসে ফের উড়ে যাবে, চলার পথে বাড়ী ঘরদোর জাহাজ—যা পড়বে চুরমার হবে; বাতাসের ঘর্ষণে ক্রমশঃ গতিবেগ কমতে থাকবে টুকরোগুলোর—হয়ত প্রচণ্ড চাপে বাষ্পে পরিণত হবে, ভেঙেচুরে গিয়ে উল্কার আকারে হয় সমুদ্র নয় মাটির বুকে ঝাঁপ খাবে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে শুরু যেখান থেকে, সেই বুলটাওয়ারে কখনো টুকরোগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যাবে না। ক্ষ্যাপাটে উপবৃত্ত!—আই, ও, ইভান্স, রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সদস্য।

১৪ ॥ ম্যাক্সের প্রেরণার উৎস

বিপদে তখনকার মত কেটে গেলেও, পরিস্থিতি যে আরো ঘোরালো হল, তা ম্যাক্স বুঝিয়ে বলল, ডক্টর সারাসিন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের। হের স্লুলৎসের উদ্যোগপব সে দেখে এসেছে। প্রলয় যন্ত্রগুলোর চেহারা-চরিত্র খুঁটিয়ে বর্ণনা করল প্রতিরক্ষা কমিটির সামনে, ফ্রাঙ্কভিল শহর তছনছ করে দেওয়ার জন্যে তাঁর এলাহি কাণ্ড কারখানার জীবন্ত বর্ণনা শুনে পরের দিনই কমিটির জরুরী মিটিং বসল—মুখ্য ভূমিকা নিল ম্যাক্স স্বয়ং। ধ্বংসের আয়োজন ভণ্ডুল করা না গেলেও বাধা দেওয়া যায় কি করে, এই নিয়ে খসড়া পরিকল্পনা রচনা এবং সেই মত তৎপর হওয়ার জন্যেই অত্যন্ত গোপনে অনেকক্ষণ ধরে চলল আলোচনা।

ম্যাক্সকে কিন্তু পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে গেল অটো। অটো যে আগের থেকে অনেক পালটে গিয়েছে, তা আবিষ্কার করতে দেরী হল না ম্যাক্সের।

কাকপক্ষীও জানতে পারল না কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষা কমিটি। মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্যটা শুধু ছাপিয়ে দেওয়া হল খবরের কাগজে। সবাই বুঝল, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে একা ম্যাক্স।

নাগরিকদের ডেকে বললে -"প্রতিরক্ষার মোদ্দা কথা হল, শত্রুর শক্তি কতখানি তা জেনে নিয়ে নিজেকে তৈরী করা। হের স্লুলৎসের কামান যত দুর্দান্তই হোক না কেন, কামানের মাপজোপ, পাল্লা, শক্তি সবই যখন জানি—তখন সেই মত তৈরী হওয়াই ভাল। অজানা অস্ত্রকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

ঠিক হল, স্থল-পথে আর জল-পথে যাতে ফ্রাঙ্কভিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে না পারা যায়, সেই বাধা গড়ে তোলা হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে, এই নিয়ে আলোচনা হল প্রতিরক্ষা কমিটিতে। কমিটি আলোচনা অন্তে জানালো, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। প্ল্যানমাফিক তক্ষুনি কাজ শুরু করে দিল নাগরিকরা। খুশীর বান ডাকল যেন সবার মনের মধ্যে। হাসিমুখে কুলির কাজ করে চলল সব শ্রেণীর সব বয়েসের পুরুষরা। কাজ এগিয়ে চলল হু-হু করে! দু'বছরের উপযুক্ত খাবার দাবার সংগ্রহ করে রাখা হল শহরের ভাঁড়ারে। আনা হল বিপুল পরিমাণ কয়লা আর লোহা। লোহার দরকার হাতিয়ার উৎপাদনের জন্যে, কয়লা রইল হাতিয়ার কারখানার জন্যে আর বাড়ী বাড়ী চুল্লী জ্বালানোর জন্যে।

পর্বতপ্রমাণ লোহা আর কয়লা ছাড়াও বাজারে আরও কয়েকটা পাহাড়-সমান স্তূপ দেখা গেল। এগুলি ময়দার থলির, নোনা মাংসর, চীজ-য়ের এবং শুকনো তরিতরকারীর। বাহারি বাগিচাগুলো ভরে গেল গরু-মোষ, ভেড়া ছাগল, মুরগী, শুয়োরে।

অস্ত্র চালনায় সক্ষম পুরুষদের ডাক পড়তেই তুমুল উদ্দীপনা দেখা গেল শহরময়। সৈনিক নাগরিকদের মনোবল সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রইল না। উলের সার্ট, সুতির ট্রাউজার্স, হাফ-বুট, শক্ত চামড়ার টুপী—এই হল তাদের সাদামাটা সাজপোশাক। রোজ বড় রাস্তায় কুচকাওয়াজ করতে লাগল তারা ঘাড়ে ওয়ার্ডার রাইফেল চাপিয়ে।

ট্রেঞ্চ খোঁড়া আরম্ভ হয়ে গেল পথে ঘাটে, মাটির পাঁচিল তোলা হল বিশেষ বিশেষ জায়গায়। ধোঁয়াকে কার্বনহীন করার কামানগুলোকে কামান ঢালাইয়ের কারখানায় রূপান্তরিত করা হল রাতারাতি এবং হরেক রকম মাপের কামান তৈরী আরম্ভ হয়ে গেল সেই সব কারখানায়।

ম্যাক্সের ক্লান্তি নেই কোনো ব্যাপারেই। সর্বত্র রয়েছে সে, রয়েছে প্রতিটি উদ্যোগপর্বে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

একটা মিথ্যে গুজব দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ায় শাপে বর হল, অর্থাৎ আরো জোর কদমে এগিয়ে গেল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। । হের সুলৎস নাকি জাহাজ কোম্পানীদের সঙ্গে কথা বলছেন কামান বয়ে নিয়ে আনার জন্যে। সেইদিন থেকেই এ রকম ধাপ্পাবাজি হামেশাই শোনা যেতে প্রায় প্রতিদিনই। কখনো শোনা গেল, ফ্রাঙ্কাভলের খুব কাছেই এসে গিয়েছে সুলৎসের রণতরী বহর। পরক্ষণেই খবর ছড়িয়ে পড়ল, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুপক্ষ নাকি স্যাকরামেন্টো রেলপথকে উড়িয়ে দিয়েছে।

গুজবের জন্ম কিন্তু সংবাদদাতাদের কলমে। রসিয়ে খবর ছাপিয়ে কাটতি বাড়ানোর জন্যে খবর বানিয়ে চলল নিত্যনূতন। প্রকৃতপক্ষে, স্টালটাট শহর বেঁচে আছে বলে মনেই হচ্ছিল না। নিঝুম হয়ে পড়েছিল অমন একটা কর্মচঞ্চল লৌহ-নগরী।

শত্রুপক্ষের এই নীরবতার সুযোগ নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল ম্যাক্স—দ্রুত শেষ করছিল প্রতিরক্ষা। মনের ভেতর একটা চিন্তা কিন্তু কাঁটার মত ফুটছিল অষ্টপ্রহর। ফুরসৎ হলেই সাত-পাঁচ ভাবতে বসত এবং অস্বস্তি ভোগ করত লৌহনগরীর অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়া দেখে।

ভাবত—"রণকৌশল হঠাৎ পালটায়নি তো শয়তানটা? কে জানে হয়ত অন্যভাবে মরণমার মারবার ফিকিরে রয়েছে নরপিশাচ সুলৎস।"

কিন্তু কোনক্রমেই ঢিলে দিল না দুটি কাজে—জলপথে রণতরীকে এবং স্থল-পথে সৈন্যবাহিনীকে রুখে দেওয়ার জন্যে অন্তরায় সৃষ্টির কাজকর্ম রইল অব্যাহত। বরং কাজের গতি বৃদ্ধি পেল দ্বিগুণ।

ম্যাক্স কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে কি ধরনের চমক, বিস্ময় এবং শিহরণ।

১৫ ॥ সানফ্রানসিসকো এক্সচেঞ্জ

সানফ্রানসিসকো এক্সচেঞ্জ মানেই হল ব্যবসাদার আর শিল্পপতিদের কর্মস্থল। এতবড় কারবারকেন্দ্র পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এখানে যখন ব্যবসার লেনদেন চলে, তখনকার মত অদ্ভুত জীবন্ত দৃশ্য খুব অল্পই দেখা যায় সারা দুনিয়ায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানীর ভৌগোলিক বিশেষত্বই এ শহরের এক্সচেঞ্জকে এতখানি আন্তর্জাতিক মান দান করেছে।

লাল টকটকে গ্র্যানাইট বারান্দার তলায় দেখা যাবে সোনালী চুল স্যাক্সনরা আড্ডা মারছে চনমনে খর্বকায় কৃষ্ণকেশ কেল্টদের সঙ্গে। নিগ্রোরা মিশে গেছে ফিনল্যাণ্ডার আর হিন্দুদের দলে।

পলিনেশিয়ানরা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে গ্রীনল্যাণ্ডারদের। ঐতিহাসিক শত্রু জাপানীদের বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোণঠাসা করার ফিকির খুঁজছে তির্যকচক্ষু চীনেরা।

এ যেন আধুনিক ব্যাবেল সব ভাষা, ভাব, আচার আচরণের মহামিলনক্ষেত্র।

বারোই অক্টোবর যথারীতি কাজক। বার শুরু হল এক্সচেঞ্জে।

একটা বাজল। সংক্রামক ব্যাধির মত অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে কাতারে কাতারে লোক। ভূমিকম্পের ঢেউ যেভাবে ছড়িয়ে যায়। ঠিক সেইভাবে একটা রহস্যাবৃত উন্মাদনা ক্রমশঃ কম্প্র করে তুলছে জনতাকে।

বিদ্যুৎবহ্নির মত হাতে হাতে ঘুরছে খবর লেখা একটা কাগজ, দূরপ্রতীচ্য-ব্যাংকের জনৈক অংশীদার বয়ে এনেছেন চমকপ্রদ অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য সেই খবর।

আচম্বিতে বিশাল তরঙ্গের আকারে বিপুল জনস্রোত ছুটে গেল উত্তর দিকের দেওয়ালে—রাশি রাশি টেলিগ্রাম আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে।

সবশেষের নীল কাগজে লেখা রয়েছে :

"নিউইয়র্ক, ১২-৪০—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। স্টালটাট শিল্পনগরী। পেমেন্ট বন্ধ। দেনার পরিমাণ যদ্দুর জানা গেছে : চার কোটি সত্তর লক্ষ ডলার। স্থলৎস উধাও হয়েছেন।"

আর কোন সন্দেহ নেই। খবরটা সত্যি, অত্যাশ্চর্য হলেও সত্যি—গুজব নয়।

দুটোর সময়ে একটা লিস্ট ঝুলিয়ে দেওয়া হলো দেওয়ালে—স্থলৎস নিজে লালবাতি জ্বেলে যাদের সর্বনাশ করলেন—তাদের নামধাম।

সন্ধ্যে হতেই কাতারে কাতারে লোক ছুটল খবরের কাগজ কিনতে, নতুন খবর জানতে।

খবর যা পাওয়া গেল, তা অতি সামান্য। ২৫শে সেপ্টেম্বর আট কোটি ডলারের একটা ড্রাফট ইস্পাত-সম্রাটের নিউইয়র্ক ব্যাংকে হাজির করা হলে সেটি ফেরৎ যায় ; এত টাকা নাকি স্থলৎসের অ্যাকাউন্টে নেই। টেলিগ্রামে নির্দেশ চাওয়া হয় হের স্থলৎসের কাছে—আজও তার জবাব আসেনি !

তখন খাতাপত্র খুলে আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। গত তেরোদিন ধরে স্টালটাট চিঠিপত্র বা টাকাকড়ির হিসেব পাঠায় নি।

ঠিক তখন থেকেই হের স্থলৎসের সই করা চেক আর ড্রাফট স্রোতের মত আসতে লাগল ব্যাঙ্কে—সবাইকেই জানানো হল একই উত্তর—"টাকা নেই।"

পর-পর চারদিন টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল ব্যাঙ্ক আর স্টালটাট শহরের ওপর। কাকুতি-মিনতি, উত্তেজিত প্রশ্নাবলী, অনুরোধ ভীতিপ্রদর্শন—সব রকম ভাষাই লেখা হল টেলিগ্রামে।

চারদিন পরে পরে জবাব এল টেলিগ্রাম মারফৎ :

"সতেরোই সেপ্টেম্বর উধাও হয়েছেন হের স্থলৎস। কেউ জানে না, কেন। রহস্যের ব্যাখ্যা কারো জানা নেই। কারো জন্যে কোনো আদেশ রেখে যান নি। প্রতিটি সেকশনের সিন্দুক একদম খালি।"

তারপর থেকে সত্যকে আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা গেল না। বড় বড় কোম্পানীগুলো ঘাবড়ে গিয়ে দাবীদাওয়ার ফিরিস্তি নিয়ে আদালতে ছুটল। লালবাতি জ্বলার হিড়িক শুরু হয়ে গেল দিকে দিকে।

তেরোই অক্টোবর দুপুর বারোটা নাগাদ জানা গেল, দেনার মোট পরিমাণ চার কোটি সত্তর লক্ষ ডলার। আরো কত কোম্পানী লাটে উঠল জানবার পর হিসেবটা সম্ভবতঃ ছ কোটিতে গিয়ে ঠেকবে।

চোদ্দই অক্টোবর সন্ধ্যের সময়ে রিপোর্টারদের একটা মস্ত দল হানা দিল লৌহ নগরীতে। ফটক বন্ধ। শান্ত্রীরাও যথারীতি দরজা আগলাচ্ছে।

রিপোর্টাররা ভেতরে ঢুকতে না পারলেও একটা খবর বার করে ফেলল। লৌহনগরীর কর্মীরা বিপুল বিপর্যয় সম্বন্ধে তিলমাত্র ওয়াকিবহাল নয়। দৈনন্দিন কার্যসূচী তাই এখনো অব্যাহত। ওভারসিয়াররা অবশ্য ওপরওয়ালাদের কাছে খবর পেয়েছে সামনের শনিবার থেকে পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে। কারণ, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কাণাকড়িও পাঠাচ্ছেনা।

ফলে, রহস্যের মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, তা আরো জটিল আকার ধারণ করল।

হের স্থলৎস যে একমাস আগে অদৃশ্য হয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কারণটা কেউ বলতে পারল না।

কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল স্থলৎসের লৌহ নগরীতে। সর্বময় প্রভুর মর্জি না হলে সেখানে কেউ কিছু করতে পারে না। গোটা শহরটার যাবতীয় কাণ্ডকারখানার ভার পুরো নিজের হাতে রেখে দেওয়ার কুফল হল এই যে উনি যেই উধাও হলেন, কলকব্জার চাকাও অমনি বন্ধ হয়ে এল। সতেরোই সেপ্টেম্বর উনি শেষবারের মত সই করেছিলেন ওঁর আদেশ পত্রে। তেরোই অক্টোবর বজ্রনির্ঘোষের মত খবরটা ফেটে পড়ল পাওনাদারদের কানের কাছে—পেমেণ্ট বন্ধ! স্টালটাটের টাকা ফুরিয়েছে! মাঝের ক'দিন রাশিরাশি চিঠি এসেছে, টাকাকড়ির হিসেব পত্র এসেছে, স্টালটাটের ডাকঘর নিষ্ঠা সহকারে তাড়া বেঁধে সমস্ত কাগজপত্র ফেলে গেছে কেন্দ্রীয় ভবনে। কিন্তু চিঠি খুলবে কে? খোলার অধিকার, পড়ার অধিকার এবং হুকুম দেওয়ার অধিকার তো শুধু হের স্থলৎসের!

স্টালটাট নিয়ে পরিস্থিতি রীতিমত সঙ্গীন এবং বিদঘুটে পর্যায়ে পৌঁছোলো শুধু একটা কারণে, স্টালটাট কারো অধীন নয়—স্বাধীন। স্টালটাট কারো সঙ্গে যুক্ত নয়—স্বয়ং সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এমন নগরীর বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা খাটে না। তবে হ্যাঁ, স্থলৎসের সইকরা কাগজপত্র আছে নিউইয়র্কে এবং তাঁর স্থাবর সম্পত্তির দামও কম নয়। সুতরাং ক্ষতি পূরণ বাবদ কিছু টাকা তুলে নেওয়া যাবে'খন।

কিন্তু আদালতের হুকুমনামা নিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হলে কোন কোর্টে যাবেন ব্যবসাদাররা? স্টালটাট দাঁড়িয়ে আছে নিজের এখতিয়ারে—সেখানকার সব কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন হের স্থলৎস।

কিন্তু এহেন সর্বময় অধীশ্বর সহসা অন্তর্হিত হওয়ায় তাদের কেল্লার মত

নিমেষ মধ্যে ভেঙে পড়ল অতবড় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতায় আর কেউ তো নেই—দ্বিতীয় কেউ নেই হাল ধরবার।

সিংহাসন-শূন্য স্টালটাটের কাজকর্ম বেতাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে—একে একে নিভে যাচ্ছে ফার্নেসগুলো।

শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে পোড় খাওয়া অনেক ঘাটের জল খাওয়া যারা তারা দুর্যোগের ঘনঘটা আঁচ করেই কেটে পড়ল মালপত্র নিয়ে,

পূবে, উত্তরে, দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ল তারা—অচিরে কাজ জুটিয়ে নিল অন্য কারখানায়, অন্য হাপরে, অন্য চুল্লীতে।

কিন্তু সময় থাকতেই চম্পট দিল যারা তাদের দশগুণ লোক আটকে গেল টাকা পয়সার অভাবে। দারিদ্র্য ধরে রাখল তাদের লৌহনগরীর নিরস মৃত্তিকায়। কোটরাগত চক্ষু আর ভাঙা মন নিয়ে পড়ে রইল মাটি আঁকড়ে।

শীর্ণ জীর্ণ দেহে বসে রইল তারা আসন্ন শীতের দুরন্ত প্রকোপের প্রতীক্ষায়

১৬॥ শহর দখল করলেন দুজন ফরাসী

সুলৎস অন্তর্ধান রহস্য পাহাড় সমান ঢেউয়ের মত ফ্রাঙ্কভিল শহরে আছড়ে পড়তেই ম্যাক্স প্রথমেই যা বলল, তা এই :

"নতুন প্যাঁচ নয়তো ?"

প্রতিরক্ষা কমিটি তৎক্ষণাৎ আলোচনা করে ঠিক করল, আরো হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। শত্রুপক্ষ নিশ্চয় নিজেরাই গুজব ছড়াচ্ছে ফ্রাঙ্কভিলের ব্যবস্থা ঢিলে করে দেওয়ার জন্যে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে না। তোড়জোড় যে রকম চলছিল, সেই রকমই চলবে। কিন্তু এরপরেই পর পর খবর বেরোতে লাগল সানফ্রান্সিসকো, নিউইয়র্ক আর শিকাগোর দৈনিকে। স্টালটাট শহরের নাভিশ্বাস উঠেছে ঠিকই। লৌহ নগরীর প্রশাসন তাসের নগরীর মতই ভেঙে পড়ছে। সুলৎস সত্যিই দেউলে হয়ে গেছেন এবং তিনি সত্যিই গা ঢাকা দিয়েছেন।

তাই একদিন ফ্রাঙ্কভিল শহর যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। বিপদ সত্যিই কেটে গেছে। কালান্তকের করাল ভ্রূকুটি এখন অতীতের দুঃস্বপ্ন ছাড় কিছুই নয়।

কাজ ফুরিয়েছে, একথা কিন্তু একবারও মনে হয়নি ম্যাক্সের। স্টালটাট রহস্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বিপদ কেটে গেছে বলে মনে হয় না। রহস্য-তমিস্রার ভেতর পর্যন্ত না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই ম্যাক্সের।

তাই মন স্থির করে ফেলল ম্যাক্স। স্টালটাট এই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং সে ফিরে যাবে স্টালটাটে। শেষ রহস্যের শেষ না দেখা পর্যন্ত ফিরবে না।

ডক্টর সারাসিন পই-পই করে বললেন, কাজটা সহজ নয়, বিপদ পদে পদে রয়েছে। কে জানে কোথায় "মাইন পোঁতা আছে, না জেনে পা দিলেই বিস্ফোরিত হবে। তা ছাড়া হের সুলৎসের যেরকম বর্ণনা ম্যাক্সের মুখে তিনি শুনেছেন, তাতে মনে হয় না মৃত্যুদণ্ড থেকে সবাইকে অব্যাহতি দিয়ে নিজে অদৃশ্য হবেন অথবা একাকী সমাহিত হবেন আপন সুখ স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষের তলায়। হের সুলৎস কোণঠাসা হতে পারেন, হের সুলৎস ভগ্নমনোরথ হতে পারেন—কিন্তু হের সুলৎস এখন মরিয়া। কুটিল ক্রুর পাশবিক চক্রান্তের শেষ না দেখা পর্যন্ত হের সুলৎস হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। মরবার সময়ে হাঙরের যে যন্ত্রণা, হের সুলৎসের যন্ত্রণা তার চাইতে কম নয়।

পরের দিন সকাল বেলা ঝড়ের মত একটা গাড়ী ছুটে গেল নিঝুম গ্রামের মধ্যে দিয়ে। প্রাচীরের সামনে পৌঁছোতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল দুই তরুণ ফরাসি—ম্যাক্স আর অটো।

দুজনেই পণ করেছে রহস্য ছিন্নভিন্ন না করা পর্যন্ত বাড়ী ফিরবে না। দুজনেরই মনে শক্তি, পিঠে অস্ত্র এবং চোখে খরদৃষ্টি।

পাশাপাশি হেঁটে প্রাচীরের পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসতেই ম্যাক্সের সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হল। স্টালটাটে আর মানুষ থাকে না। সবাই পালিয়েছে। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। আজকের এই বলয়াকার পথে মানুষ নেই। শব্দ নেই, কোলাহল নেই। কিন্তু এককালে এখানে পা দিলেই ভেতর থেকে ভেসে আসত গুরু গম্ভীর গর্জন, দেখা যেত শান্ত্রীর বেয়োনেট ঝিলিক, গ্যাসের কুণ্ডলি এবং প্রাণচাঞ্চল্যের বিবিধ স্পন্দন। বিভিন্ন বিভাগের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বিচ্ছুরিত হত আলোকবন্যা। এখন সব তমসাচ্ছন্ন এবং নিস্তব্ধ। সারা শহরটাতে মৃত্যুদূতেরা টহল দিয়ে ফিরছে—এ শহর এখন তাদের রাজধানী। দীর্ঘ চিমনীগুলো যেন অস্থিপঞ্জরময় শহরের অনাবৃত কঙ্কাল। দুই বন্ধুর পদধ্বনির প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসছে—এ ছাড়া নিথর নীরব মৃত্যুপুরীতে নেই আর কোনো শব্দ। এ যেন একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ী—বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত। মরুসম এই জনহীন নির্জনতা সইতে পারল না অটো।

বলল—"অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! কিন্তু এরকম নৈঃশব্দ্য কখনো অনুভব করিনি। ঠিক যেন একটা মহাশ্মশান—প্রকাণ্ড কবরখানা!"

সাতটার সময়ে পরিখার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুই বন্ধু। সামনেই

স্টালটাটের প্রধান তোরণ। আগে যেখানে মানুষ-খুঁটির মত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত শাস্ত্রীরা, এখন সেই স্থান জনশূন্য। জীবন্ত কোনো প্রাণীর চিহ্ন নেই প্রাচীর শীর্ষে। টানাপুল তোলা রয়েছে—পাঁচ ছ গজের মত ফাঁক রয়েছে গেটের সামনে।

ঘণ্টাখানেক লাগল মোটাসোটা একটা দড়ি ছুঁড়ে কাঠের বরগার ওপর দিয়ে গলিয়ে আনতে। দড়ির প্রান্তটা মুঠোয় আনতে হিমসিম খেয়ে গেল দুজনে। অনেক কসরতের পর ম্যাক্সের হাতে এসে গেল দড়ির অপর মুখটা। দড়ি বেয়ে প্রথমেই উঠে গেল অটো, হাতের ওপর ভর দিয়ে পৌছোলো গেটের মাথায়। অস্ত্রশস্ত্র বন্ধুর হাতে চালান করে দিয়ে ম্যাক্স নিজেও দড়ি বেয়ে উঠে গেল অটোর পাশে।

এরপর দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল ফটকের ওদিকে। অস্ত্রশস্ত্র আগে নামিয়ে দেওয়ার পর নিজেরা নেমে গেল সর সর করে।

স্টালটাটে প্রথম প্রবেশের পর বৃত্তাকার এই পথ বেয়ে হাঁটতে হয়েছিল ম্যাক্সকে। এখন অখণ্ড নীরবতা আর নির্জনতায় চুপচাপ রাস্তাঘাট সামনেই বিকট দর্শন কিম্ভূতমূর্তি সৌধসারি। সূর্যালোকে জ্বলছে সহস্র বাতায়ন। যেন রক্ত চক্ষু মেলে মূক গর্জনে ফেটে পড়তে চাইছে প্রাণহীন প্রহরীরা। বলছে—

"তফাৎ যাও! কি চাই এখানে? আমাদের গুপ্তরহস্য নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন?"

শলাপরামর্শ করতে বসল ম্যাক্স আর অটো।

ম্যাক্স বলল—"'O' গেটে হানা দেওয় যাক। ও পথটা আমি বেশী চিনি।"

পশ্চিমদিকে কিছুক্ষণ হাঁটতেই দেখা গেল 'O' গেট। স্মৃতিসৌধের মত সুউচ্চ খিলেন। ওপরে প্রস্তর ফলকে খোদাই করা 'O' অক্ষরটি। লম্বা লম্বা লোহার কাঁটা মারা এক কাঠের পেল্লায় পাল্লা দুটো বন্ধ। একটা বড়সড় পাথর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে দমাদম শব্দে দরজায় বাড়ি মারল ম্যাক্স।

ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে।

আগের মতই ঝামেলা পোহাতে হল আবার। দড়ি ছুঁড়তে হল কাঠের বরগার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। অনেকবার ব্যর্থ হওয়ার পর সার্থক হল মেহনৎ। দড়ি ধরে দুই বন্ধু ওপরে উঠল এবং আগের মতই ওপাশে দড়ি নামিয়ে দিয়ে সড়াৎ করে অবতীর্ণ হল 'O' সেকশনে।

তিতিবিরক্ত হয়ে অটো বললে—"একী জ্বালা! একটা পাঁচিল পেরোতে না পেরোতেই আবার একটা। মেহনৎই সার দেখছি!"

ম্যাক্স বললে—"এই হল আমার পুরোণো কারখানা। চটপট আয়। খুঁজে পেতে কিছু যন্ত্রপাতি আর কয়েক বাণ্ডিল ডিমামাইট জোগাড় না করলেই নয়।

কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু পা দিল বিশাল ঢালাই-ঘরে। ফ্যাক্টরীতে ঢুকেই এই ঘরে প্রথমে কাজ করতে হয়েছিল ম্যাক্সকে।

এখন অবশ্য সেই গমগমে অবস্থা আর নেই। চুল্লীগুলো নিভে গেছে, রেল লাইনে মরচে পড়েছে, অগণিত ফাঁসি কাঠের মত ধূলিধূসর কপিকলগুলো হাত বাড়িয়ে রয়েছে শূন্যে। দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। ম্যাক্স নিজেও বুঝল, গা ছমছমানি কমাতে হল সাত পাঁচ কথা বলা দরকার।

ক্যান্টিন ঘরের দিকে পা চালাতে চালাতে তাই সে বললে—আয়, আরো ভাল কারখানা দেখবি আয়।"

বিনীতভাবে তার পেছন ধরে রইল অটো। মনটা নেচে উঠল রাশি রাশি বোতল দেখে। তাকের ওপর সাজানো লাল, হলদে, সবুজ বোতলের সারি। যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছে বোতল বাহিনী—হুকুম পেলেই মার্চ করবে। কয়েক বাক্স শুকনো মাংস এবং অন্যান্য সুখাদ্যও রয়েছে তাকের ওপর। প্রাতরাশের পক্ষে পর্যাপ্ত, সন্দেহ নেই।

খেতে খেতে ম্যাক্স ভেবে নিলে এর পর কি করতে হবে। খেয়ে নিয়ে দুই বন্ধু এসে পৌঁছোলো দানবিক প্রস্তর-প্রাচীরের সামনে।

শুরু হল ডিনামাইট বসানোর তোড়জোড়। পাঁচিলের তলা সাফ করে তুরপুন দিয়ে সমান্তরাল পরিখা খুঁড়তে হল বেশ কয়েকটা। দুই পাথরের ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে একটা পাথর খসিয়ে আনার পর পরিখাগুলো খোঁড়া হল সেই ফাঁকে। ডিনামাইটগুলো ভেতরে পুরে দিয়ে আগুন দেওয়া হল সলতেতে।

সলতে পুড়তে লাগবে পাঁচ মিনিট। অটোর হাত ধরে ক্যান্টিন ঘরের দিকে দৌড়োলো ম্যাক্স। মাটির নীচে পাথর দিয়ে তৈরী একটা পাতালকুঠরি ছিল সেখানে। দুই বন্ধু আশ্রয় নিল সেখানে।

আচম্বিতে যেন ভূমিকম্প হল। সব কটা বাড়ী, এমন কি পাতাল কুঠরিটাও, কেঁপে উঠল থর থর করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল প্রচণ্ড নির্ঘোষ—যেন অগণিত কামান গর্জে উঠল একসঙ্গে—নৈঃশব্দ্য খানখান করে মহাশূন্যে বুঝি ধেয়ে গেল কানের পর্দা ফাটানো সেই বিস্ফোরণ ধ্বনি!

দু-তিন সেকেণ্ড ধরে যেন বিপুল হিমশিখা খসে পড়তে লাগল পর্বতের গা বেয়ে…তুষারপিণ্ড স্খলনের মত পাথর আর রাবিশ শূন্যপথে ছিটকে গিয়ে পড়ল

দুমদাম শব্দে অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর শোনা গেল আর একটা শব্দের সিরিজ। একটানা শব্দে ভেঙে পড়ছে ছাদ, কড়িবরগা, দেওয়াল, কাঁচের জানলা। সমস্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, আছড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ খণ্ডে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় ধ্বংসের সেই রুদ্র-নিনাদ শুনলে!

শব্দলহরী স্তব্ধ হতেই বন্ধুর হাত ধরে ছুটল ম্যাক্স।

বোমা বিস্ফোরণের পিলে চমকানো ধ্বংসলীলা দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নয় সে। সেদিন কিন্তু তার চক্ষু চড়কগাছ হল ধ্বংসের চেহারা দেখে। অর্ধেক সেকশন বিলকুল উড়ে গিয়েছে। আশপাশের সবকটা কারখানার বিধ্বস্ত দেওয়াল দেখে মনে হল যেন বোমাবর্ষণ ঘটেছে সারা শহরে। চারপাশে কেবল ভাঙা ইট-কাঠ, পাথর, টুকরো টুকরো কাচ পলস্তারা, মেঘের আকারে ধুলোর রাশি আস্তে আস্তে শূন্য হতে নামছে মাটির ওপর। যেন তুষার ঝরছে ঝুর ঝুর করে ধ্বংসস্তূপের ওপর।

ভেতরের পাঁচিলের দিকে দৌড়োলো ম্যাক্স আর অটো।

পনেরো থেকে বিশফুট পর্যন্ত মজবুত পাঁচিল ভেঙে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে। ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অতি-চেনা মস্ত হলঘরটা। বহু একঘেয়ে দিবস কেটেছে এই ঘরে। প্রাক্তন ড্রাফটসম্যানের বহু স্মৃতির কেন্দ্র এই সেই ঘর এখন কিন্তু শাস্ত্রীহীন—প্রহরার চিহ্নমাত্র নেই ধারে-কাছে।

অথচ, একই রকম শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে এখানেও।

একদা যে সব স্টুডিওতে সতীর্থরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল ম্যাক্সের আঁকা নক্সার, এখন সেই স্টুডিওগুলো শোচনীয় হাল দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল সে। এককোণে স্টীমইঞ্জিনের অর্ধেক আঁকা ডিজাইনটা চোখে পড়ল। শেষ করার আগেই ম্যাক্সের তলব পড়েছিল হের স্থলৎসের পার্কে। পড়বার ঘরে বহু-পঠিত বই আর ম্যাগাজিনগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে নিতান্ত অবহেলায়।

হঠাৎ যেন কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। পুরোদমে চলছিল লৌহ নগরীর হৃদ্‌পিণ্ড—আচম্বিতে তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানে যেটি যেভাবে ছিল, পড়ে আছে সেইভাবে!

কেন্দ্রীয় ভবনের ভেতরকার সীমা এসে গিয়েছে। সামনেই খাড়া পাঁচিল। ওপাশে নিশ্চয় সেই সাজানো বাগানটা।

"উড়িয়ে দেব নাকি?" শুধোয় অটো।

"দেবতো বটেই; তার আগে দেখা যাক ছোট খাট দরজা মেলে কিনা। অল্প বারুদেই কাজ সারা যাবে।"

পার্ক পরিবেষ্টিতে প্রাচীর ঘিরে পরিক্রমা শুরু করল দুজনে। মাঝে মাঝে ঘুরে যেতে হচ্ছিল কার্নিশের মত বেরিয়ে থাকা বাড়ী বা বেড়াকে। ঘুরপথে গিয়েও পাঁচিল ঘেঁসে চলতে ছাড়ল না ম্যাক্স। পুরস্কার পাওয়া গেল ক্ষণ-পরেই। ছোট্ট একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল দুই বন্ধু।

দুমিনিটের মধ্যেই কাঠের দরজার তলার দিকে ছেঁদা করে ফেলল অটো। ফুটো দিয়ে ওপাশে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল ম্যাক্সর। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতায় স্নিগ্ধ রৌদ্রালোকিত ঝলমলে কাননটা যেন নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকেই তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে লৌহ নগরীর কেন্দ্রে। চিরন্তন সবুজের চোখ জুড়োনো শোভায় মুগ্ধ হল ম্যাক্স।

"অটো," সহর্ষে বলল ম্যাক্স—"বাকী রইল আর একটা দরজা। সে দরজা উড়িয়ে দিলেই স্থলৎসের খাস কামরা!"

"আরে চ্যা! এ দরজা ভাঙতে ডিনামাইট কেন, পটকাই যথেষ্ট!" বলল অটো।

বলেই, খিড়কির দরজার অপলক পাল্লায় কুঁদোর প্রচণ্ড বাড়ি মারল অটো।

ভাঙন ধরার আগেই চাবি ঘোরানোর শব্দ হল দরজায়। খটাং খটাং শব্দে খুলে গেল দুটো ছিটকিনি।

আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল লোহার শেকলে আটকে রয়েছে পাল্লা দুটো।

ভেসে এল হেঁড়ে গলার হুমকি—"কে যায়?"

১৭॥ রহস্য-নিকেতন

দুজনের কেউই তৈরী ছিল এ জাতীয় প্রশ্নর জন্যে। রাইফেলের গুলি ছুটে এলেও বুঝি এতটা চমকে উঠত না ওরা।

চকিতের মধ্যে কথাগুলো উঁকিদিল ম্যাক্সের মাথায়। জবাব দেওয়ার অবস্থা তখন ওর নেই—দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতের মত।

এবার অসহিষ্ণু হল কর্কশ কণ্ঠ—"কে যায়?"

দরজার ফাঁকে এবার দেখা গেল লাল জুলপী, ঝাঁটার মত গোঁফ, আর নিষ্প্রভ চোখ; দেখেই চিনল ম্যাক্স। হের স্থলৎসের দুই জল্লাদের একজন—সিগিমার।

"আরে! জোহান নাকি!" আহাম্মকের মত আহ্লাদে ফেটে পড়ল

মানুষ-দৈত্য—"জোহান ফিরে এসেছো!" যেন তার ফিরে আসাটা উধাও হওয়ার চাইতে বেশী বিস্ময়কর।

"হের স্থলৎসের সঙ্গে দেখা হবে কী?" শুধোলো ম্যাক্স।

ঘাড় নাড়ল সিগিমার।

বলল "হুকুম নেই। হুকুম ছাড়া ভেতরে আসা নিষেধ।"

"আমি এসেছি, শুধু এই কথাটা তাঁর কানে তুলে দাও। তাহলেই হবে।"

"হের স্থলৎস নেই। হের স্থলৎস চলে গেছেন।" বিষন্ন কণ্ঠে বলল সিগিমার।

"কোথায় গেছেন? কবে আসবেন?"

"জানি না। হুকুম পালটায় নি। অর্ডার ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।"

কথাগুলো কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। এর বেশী কোনো কথাও পেট থেকে বার করা গেল না। প্রশ্ন যাই হোক না কেন, জবাব একই। কাঠ গোঁয়াড় যেন পণ করেছে, প্রাণ যায় যাক, কিন্তু মুখ ফোটানো চলবে না। শেষকালে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল অটোর।

তিরিক্ষে গলায় বললে—"অত জিজ্ঞেস করার কি দরকার? ঢুকে পড়লেই তো হয়।"

বলেই, গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে ভেতরে পা দিতে গেল সে। কিন্তু অসুর-শক্তির সঙ্গে পারবে কেন। তার ওপর, শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে পাল্লা দুটো। কাজেই ঠেলা খেয়ে ছিটকে পড়ল নিজেই এবং মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল সিগিমার।

অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল অটোর। রেগে মেগে চেঁচিয়ে উঠল গলার শির তুলে—"নিশ্চয় আরো অনেকে আছে রাস্কেলটার পেছনে।"

বলেই দরজার ফুটোয় চোখ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে—"আরেকটা দৈত্য।"

"নিশ্চয় আর্মিনিয়াস, সিগিমারের দোসর," বলে দরজায় ফুটোয় চোখ রাখল ম্যাক্স।

এমন সময়ে আকাশ থেকে দৈববাণী হল—

"কে যায়?"

সচমকে মুখ তুলল ম্যাক্স। আর্মিনিয়াসই বটে। মই বেয়ে উঠে গেছে পাঁচিলের মাথায়।

"চিনতে ঠিকই পেরেছো কে আমি," বললে ম্যাক্স। "আর্মিনিয়াস, দরজাটা খুলবে কি না?"

আর্মিনিয়াস জবাব দিল বন্দুক ছুঁড়ে। গুলিটা বেরিয়ে গেল অটোর টুপী ফুটো করে।

"তবে রে!" বলে তৎক্ষণাৎ কয়েকটা ডিনামাইট সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল ম্যাক্স। যেন পাউডার হয়ে মিলিয়ে গেল কাঠের দরজা।

দাঁতের ফাঁকে ছুরি আর ডান হাতে বিভলবার নিয়ে ভাঙা পাচিলের ফাঁকা দিয়ে ছিটকে গেল অটো আর ম্যাক্স।

টলমলে পাঁচিলের গায়ে মইটা ঠেকানো রয়েছে ঠিকই, মইয়ের গোড়ায় রক্তের দাগও রয়েছে—কিন্তু দুই মুশকো ষণ্ডার টিকিও দেখা গেল না ধারে কাছে।

অটো বলে উঠল—"হুঁশিয়ার। নিশ্চয় আড়াল থেকে নজর রেখেছেন। ওরা। ঝোপের মধ্যে দিয়ে গা ঢেকে না এঁগোলে গুলি খেতে হবে কিন্তু!"

তৎক্ষণাৎ দুপাশে সবে গেল দুজনে। রাস্তার দুপাশে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এ গাছ থেকে সে গাছ, এ ঝোপ থেকে সে-ঝোপ—এইভাবে এগিয়ে চলল প্রতিমুহূর্তে গুলিবর্ষণেব আশংকা নিয়ে।

হুঁশিয়াব হয়েছিল বলেই সাক্ষাৎ মৃত্যুব হাত থেকে বেঁচে গেল ম্যাক্স। ম্যাক্স সবে একটা গাছেব আডাল থেকে সরে গেছে—এমন সময়ে শোনা গেল বন্দুক নির্ঘোষ। ছেড়ে আসা গাছেব ছাল উড়ে গেল বুলেটের ঘায়ে।

"শুয়ে পড! শুয়ে পড!" চেঁচিয়ে উঠল অটো।

বলেই, বুকে হেঁটে চলল কাঁটা ঝোপঘেরা চৌকোণা চত্বরের মাঝে বুল টাওয়ারের দিকে। ম্যাক্স অত ঝটপট জমি আশ্রয় করতে পারেনি। ফলে আর একটা বুলেট শন্‌শন্‌ করে বেরিয়ে গেল গা ঘেঁসে। অল্পের জন্যে বেঁচে-গেল সে। চতুর্থ বুলেটটা গিয়ে লাগল পাম গাছের গুঁড়িতে।

হেঁকে বলল অটো—"বাস্কেলগুলো দেখছি একদম আনাড়ির মত বন্দুক চালাচ্ছে!"

"চুপ। চুপ। একতলার জানলা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঐখানেই ঘাপটি মেরে বন্দুক চালাচ্ছে দুই দৈত্য। ঠিক আছে, বুদ্ধির খেলায় দেখি কে হারে কে জেতে।"

বলে, ছুরি দিয়ে গাছের একটা ডাল কেটে চেঁচেছুলে পরিষ্কার করে নিল ম্যাক্স। নিজের টুপী আর কোট পরিয়ে দিল লাঠির মাথায়। ঝোপের মধ্যে লাঠিটা গেঁথে দিতে দেখা গেল শুধু টুপী আর লটপটে হাতাদুটো।

ফিসফিস করে অটোর কানে বলল ম্যাক্স—"জানলা লক্ষ্য করে তুই গুলি চালিয়ে যা। ওরা তোকে নিয়ে ভুলে থাকুক। সেই ফাঁকে আমি পেছন দিক দিয়ে হানা দেব।"

বলে, অটোকে চোরাগুলি ছোঁড়ার ভার দিয়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুটি-গুটি এগিয়ে গেল ম্যাক্স।

কখনো নিজের জায়গা থেকে, কখনো ম্যাক্সের জায়গায় গিয়ে পর-পর গুলি ছুঁড়ে চলল অটো। জানলা ঝাঁঝরা হয়ে গেল তার গুলির ঘায়ে। ম্যাক্সের টুপী আর কোটও আস্ত রইল না। সবশুদ্ধ কুড়িটা বুলেট বিনিময় হবার পর আচমকা থেমে গেল গুলিবর্ষণের শব্দ।

শোনা গেল ভীষণ চীৎকার—"অটো! অটো! শীগগির আয়!" কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে ম্যাক্সের। মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে ছিটকে গিয়ে কাঁটাঝোপ টপকে জানলা দিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল অটো।

দেখল দু'দুটো অজগরের মত পরস্পরকে জড়িয়ে ঘরময় গড়াচ্ছে ম্যাক্স আর সিগিমার। অতর্কিতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ম্যাক্স। গুলি ছোড়বারও সময় দেয়নি সিগিমারকে। ফলে শুরু হল মরণপণ দ্বন্দ্ব। একজনকে মরতে হবেই। সিগিমার অসুর শক্তির অধিকারী। কিন্তু ম্যাক্স অসম্ভব ক্ষিপ্র।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার অবসর ছিল না অটোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই বন্ধুর মিলিত শক্তির কাছে হার মানতে হল সিগিমারকে। দড়ি দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বাঁধার পর অটো শুধোলো—'আর একটা রাস্কেলটা কোথায়?"

আঙুল তুলে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল ম্যাক্স। রক্তাপ্লুত দেহে বেঞ্চির ওপর শুয়ে আছে আমিনিয়াস।

"গুলি লেগেছে নিশ্চয়," বলল ম্যাক্স।

"তা তো বটেই," সায় দিল অটো।

কাছে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেহটা দেখল দুই বন্ধু।

"মারা গেছে দেখছি!" বলল ম্যাক্স।

'আপদ বিদায় হয়েছে।' বলল অটো।

'আমরাই এখন এখানকার একমাত্র মালিক' আয়, আগে হের স্ললৎসের পড়বার ঘরটায় হানা দেওয়া যায়!"

ধ্বস্তাধ্বস্তির ঘর থেকে বেরিয়ে হের স্ললৎসের প্রাইভেট ঘরের দিকে এগোলো দুই বন্ধু। সবাসরি ঘরের মধ্য দিয়ে ওদের যেতে হবে ইস্পাত সম্রাট নিভৃত পবিত্র কক্ষ অভিমুখে।

এক একটা ঘরের এক-একরকম সাজসজ্জা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল অটো। ওর চোখের অবস্থা দেখে হাসছিল ম্যাক্স। একে একে খুলে দিচ্ছিল ঘরের দরজা। ঐশ্বর্য ছড়ানো জমকালো ঘরের বিলাসবৈভব ওর কাছে কিছু নয়। দীর্ঘকাল

এই বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়েছে সে। সবশেষে খুলে ধরল সবুজ আর সোনালী দিয়ে আবৃত চমকপ্রদ কক্ষের দরজা।

অভিনব কিছু দেখতে পাবে, এই আশা নিয়ে দরজা খুলেছিল ম্যাক্স। কিন্তু চক্ষুস্থির হয়ে গেল ঘরের দৃশ্য দেখে।

চিঠি, চিঠি, চিঠি! ঘরময় শুধু চিঠি আর চিঠি! প্যাকেট বাঁধা চিঠি, খামে মোড়া চিঠি, তাড়া বাঁধা চিঠি, পার্শেলের মধ্যে চিঠি! যেন প্যারিস অথবা নিউইয়র্কের জেনারেল পোস্ট অফিস লুঠ হয়ে গিয়েছে। চিঠিপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ঘরময়। সর্বত্র স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে গাদাগাদা চিঠি। চিঠি রয়েছে টেবিলের ওপর, চেয়ারের ওপর, কার্পেটের ওপর। হাঁটু সমান উঁচু চিঠির স্তূপ ঠেলে এগোতে হল দুজনকে। টাকাকড়ির চিঠি, কারখানা সংক্রান্ত চিঠি, ব্যক্তিগত চিঠি। যাবতীয় চিঠি পার্কের লেটার বক্স থেকে রোজ তুলে এনে অনুগত ভৃত্যের মতই দুই অসুর-সাগরেদ ঢেলে দিয়ে গেছে ঘরের মেঝেতে।

কিন্তু কে খুলবে চিঠি? খোলবার লোক তো নেই! তাই কতজনের কত কান্না, কত প্রত্যাশা কত উদ্বেগ থর-থর উৎকণ্ঠা, কত দারিদ্র্য, কত সর্বনাশের কাহিনী হেলায় পড়ে আছে ঘরের সর্বত্র। বাক্যহারা খামগুলো ফ্যালফ্যাল করে যেন চেয়ে আছে। কোটি কোটি টাকার মণি অর্ডার, চেক, ড্রাফট গড়াগড়ি যাচ্ছে অনাদৃত অবস্থায়। খামের বুকে হের স্তুলৎসের নাম আছে—নেই শুধু হের স্তুলৎস!

ম্যাক্স সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে সংক্ষেপে বলল—"চলে আয়। ল্যাবোরেটরীর সিক্রেট দরজা খুঁজি আয়!"

লাইব্রেরীর তাক থেকে বই নামাতে লাগল ম্যাক্স। বইয়ের তাগাড় জমে গেল মেঝের ওপর—কিন্তু র‍্যাকের আড়ালে লুকোনো গুপ্ত দরজার হদিশ পাওয়া গেল না। গোছাগোছা বই টান মেরে ফেলে দিয়েও দেখা গেল না সেই ছোট্ট দরজাটা যার ভেতর দিয়ে একটা সরু গলিপথে ঢুকেছিলেন হের স্তুলৎস ম্যাক্সকে নিয়ে। পাহাড়-প্রমাণ বইয়ের মাঝে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল ম্যাক্স। গেল কোথায় দরজাটা? বইয়ের আড়ালেই তো থাকার কথা। তবে কি হুঁশিয়ার হের স্তুলৎস চম্পট দেওয়ার আগে গুপ্ত দরজা ইট দিয়ে গেঁথে দিয়ে গেছেন? তাঁর অবর্তমানে যাতে কেউ তাঁর গোপন মন্দির তস্করের মত প্রবেশ করতে না পারে, সেই জন্যেই কি সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথটাই মিশিয়ে দিয়েছেন দেওয়ালের সঙ্গে? হয়ত তাই।

কিন্তু আরেকটা দরজা বানিয়েছিলেন নিশ্চয়। গোপন মন্দির থেকে তিনি

নিয়মিত বেরিয়ে এসেছিলেন চিঠিপত্র পড়তে। তাঁর দৈনিক অভ্যেস ছিল চিঠি পড়া এবং সেইমত লৌহ-নগরীকে হুকুমের নিগড়ে বেঁধে রাখা। আর্মিনিয়াস আর সিগিমার রোজই চিঠির তাড়া বয়ে এনে রেখে গেছে এ-ঘরে। রোজই তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন বিবর থেকে। কিন্তু কোন পথে? কোথায় সেই গুপ্ত কপাট?

তবে কি কার্পেটের তলায় চোরা-দরজার সৃষ্টি করেছেন হের স্থলৎস? তাও বা কি করে সম্ভব! কার্পেটের কোথাও তো কাটাকুটির চিহ্ন নেই? নতুন দরজাকে নিশ্চয় তিনি এমনভাবে বানিয়েছেন যাতে কারো কৌতূহলী চোখ তা আবিষ্কার করতে না পারে! কিন্তু গালিচার তলায় কি তা থাকবে? দেখা যাক!

পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে আঁটা ছিল মহামূল্যবান কার্পেটটা। পেরেক খুলে দুই বন্ধু তাকে গুটিয়ে রাখল একপাশে। মেঝে ঠুকেঠুকে পরীক্ষা করা হল। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে লাথি মারা হল—কিন্তু নিরেট মেঝের তলায় গর্ভগৃহ আছে বলে মনেই হল না।

তিরিক্ষে মেজাজে অটো বললে—"গোপন ঘর আছে তুই জানলি কি করে?"

"আমি?" হেসে উঠল ম্যাক্স এত দুঃখেও। "আমি জানবো না তো কে জানবে?"

"তাহলে ছাদটাই এবার টেনে নামানো যাক," রেগে গিয়ে বলল অটো। "সবই তো দেখা গেল, বাকী আছে কড়িকাঠগুলো। হেঁইও!"

বলতে বলতে চেয়ারে লাফিয়ে উঠে ঝাড়বাতির ডাণ্ডা ধরে টান মেরেছিল অটো, ওর উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় মাঝের গোলাপটা রিভলবারের কুঁদো দিয়ে ঠুকে দেখার। কিন্তু তার আর দরকার হল না।

ঝকমকে ঝাড়বাতি চেপে ধরতে না ধরতেই তা সড়সড় করে নেমে এল নীচের দিকে, দুহাট হয়ে খুলে ঝুলে পড়ল ঘরের সিলিং এবং একটা হাল্কা স্বয়ং-ক্রিয় ইস্পাতের মই নিঃশব্দে নেমে এসে ঠেকল মেঝেতে!

নীরবে যেন দুই বন্ধুকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে ধাতুর সোপান। উঠে এসো, উঠে এসো হে ডানপিটের দল! আমার বুকে পা দিয়ে দেখে এসো হের স্থলৎসের রহস্যনিকেতনের কাণ্ডকারখানা!

নিমেষ মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে মইয়ের ধাপে পা দিল ম্যাক্স। পেছনে অটো।

১৮ ॥ রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু

স্টীল মইয়ের ডগা গিয়ে ঠেকেছে একটা গোলঘরের দেওয়ালে। মস্ত ঘর! রন্ধ্রহীন বাতায়নহীন। দেওয়ালের গায়ে ফোকরে লাগানো মইটি ছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। বন্ধঘরে নিরন্ধ্র তমিস্রা বিরাজ করাই উচিত ছিল। কিন্তু তা তো নয়, গোলঘরে ভাসছে যেন জ্যোৎস্নালোক; শুক্লপক্ষের চাঁদের মোলায়েম কিরণে মায়াময় মনে হচ্ছে ঘরের পরিবেশ। মোমের আলোর মত নরম আলোর উৎস কিন্তু মেঝের একটা কাঁচ-ঢাকা ফোকর। খুবই পুরু কাঁচ। লেন্সের মত গড়ন। আকাশের চাঁদ যেন মেঝেতে শুয়ে সুষমা বিলিয়ে চলেছে রহস্যবিবরে।

নিশ্ছিদ্র নীরবতায় থমথম করছে ঘরটা। দেওয়ালগুলো যেন বোবা বিস্ময়ে চক্ষুহীন দৃষ্টি মেলে দেখছে আগন্তুকদের। এ তো ঘর নয়—যেন সমাধিমন্দির। শব্দজগৎ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

পুরু কাঁচটার ওপর ঝুঁকে পডবার আগে থমকে দাঁড়াল ম্যাক্স। মনের মধ্যে সেকী আলোড়ন! এত বছরের প্রতীক্ষা তার সফল হয়েছে! যে রহস্য মুঠোয় আনতে বসেছিল স্টালটাট শহরে, আজ তার দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছে সে!

মনটা ঈষৎ শান্ত হতেই অটোকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল ম্যাক্স—দৃষ্টি নিক্ষেপ করল নীচের কক্ষে।

চক্ষু বিস্ফারিত হল একটা অতি-ভয়াবহ অতি-অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে!

কাঁচের চাকতি আসলে একটা আতস কাঁচ। কনভেক্স লেন্স। মাঝে, পুরু, কিনারায় পাতলা। ফলে, লেন্সের মধ্যে মধ্য দিয়ে বিবর্ধিত আকারে চোখে পড়ছে নীচের দৃশ্য। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে অন্যজগতের রহস্য দেখছে দুই বন্ধু।

সেকী দৃশ্য! বিহ্বল চক্ষু বিস্ফারিত হল, হৃদপিণ্ড বুঝি থমকে দাঁড়াল, রুধির স্রোত যেন গতি হারালো।

চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে হের স্লুৎস্কের গোপন ল্যাবোরেটরী—গুপ্ত গবেষণা মন্দির প্রকোষ্ঠের ঠিক মাঝখানে তখনও তীব্র আলোক বিকিরণ করে চলেছে একটা ইলেকট্রিক লণ্ঠন, ভল্টা আবিষ্কৃত 'পাইল' য়ের দৌলতে বিরামবিহীনভাবে জ্বলে চলেছে বায়ুহীন গোলকের বিদ্যুৎবাতি; সেই আলোই আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে লাইট হাউসের আলোক-বন্যার মত ঠিকরে আসছে ওপরকার গোলঘরে।

গোলক-প্রকোষ্ঠের ঠিক মাঝখানে নিথর নিস্পন্দদেহে বসে রয়েছে একটা মনুষ্যমূর্তি। লেন্সের প্রতিসরণের কারচুপিতে বিপুলভাবে বিবর্ধিত মার্বেল স্ট্যাচুর মত মনে হচ্ছে দেহটিকে।

আশেপাশে ছড়িয়ে আছে কামানের গোলার ভাঙা টুকরো।

না, কোন সন্দেহ নেই, হের স্থলৎসই বটে। ওরকম বিকট বীভৎস দাঁত খিঁচুনি হের স্থলৎস ছাড়া অন্য কোনো মানবের মুখে দেখা যায়নি। ওরকম ঝকঝকে দাঁতের সারি হের স্থলৎস ছাড়া কারো মুখবিবরে শোভিত হয় নি। কিন্তু এ হের স্থলৎস যেন মানুষ হের স্থলৎস নন—অসুর হের স্থলৎস। লেন্সের দৌলতে দেখা যাচ্ছে দৈত্যাকার হের স্থলৎস শ্বাসরুদ্ধ তুহিন কঠিন প্রাণহীন দেহ নিয়ে বসে আছেন সিংহাসনে অনন্তকালের জন্য। হের স্থলৎস মরে কাঠ হয়ে গিয়েছেন নিজেরই আবিষ্কারের বিস্ফোরণে। প্রলয়ংকর গোলা আপনা হতেই ফেটে গিয়েছে, নিমেষমধ্যে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং হের স্থলৎসকে ম্যমী বানিয়েছে নিদারুণ শৈত্যের মধ্যে নিমজ্জমান রেখে।

কলম নিয়ে টেবিলে বসে আছেন ইস্পাত-সম্রাট। লেন্সের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে যেন বর্শা বাগিয়ে বসে আছেন রাক্ষস হের স্থলৎস। বিস্ফারিত চোখের ঝকঝকে চক্ষু-গোলক আর আড়ষ্ট মুখের জন্যেই শুধু বোঝা যায় ওদেহ এখন নিস্প্রাণ। নইলে মনে হত উনি এখনও জীবিত এবং লিখতে লিখতে ক্ষণেকের জন্যে জিরিয়ে নিচ্ছেন। মাসাধিককাল তুহিন কঠিন অবস্থায় দেহটা পড়ে আছে রক্তহীন বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে প্রখর, ঔজ্জ্বল্যের মাঝে—মেরু অঞ্চলের হিমবাহর মধ্যে থেকে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ-হাতীর মতই সহসা বুঝি আবির্ভূত হলেন বিকটরূপ ধারণ করে। ঘরের সবকিছুই ধারণাতীত শৈত্যপ্রবাহে জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। কাঁচের জারে কেমিক্যাল, বোতলের জল, থার্মোমিটারের পারদ—সমস্ত।

এ-হেন বীভৎস দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও হৃষ্ট না হয়ে পারল না ম্যাক্স। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন বলেই অদৃষ্টপূর্ব এই দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন কাঁচের বাইরে থেকে। কাঁচের ঢাকনি যদি না থাকত, দুইবন্ধু গোপন প্রকোষ্ঠে পা দিত নিশ্চয়ই। আর ফিরতে হত না। শৈত্য ওদেরও জমিয়ে ম্যমী বানিয়ে ফেলত কিছু বোঝবার আগেই।

মেঝের ওপর ছড়ানো কাঁচের ভাঙা টুকরো দেখেই ম্যাক্স আঁচ করে নিল কি ঘটেছিল এক মাস আগে। হের স্থলৎস তরল কার্বন-ডায়-অক্সাইড ভরে রাখতেন কাঁচের আধারে। ভেতরের প্রচণ্ড চাপে যাতে ভেঙে না যায়, তাই সাধারণ কাঁচের চাইতে দশ-বারো গুণ মজবুত কাঁচ দিয়ে বানানো হত এই কাঁচের খোলস। এ-হেন মারণ-যন্ত্রেও ছিল একটা মস্ত ত্রুটি—সেটা তাঁর

আবিষ্কারের গলদ। কাঁচের খোলসটি কখন কিভাবে যে ফেটে যাবে, তা জানবার বা রোধ করার কোনো উপায় ছিল না। রহস্যজনক কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে সুকঠিন স্ফটিক শতচূর্ণ হয়ে প্রলয় ডেকে আনবে—হের স্থলৎস নিজেও তা জানতেন না। হয়েছেও তাই। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, কাঁচের খোলস ফেটে গিয়েছে। হয়ত বাতাসের চাপের বহুগুণ বেশী চাপ দিয়ে কার্বন-ডায় অক্সাইডকে তরল অবস্থায় ভেতরে ভরে রাখার জন্যেই কাঁচ সে চাপ সইতে পারেনি। মুহূর্তের মধ্যে তা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে এবং শূন্য তাপাংকের একশ ডিগ্রী নীচে নেমে গিয়ে জমিয়ে দিয়েছে নরপিশাচ প্রফেসরকে।

একেই বলে নিয়তির মার, দুনিয়ার বার!

ম্যাক্স কিন্তু লক্ষ্য করল, মারবার সময়ে কি যেন লিখছিলেন ইস্পাত-সম্রাট। নিষ্প্রাণ হাতের তলায় চাপা কাগজে কি লেখা আছে জানার জন্যে উদগ্রীব হল মনটা। মহাপাষণ্ড হের স্থলৎসের মরণকালীন চিন্তা জানতে কার না ইচ্ছে হয়? কে না দেখতে চায় তার শেষ লেখার স্বরূপ?

কিন্তু কাগজটাকে তুলে আনা তো সম্ভব নয়। কাচ ভেঙে ঘরে নামার কথা ভাবাও যায় না। পলক ফেলার আগেই তেড়ে বেরিয়ে আসবে মারণ গ্যাস এবং জীবন্ত প্রাণীর শ্বাসরোধ করবে চকিতের মধ্যে। নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে বোকার মত প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তো যায় না। হের স্থলৎসের হাতের লেখা চিনত ম্যাক্স। তাই দূর থেকেই দেখার চেষ্টা করল কি লিখেছেন শয়তান শিরোমণি। কনভেক্স লেন্সের বিবর্ধন ক্ষমতার গুণে ক্ষুদে ক্ষুদে হরফগুলোও বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। পড়তে অসুবিধে হল না।

হের স্থলৎস কখনো নির্দেশ দিতেন না—আদেশ জারী করতেন। তাঁর শেষ আদেশটা এই:

"আমার আদেশ, পনেরো দিনের মধ্যে ফ্রাঙ্কভিলের বিরুদ্ধে যেন অভিযান শুরু করা হয়। হাতে পাওয়া মাত্র আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতি মাফিক জোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ করুন—এবার আর ভুল হবে না। কেউ প্রাণে বাঁচবে না। যা-যা বলেছি, তার একচুলও হেরফের যেন না ঘটে। আমার ইচ্ছে এক পক্ষকালের মধ্যে ফ্রাঙ্কভিল শহর মৃতের শহরে পরিণত হবে—জীবিত প্রাণী একজনও থাকবে না।

"ডক্টর সারাসিন আর ম্যাক্স ব্রাকম্যানের লাশ দুটো আমার চাই—পাঠিয়ে দেবেন। "স্থলৎস—"

সইটা আধা খ্যাঁচড়া। শেষের টান টেনেও শেষ করে উঠতে পারেন নি। যেন এক অশুভ অপদেবতা শরীরী বিভীষিকা হয়ে নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা

করেছে পায়ের তলায় কক্ষে, এমনিভাবে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওরা—বোবার মত অসাড় রইল জিহ্বা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত অবশ রইল দেহ।

কিন্তু আর তো দেরী করা যায় না। রক্ত হিম করা এই দৃশ্যকে পেছনে ফেলে এবার তো যেতে হয়। মনের মধ্যে বিপুল দ্বন্দ্ব নিয়ে দুই বন্ধু স্তম্ভিত বিস্ময়ে নেমে এল গোলঘর থেকে ইস্পাতের মই বেয়ে।

আলোর উৎস একসময়ে নিঃশেষিত হবে, নিভে যাবে ইলেকট্রিক লণ্ঠন, ফুরিয়ে যাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ—চিরকালের অন্ধকার সেইদিন থেকে ঘিরে ধরবে হের স্থলৎসের নশ্বর দেহকে। অন্ধকারের রাজত্বে একাকী অধিষ্ঠিত থাকবেন ইস্পাত-সম্রাট যুগ যুগ ধরে—যেভাবে দুহাজার বছর ম্যমীরূপে সমাধিগৃহ পাহারা দিচ্ছেন মিশরের ফারাওরা! হাজার বছরেও ধূলির সঙ্গে বিলীন হয় নি তাঁদের দেহ—হবে না ইস্পাত-সম্রাটেরও!

ঘণ্টাখানেক পরে বাঁধন খুলে দেওয়া হল সিগিমারের। বন্ধনমুক্ত জল্লাদ বিমূঢ় চোখে শুধু চেয়ে রইল। স্বাধীন সে। কিন্তু কি করবে এই স্বাধীনতা নিয়ে, তা সে জানে না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ফ্রাঙ্কভিলে ফিরে এল দুই বন্ধু।

হাসল না ম্যাক্স। গম্ভীরমুখে শুধু বলল—"স্টালটাটের খবর শুনে আপনার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, আপনি নিরুদ্বিগ্ন হবেন। হের স্থলৎস মারা গেছেন।"

"যে গোলা ফাটিয়ে আমাদের নিকেশ করার হুকুমনামায় উনি সই দিচ্ছিলেন, সেই গোলাই নিজে থেকে ফেটে গিয়ে ওঁকে নিকেশ করেছে সই শেষ হওয়ার আগেই! অর্ডারটা আমি নকল করে এনেছি। শুনুন।"

একটানা কথাগুলো বলে একটু থামল ম্যাক্স। তারপর বলল থেমে থেমে—"ডক্টর, হের স্থলৎসের জীবিত উত্তরাধিকারী শুধু একজনই—আপনি। আমাকে এ-দায়িত্ব দিন। শিল্প-নগরীর পুণর্জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করার সুযোগ দিন।'

১৯॥ শেষ কথা

ফ্রাঙ্কভিল শহর দ্রুত এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে। অনাবিল শান্তি ফিরে এসেছে নাগরিকদের অন্তরে। সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থায় সকলেই সুখী এবং সমৃদ্ধ। ফ্রাঙ্কভিল তার প্রাপ্য পেয়েছে, সুতরাং ঈর্ষা-বিদ্বেষের অবকাশ নেই। ফ্রাঙ্কভিল সামরিক শক্তিতেও শক্তিমান, সুতরাং যুদ্ধের সম্ভাবনাও আর নেই।

হের স্থলৎসের লৌহ-শাসনে অতি-ভয়ংকর হাতিয়ার-কারখানার রূপ নিয়েছিল স্টালটাট শহর। ধ্বংসই ছিল সেখানকার মূলমন্ত্র। কিন্তু ম্যাক্স ব্রাকমানের আপ্রাণ চেষ্টায় স্টালটাট এখন ঋণমুক্ত এবং আদর্শ শিল্প-নগরী। এ-শহরের উৎপাদন ব্যবস্থাকে টেক্কা মারবার যোগ্যতা বিশ্বের কারো নেই।

এক বছর হল জানেটের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে ম্যাক্সের। এই সেদিন-সন্তানের মা হয়েছে জানেট।

উইলহেম স্টোরিজ-এর গুপ্তরহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

'মাই ডিয়ার হেনরী, ঝটপট চলে এস। পথ চেয়ে আছি তোমার আসার। তাছাড়া, জায়গাটাও তো ভাল। মন মাতানো। এ-জেলায় এমন অনেক সম্পদ আছে, যা যে কোনো ইঞ্জিনীয়ারকে কাছে টানতে পারে। শুধু এই দিক দিয়েই যদি বিচার করো, তাহলে তো বলবো পথ-কষ্টর জন্যে তোমাকে মোটেই পস্তাতে হবে না।

তোমার একান্ত আপনজন

'মার্ক ভাইডাল'

চিঠির সমাপ্তিটা এইরকমই। এ চিঠি পেয়েছিলাম ১৭৫৭ সালের চৌঠা এপ্রিল। লিখেছে আমার সহোদর ভাই।

এমন একটা চিঠি যে আসবে, সেরকম কোনো হুঁশিয়ারি আগেভাগে পাইনি। আমার খাস চাকর রুপোর রেকাবীতে চিঠি এনে ধরেছে আমার সামনে।

চিঠি খোলার সময়ে আমি শান্ত ছিলাম। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েওছিলাম শান্তভাবে। শেষ ক'টি লাইন পড়বার সময়েও চিড় খায়নি আমার অটল প্রশান্তিতে। অথচ এই শেষ ক'টি লাইনেই ছিল অসাধারণ সেই কাণ্ডকারখানার অঙ্কুর যার মধ্যে কিনা দুদিন পরে আমি নিজেই জড়িয়ে পড়তে চলেছিলাম ওতপ্রোতভাবে।

কিন্তু এরকম উদ্ভট অদ্ভুত কাহিনী বিশ্বাস করার মত মানুষ আছে তো? দুরন্ত কবি-কল্পনাতেও যে এ-কাহিনী আসে না?

যাকগে, কপাল ঠুকে লেগে যাই! বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি!

আমার ভায়া মার্কের বয়স তখন আটাশ। ঐ বয়েসেই যে-কোনো মানুষকে সামনে বসিয়ে তার ছবি এঁকে ফেলার চিত্রকর হিসেবে বেশ নাম করেছে। আমাদের দু'ভায়ের মধ্যেকার সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর। আমার চাইতে আট বছরের ছোট। খুব কম বয়েসেই বাপ-মাকে হারিয়েছিলাম। ছোট ভাইয়ের শিক্ষাদীক্ষার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল তখন থেকেই। ঐ বয়েসেই ওর ছবি আঁকার দারুণ ঝোঁক দেখে ঐদিকেই উৎসাহ দিয়েছিলাম

ফল তো দেখাই যাচ্ছে। নাম-ডাক-পশার সবই ও পাবে ছবি আঁকার লাইনেই।

কিছুদিন হল বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে মার্ক। দক্ষিণ হাঙ্গারীতে 'রাগ' শহরটা বিলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু দিন এই শহরেই ডেরা নিয়েছিল মার্ক। বুদাপেস্তে হপ্তাকয়েক কাটিয়েছিল খানকয়েক ছবি আঁকার জন্যে। প্রতিটি ছবিই উত্‌রেছে এবং দু'পয়সা এনেছে। নামডাকও হয়েছে।

'রাগ' শহরের বনেদী পরিবারদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ডক্টর রোডরিথ-এর। হাঙ্গারীর যে কজন দারুণ নামী চিকিৎসকের নাম আঙুলে গোনা যায়, ইনি তাঁদের একজন। বাপপিতামহের বিপুল সম্পদ তো ছিলই। সেই সঙ্গে অর্জন করেছেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা স্রেফ ডাক্তারী করে। ফি-বছরেই বেড়াতে বেরোতেন ডাক্তার। সেই সময়ে টাকার কুমীর অথচ পঙ্গু রুগীরা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতো তাঁর ফিরে আসার জন্যে। শুধু টাকার কুমীর কেন, ফকির যারা, তারাও মুষড়ে থাকত তিনি না থাকলে। কারণ রুগীর পকেটে কানাকড়িও না থাকলেও বিমুখ করতেন না ডাক্তারবাবু।

স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা নিয়ে ডাক্তারের সংসার। ছেলের নাম ক্যাপটেন হারালান। মেয়ের নাম মায়রা। ডাক্তার-ভবনে যতবার গেছে মার্ক, ততবারই মায়রার রূপলাবণ্যে মাথা ঘুরে গেছে। আপ্যায়ণেও ত্রুটি হয় নি কোনোদিন। ফলে, 'রাগ' শহর ছেড়ে আর বেরোতে পারছিল না বেচারী। অবশ্য মায়রা যেমন মাথা ঘুরিয়েছে মার্কের, মার্কও তেমনি মাথা ঘুরিয়েছিল মায়রার। ঘোরাটাও আশ্চর্য নয়। মার্কের মত দিব্যকান্তি যুবক তো বিরল। মাথায় না-ঢ্যাঙা না-বেঁটে। টলটলে নীল-নীল চোখে প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার লেগেই আছে। চেস্টনাট-রঙীন একমাথা চুল। কবি-কবি কপাল। মানুষ হিসেবেও খুব মিশুকে। আলাপ জমাতে সিদ্ধহস্ত। স্বভাবটা শিল্পীজনোচিত। একমাত্র পাগলামি হল রূপ-সাধনা। শিল্পীর মন যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তাই।

মায়রাকে দেখবার জন্যে আমি নিজেই ছটফটিয়ে মরছিলাম। ভায়াও আমার সঙ্গে মায়রার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে ছটফট করছিল। বরকর্তা হিসেবে যেন ঝটপট চলে আসি 'রাগ' শহরে। একমাসের আগে শহর ছেড়ে নড়তে দেওয়া হবে না আমাকে। আমি পৌঁছোলেই বিয়ের দিন ঠিক করা হবে। কিন্তু তার আগে মায়রা নিজের চোখে দেখতে চায় তার ভাবী ভাশুরকে—কেননা ভাশুর সম্পর্কে তার ধারণা নাকি আকাশ ছোঁয়া!

মার্কের উৎসাহপূর্ণ চিঠিপত্র থেকেই মায়ার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার জেনেছিলাম। তার চাইতেও ভালো হত যদি ভায়া তার প্রেয়সীকে মডেল

করে একটা ছবি এঁকে ফেলত। ভায়া নিজে শিল্পী। ভুবনমোহিনী 'পোজ' দিয়ে বসত মায়রা। ভারী সুন্দর পোশাকে ঘেরা থাকত বরতনু। তারপর সেই রূপ ক্যানভাস কি নিদেনপক্ষে কাগজে তুলির নিপুণ কয়েকটা আঁচড়ে ফুটিয়ে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে মায়রার মরি-মরি রূপ নিয়ে মনে মনে আরো তারিফ করতে পারতাম।

কিন্তু মায়রা নাকি রাজি হয় নি। মার্ক লিখেছিল, মায়রার ইচ্ছে নাকি সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখ কপালে তুলে দেওয়ার।

ঠিক করলাম, খানিকটা পথ যাবো চাকাঅলা গাড়িতে। বাকীটা জলযানে চেপে। ফেরবার পথে ফের চাকাঅলা গাড়ীতে। যে ভাবেই যাই না কেন, নদীর মনভোলানো দৃশ্য চোখে পড়বেই।

যেদিন রওনা হব, সেইদিন মানে, তেরোই এপ্রিল সন্ধ্যে নাগাদ পুলিশ-লেফটেন্যান্টের আপিসে গেলাম বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এবং সেইসঙ্গে আমার পাশপোর্টটা আনতে। পুলিশ লেফটেন্যান্ট আমার বন্ধু মানুষ। পাশপোর্ট দিয়ে তিনি তো সহস্রমুখে তারিফ করলেন আমার ভায়ার। ভায়াকে উনি আগেভাগেই চিনতেন!

'মাই ডিয়ার ভাইডাল, মার্ককে আমার শুভেচ্ছা জানিও। ওদের সুখশান্তি দেখে যেন বুক ফেটে যায় হিংসুকদের। তবে কি জানো' একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন আমার বন্ধু—'বলাটা হয়ত ঠিক নয় আমার পক্ষে···কিন্তু—'

'কি এমন কথা যা বলা যায় না আমাকে?' আমি তো অবাক বন্ধুর য়ানাইপানাই শুনে।

'মার্ক বুঝি লেখেনি 'বাগ' পৌঁছোনোর মাস কয়েক আগে—'

'বাগ' পৌঁছোনোর মাস কয়েক আগে···?' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

'শ্রীমতি মায়রা ওহে ভাইডাল, আমার তো মনে হয় তোমার ভায়া খবরটা জানত না।'

'হে বন্ধু, খুলে বলো। কি যে বলতে চাইছ, ধরতে পারছি না।'

'শ্রীমতি মায়রা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সুতরাং বিয়ের বাজারে তার পাত্রর অভাব হবে না, এ আর আশ্চয কি। তবে কি জানো, এই সেদিন যে লোকটা ঘুর-ঘুর করেছে শ্রীমতির বাড়ীতে জামাই হবার বাসনা নিয়ে, সে-লোক বিশেষ সুবিধের নয়। নাম করার মত লোক নয়। এইটুকুই শুনলাম বন্ধু অফিসারের মুখে। ঘটনাটা ঘটেছে হপ্তাপাঁচেক আগে। তখন উনি বুদাপেস্তে।'

'লোকটার বৃত্তান্ত আগে বলো দিকি।'

'ডক্টর রোডরিখ তাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে বাকী রেখেছেন।'

'তাহলে তো ল্যাটা চুকে গেল। জানিনা মার্ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীর খবর রাখে কিনা। রাখলেও যখন আমাকে লেখেনি, তখন বুঝতে হবে এ-নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'তা ঠিক। তবে কি জানো, শ্রীমতি মায়রার পাণিপ্রার্থী লোকটার গুণের তো ঘাট নেই। তাই 'রাগ' শহরে এ-নিয়ে দারুণ কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই জিনিসটা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামানোর দরকার নেই, এমন কথা বলতে পারছি না হে ভাইডাল।'

'যাই হোক, হুঁশিয়ার করে দিয়ে ভালই করলে। গুজবে কান দিতে নেই।'

'না, হে, না, খবরটা দারুণ সিরিয়াস।'

'কিন্তু বিষয়টা তো নয়। মোদ্দাকথা হল সেইটা।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম—'ভালো কথা, অফিসারের কাছে গলাধাক্কা খাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর নামটা শুনেছো?'

'শুনেছি বই কি।'

'কি নাম?'

'উইলহেম স্টোরিজ।'

'উইলহেম স্টোরিজ? কেমিস্ট না বলে যাকে অ্যালকেমিস্ট বলা উচিত, তাঁর ছেলে?'

'ঠিক ধরেছো।'

'বলো কি! এ নামের ডাকেই যে গগন ফাটে। মহাপণ্ডিত মানুষ: কম আবিষ্কার করেন নি।'

'শুধু তাই নয়। জার্মানদের গর্ব ইনি।'

'মারা গেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। বছর কয়েক আগে দেহ রেখেছেন। কিন্তু গুণধর পুত্রটি এখনো বেঁচে। খবর যা পেয়েছি, মাই ডিয়ার ভাইডাল, উইলহেম স্টোরিজ লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।'

'সুবিধের নয় বলতে কি বলতে চাইছ, বুঝছি না।'

'কি করে বোঝাবো নিজেই জানি না। আমার অফিসার বন্ধুটির কথা তুলে বলতে গেলে বলতে হয়, উইলহেম স্টোরিজ নাকি আর পাঁচটা লোকের মত নয়।'

'তাই নাকি!' ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলাম না—'শুনেই তো দেখতে ইচ্ছে করছে! ভারী ইন্টারেস্টিং তো! প্রেমে জর-জর বোকা

পাঁঠাটার নিশ্চয় খানতিনেক পা, খানচারেক হাত, আর গোটাছয়েক অনুভূতি আছে? না কি বলো?'

হেসে ফেলল বন্ধুবর—'আর পাঁচটা লোকের মত নয় বলতে অনেক কিছুই বোঝায় ঠিকই। তবে আমার মনে হয়, তফাৎটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়—মনের গড়নে। অফিসারের কথার ধরন ছিল তাই। কাজেই একটু সাবধান থাকলে ক্ষতি নেই।'

'আলবৎ সাবধান থাকব—যদ্দিন না শ্রীমতি মায়রা রোডরিখ শ্রীমতি মার্ক ভাইডাল হচ্ছে, তদ্দিন চোখকান সজাগ রাখলেই হল।'

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। পুলিশ লেফটেন্যান্টের সঙ্গে করমর্দন করে বাড়ী রওনা হলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৩ই এপ্রিল প্যারিস থেকে রওনা হলাম আমি। সকাল সাতটায় উঠে বসলাম গাড়ীতে। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী। কিছুদূর অন্তর বেদম ঘোড়া পালটে নতুন ঘোড়া নেওয়া হবে। দশ দিনেই পৌঁছে যাব অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে।

দেশ দেখতে দেখতে এক সময়ে পৌঁছোলাম বুদাপেস্তে। কয়েকটা দিন রইলাম সেখানে। যেদিন রওনা হব বুদাপেস্ত ছেড়ে, তার আগের দিন সন্ধ্যার দিকে জিবোনোর জন্যে এলাম একটা বেশ বড়দরের হোটেলে। সাদারঙের দিশি মদ খাচ্ছি তারিয়ে তারিয়ে, এমন সময়ে চোখে পড়ল একটা খোলা খবরের কাগজের পাতায়। কিছু না ভেবেই তুলে নিয়েছিলাম কাগজটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ আটকে গেল দুটি শব্দের ওপর। মোটামোটা বড়সড় গথিক টাইপে ছাপা দুটি শব্দ:

স্টোরিজ বার্ষিকী

এই নামটাই না শুনেছিলাম পুলিশ লেফটেন্যান্টের মুখে। ইনিই তো সেই বিখ্যাত জার্মান অ্যালকেমিস্ট যিনি মায়রা রোডরিখের পাণিপ্রার্থীও বটে? না, কোনো সন্দেহই নেই।

এক নিঃশ্বাসে যা পড়লুম, তা এই:

'আর হপ্তা তিনেকের মধ্যে পঁচিশে মে অটো স্টোরিজ-এর বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হবে স্প্রেমবার্গে। এই উপলক্ষ্যে বিপুল জনসমাবেশ আশা করা যাচ্ছে তাঁর জন্মস্থানে— মহাপণ্ডিতের সমাধিস্থানও এই অঞ্চলে।

'অসাধারণ এই ব্যক্তির কীর্তিকাহিনী কারও অজ্ঞাত নয়। এঁর অদ্ভুত কীর্তি, বিস্ময়কর আবিষ্কার বিখ্যাত করেছে সারা জার্মানকে, সেই সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে।'

প্রবন্ধ লেখক বাড়িয়ে বলেন নি। অটো স্টোরিজ বার্ষিকী এমনি ভাবেই উদ্‌যাপিত হয় বৈজ্ঞানিক মহলে। কিন্তু এরপর প্রাবন্ধিক যা লিখেছেন, তা নতুন ভাবনার খোরাক জোগালো আমাকে।

'সকলেই জানেন, অটো স্টোরিজ-এর জীবিতকালে তাঁকে জাদুকর মনে করা হত। অবশ্য এ ধারণা যাঁদের মনে ছিল, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারেও তাঁরা খুব বিশ্বাসী ছিলেন। দু-এক শতাব্দী আগে হলে এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হত এবং সাজা দেওয়া হত বাজার অঞ্চলের খোলা চত্বরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যেত পারে যে মৃত্যুর পর অটো স্টোরিজ সম্বন্ধে এই ধারণা অধিকতর দৃঢ়মূল হয়েছে এমন অনেকের মগজে যাঁরা অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলো বিশ্বাস করেন খুবই। তাই তাঁদের কাছে অটো স্টোরিজ কেবল জাদুবিদ্যায় জাদুকরই নন, কুহক মন্ত্রের গুনিন এবং অতি-মানবিক ক্ষমতার অধিকারী। অটো স্টোরিজ তাঁর মন্ত্রবিদ্যা এবং অলৌকিক ক্ষমতার গুপ্তরহস্য কাউকে দিয়ে যাননি। তাই ওঁর গুণমুগ্ধ ভক্তগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত। গুপ্তরহস্য নিয়ে কবরে শয়ান অবস্থাতেও অটো স্টোরিজ কিন্তু ওঁর ভক্তবৃন্দের কাছে ইহুদি তান্ত্রিক, মন্ত্রবৈদ্য ম্যাজিসিয়ান এবং পিশাচ-সিদ্ধ গুরু হিসেবে অমর থাকবেন চিরকাল।'

খবরটা পড়তে পড়তে যে যাই ভাবুক না কেন, আমি ভাবলাম শুধু একটা ঘটনা। ভাগ্যিস ডক্টর রোডরিখ অটো স্টোরিজ-এর ছেলেকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন। তা যদি না হত, তাহলে খবর পড়তে পড়তেই হাত-পা হিম হয়ে আসত আমার।

প্রবন্ধের শেষ অংশ শেষ হয়েছে এইভাবে :

'কাজেই গোরস্থানে যে কাতারে কাতারে লোক আসবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সব বার্ষিকী উৎসবে যা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। অটো স্টোরিজ-এর প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা তো নেহাৎ কম নয়। এঁদের মনের পর্দায় অটো স্টোরিজ আজও বেঁচে আছেন তাঁর অদ্ভুতুড়ে কীর্তিকলাপ

নিয়ে। অটো স্টোরিজ বলতে এঁরা এখনও অজ্ঞান। এই পরিস্থিতিতে আর একটা ভাবনাও মনে আসাটা বিচিত্র নয়। সে ভাবনা হল প্রেমবার্গের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে নিয়ে। বার্ষিকীর দিন এঁরা প্রত্যাশা করবেন ভীষণ রকমের আশ্চর্য কিছু কাণ্ডকারখানার। অনেক রকম কানাঘুসো শোনা যাচ্ছে শহরের পথেঘাটে। অতি-অসাধারণ এবং একেবারেই অপ্রত্যাশিত বেশ কিছু ঘটতে দেখা যাবে গোরস্থানের মধ্যেই। সবার পিলে চমকে দিয়ে হঠাৎ যদি কবরের পাথর ঠেলে উঠে আসে এবং রোমাঞ্চকর মহাপণ্ডিত ভদ্রলোক যদি পূর্ণজ্যোতি নিয়ে পুনরায় সজীব হন—তাহলেও খুব একটা আশ্চর্য কেউ হবেন বলে মনে হয় না।

'কারও কারও মতে নাকি অটো স্টোরিজ মরেন নি, মরতে পারেন না। তাঁর সৎকার এবং সমাধিকার্যের পুরো ব্যাপারটাই নাকি ডাহা চালাকি।

'আগডম্ বাগডম্ প্রলাপ নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। কুসংস্কার কখনো যুক্তির বেড়াজালে বন্দী থাকে না। সবাই তা জানেন। বহু বছর পরে সহজ বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত হাস্যকর এইসব প্রবাদকে হেসে উড়িয়ে দেয় এবং বুজরুকির বিনাশ ঘটায়।'

খবর পড়তে পড়তে মনটা সত্যিই খাবাপ হয়ে গেল। খুবই মুষড়ে পড়লাম। সাতপাঁচ বাজে চিন্তা মাথায় ভীড় করে এল। অটো স্টোরিজ মৃত এবং কবরস্থ, এটা যেমনি সত্যি—'কবর ফুঁড়ে হুহাট করে তিনি ২৫শে মে সগৌরবে আবির্ভূত হবেন জনতার পিলে চমকে দিয়ে'—এটাও তেমনি মিথ্যে। এতদূর মিথ্যে যে এ নিয়ে চিন্তা কবা মানেই সময় নষ্ট করা। কিন্তু বাপের মৃত্যু যেমন সত্যি, ছেলেব বেঁচে থাকাটাও তো তেমনি সত্যি। অটো স্টোরিজ পরলোকে, কিন্তু উইলহেম স্টোরিজ তো ইহলোকে এবং এঁকেই রোডরিখ ফ্যামিলি বাড়ীর ছায়া মাড়াতে বারণ করেছেন। ভয় তো সেই কারণেই। ঈর্ষার বিষে জ্বলেপুড়ে লোকটা মার্কের ক্ষতি করে বসবে না তো? বিবাহবাসর ভণ্ডুল করে দেবে না তো?

কাগজ কলম কালি নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম ভায়াকে। লিখলাম যে পরের দিনই বুদাপেস্ত থেকে বেরিয়ে পড়ছি। 'রাগ' শহর এখান থেকে বড় জোর ১৯৫ মাইল। কাজেই পৌছোবো এগারোই মে, বিকেলের দিকে।

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ নোঙর তুলে 'ডরোথি' ভেসে চলল ঢেউয়ের টানে।

একটা জিনিস না বলেও চলে, তবুও বলে রাখি। নৌকো যতবার নোঙর

ফেলেছে ভিয়েনা থেকে রওনা হওয়ার পর, ততবারই নতুন নতুন মুখ দেখা গেছে যাত্রীদের মধ্যে। কেউ নেমেছে, কেউ উঠেছে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত একটানা পাড়ি জমানোর মত যাত্রী ছিলেন পাঁচ কি ছ'জন। এঁদের মধ্যে ক'জন ইংরেজও ছিলেন।

বুদাপেস্তে ওঠানামা ঘটেছে অন্যান্য বন্দরের মত। নতুন মুখ দেখা গেছে 'ডরোথি'র ডেকে। একজনকেই বিশেষ করে দেখেছি আমি। কারণ, লোকটাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত।

মানুষটাব বয়স বছর পঁয়ত্রিশ তো বটেই। ঢ্যাঙা, টুকটুকে ফর্সা, চোখ-মুখের ভাব রুক্ষ এবং মমতাহীন। চেহারার মধ্যে ঔদ্ধত্য আর তাচ্ছিল্য যেন চাপ দিয়ে বসানো। যাত্রীদের সঙ্গে যে কবার কথা বলেছে লোকটা, ততবারই কানে ভেসে এসেছে তার রসকষহীন কাটাকাটা কণ্ঠস্বর। সে স্বর এমনই যে শুনলে পিত্তি পযন্ত জ্বলে যায়।

লোকটার ধরনধারণ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সহযাত্রীদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তার।

লোকটা আমার মনকে টেনেছিল বলেই ভাবছিলাম নানান কথা। জাত কি লোকটার? জার্মান নিশ্চয়, দেখেশুনে তো তাই মনে হয়। খুব সম্ভব প্রুশিয়ায় নিবাস। শোনা যায়, প্রুশিয়াবাসীদের নাকি দূর থেকে দেখলেই টের পাওয়া যায়। খাঁটি আর্য জাতের রবার স্ট্যাম্প যেন সারা গায়ে মারা।

এরপরেই ঘটল একটা তুচ্ছ ঘটনা।

দাঁড়িয়েছিলাম নৌকোর পেছন দিকে—আমার তোরঙ্গর গা ঘেঁসে। তোরঙ্গর ওপর পেরেক দিয়ে আটকানো কাগজে লেখা ছিল আমার নামধাম মর্যাদা। কাগজ দেখলেই যে-কেউ বলতে পারত আমি মানুষটা কে এবং কোন শ্রেণীর। রেলিংয়ের উপর ভয় দিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম। গাছপালা জমিজমা পাহাড় পর্বতের দিকে। শুধু তাকিয়েছিলাম, কিছুই ভাবছিলাম না। মাথায় কোন চিন্তা ছিল না।

আচমকা মনে হল, কে যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুবই আবছা অনুভূতি। কিন্তু পেছনে কেউ এসে দাঁড়ালে বোঝা যায়—মাথার পেছনে চোখ না থাকলেও কেন জানি অনেক সময়ে টের পাওয়া যায়।

ধাঁ করে পেছন ফিরলাম। কিন্তু কাউকেই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম না।

কিন্তু নজরবন্দী হয়ে থাকার অনুভূতিটা এত স্পষ্টভাবে টের পেয়েছিলাম

যে পেছনে কেউ নেই দেখে যেন দম আটকে এল আমার। দাঁড়িয়ে রইলাম থ হয়ে।

শেষ পর্যন্ত চাক্ষুস প্রমাণকেই মেনে নিতে হল। সব চাইতে কাছের যাত্রী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার কাছ থেকে কম করেও চল্লিশ হাত দূরে।

মনে মনে নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করলাম ছায়া দেখে চমকে ওঠার মত নার্ভাসনেসের জন্য। একি ভীতু স্বভাব! মনকে বুঝিয়ে আবার সহজ হলাম আগের মত। সুতরাং অতি তুচ্ছ এ ঘটনা মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু তবুও মনে রইল। কেননা, এর পরেই যে-সব ঘটনা আরম্ভ হল, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

পরের দিনের যাত্রাপথে কোনো ঘটনা ঘটল না। ৯ই মে আবার জল কেটে এগোলাম গন্তব্যস্থানের দিকে।

ন'টা নাগাদ ঘটল নতুন ঘটনাটা। কেবিনে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে জার্মান যাত্রী বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। এত জোরে বেরিয়ে এল যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে হতে কোনমতে পাশ কাটালাম দুজনে দুজনকে। অবাক হলাম লোকটার চাহনি দেখে। অদ্ভুত চাহনি দিয়ে যেন আমাকে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করল। লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি হলাম সেই প্রথম। অথচ চাহনির মধ্যে যা দেখলাম, তা নিছক ঔদ্ধত্য বা অশিষ্টতা নয়, অপরিসীম ঘৃণা যেন ঠিকরে বেরতে চাইছে দুচোখ থেকে। আমি কেন, যে কেউ সে চোখ দেখলেই ধরে নিতে পারত আমার প্রতি তার মনোভাব।

কিন্তু আমাব ওপর তার এত রাগ কেন? কিসের এত বিদ্বেষ? আমি ফরাসী, এই জন্যেই কি এত ঘেন্না? হয়ত তোরঙ্গর ডালায় আমার নামটা চোখে পড়েছে জার্মান যাত্রীর। কেবিনে রাখা আমার ট্র্যাভেলিং ব্যাগের ওপরে আমার নাম লেখা আছে। সেই দেখেই হয়ত মর্মান্তিক চটেছে যাত্রীমশায়।

১০ই মে লোকটা ডেকের ওপর বেশ কয়েকবার পাশ কাটিয়ে গেল আমাকে। প্রতিবারেই এমন কটমট করে তাকালো যে পিত্তিশুদ্ধ জলে গেল আমার। যেচে কারো সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে চাই না। কিন্তু অমন বিশ্রীভাবে কেউ চেয়ে থাকুক আমার পানে, তাও আমি চাই না। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেললেই পারে। ভাবসাব দেখলে তো মনে হয় ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না? এরকম একটা বিদিগিচ্ছিরি পরিস্থিতিতে শুধু চোখ দিয়ে কথা বললেই তো চলে না – মুখও

খুলতে হয়। বেশ তো, ফরাসী ভাষা জানা না থাকলে আমি তো জার্মান জানি। ওরই মাতৃভাষায় ওকে একহাত নিতে পারি।

কথা বলার সুযোগ আসুক আর না আসুক, আগে দরকার টিউটন ভদ্রলোক সম্বন্ধে বেশ কিছু খোঁজ খবর নেওয়ার। তাই সোজা গেলাম 'ডরোথি'র ক্যাপটেনের কাছে। গিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম বিচিত্র ব্যক্তিকে উনি চেনেন কিনা।

'এই প্রথম দেখছি' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

'জার্মান ?' বললাম আমি।

'তা আর বলতে, মসিয়ে ভাইডাল। শুধু জার্মান নয়, দ্বিগুণ জার্মান। কেন জানেন ? দেখে তো প্রুশিয়ান মনে হয় না

নদীর অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে পরের দিন রওনা হলাম ভুকোভারের দিকে। শহর ছেড়ে আসার পর জার্মানটাকে ডেকের ওপর আব দেখতে পেলাম না। তাই ভাবলাম, ভুকোভারেই নেমে গেছে সে। এক দিক দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অস্বস্তিকর সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেলাম। ফলে কটমট করে চাওয়া হচ্ছে কেন এ প্রশ্নটাও আর কষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে হল না।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সারি সারি কতকগুলো গির্জের চূড়ো দেখা গেল বাঁ দিকে।

'রাগ' শহর। নদীর শেষ বাঁকটা ফিরতেই গোটা শহরটা ঝলমল করে উঠল চোখের সামনে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের সানুদেশে ছবির মত সাজানো শহর। পাহাড়ের ওপর সেকেলে কেল্লা। হাঙ্গারীর অতি প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্যময় পর্বত-দুর্গ।

হাওয়ার ঠেলায় সামনে এগিয়ে গেল 'ডরোথি'। ঠেকল জেটিতে। ঠিক সেই সময়ে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা।

নৌকোয় ওঠানামার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলাম ঘাটেব দিকে। যাত্রীরা হুড়োহুড়ি কবেছে ডাঙায় ওঠার জন্যে। জেটির শেষের দিকে দাঁড়িয়ে জটলা করছে কিছু লোক। ভায়া মার্ক যে ওদের মধ্যে রয়েছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ওকেই দেখবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কে যেন খাঁটি জার্মান ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলল,

'মার্ক ভাইডাল মায়রা রোডিরিখকে বিয়ে কবলে জানবেন সর্বনাশ হবে মার্কের ! সর্বনাশ হবে মায়বাব !'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি…দেখলাম—কেউ নেই। আমি একা। অথচ কে যেন হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেল আমাকে। এবং বক্তার স্বর আমার অপরিচিত নয়!…

অথচ কেউ নেই আমার ধারে কাছে! ভ্যাবাচাকা খেয়ে আর একবার চারপাশে চোখ পাকিয়ে তাকালাম…করার কিছুই নেই…কাঁধ ঝাঁকিয়ে তীরে নেমে যাওয়া আর পথ কি?

করলাম তাই। জেটির ভীড় ঠেলে এগোলাম অতি কষ্টে। লোকের গুঁতোগুঁতির মধ্যে আমিও গুঁতোগুঁতি করে চললাম মার্কের দিকে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যা ভেবেছিলাম তাই। দেখি, মার্ক আমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম ঝোঁকেই তো অন্তরের সব আবেগ দিয়ে করমর্দন করলাম দুই ভাই।

মার্ক বললে—'এসো আলাপ করিয়ে দিই আমার শ্যালকের সঙ্গে।'

মার্কের একটু পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন সামরিক পোশাক পরা এক ভদ্রলোক। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এবার দেখলাম, ভদ্রলোক মিলিটারী ক্যাপ্টেন। বড়জোর আটাশ বছর বয়স। মাথায় মাঝারি উচ্চতার চাইতে সামান্য ঢ্যাঙা। লালের সঙ্গে হলদে মিশোনো চেস্টনাট গোঁফ। দাড়ির রঙও তাই। ম্যাগিয়াদের স্বভাবজাত খানদানী হাবভাব। যেন হুকুম করার জন্যেই জন্ম ভদ্রলোকের। এমন দেমাকি চেহারা সত্ত্বেও ভদ্রলোক চোখে আমন্ত্রণ আর ঠোঁটে হাসি নিয়ে তাকিয়েছিলেন আমার পানে।

'ক্যাপ্টেন হারালান রোডরিখ।' আলাপ করিয়ে দিল মার্ক।

হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন। দুহাতে তুলে নিলাম তাঁর হাত।

ক্যাপ্টেন বললেন—'মঁসিয়ে ভাইডাল, বড় খুশী হলাম আপনাকে দেখে। কল্পনাও করতে পারবেন না কত আনন্দ পেলাম আমরা সবাই আপনাকে পেয়ে। আপনার পথ চেয়েই দিন গুনছে আমার ফ্যামিলির সকলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানলাম, ক্যাপ্টেন হারালান অনর্গল ফরাসী বলতে পারেন। ও পরিবারের সকলেই ফরাসী বলেন। ফ্রান্সে তাঁদের যাতায়াতও ঘটেছে। তার ওপর আমি আর মার্ক দুজনেই জার্মান বলতে পারি যে কোনো জার্মান ভদ্রলোকের মত। কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত ভাসা ভাসা হাঙ্গারিয়ান বুকনিও জানি। ফলে সব কটা ভাষায় কথা বলতে পারার দরুন দুজনেরই মুখে যেন ভাষার খই ফুটতে লাগল।

গাড়ীতে মালপত্র চাপিয়ে পৌছোলাম হোটেলে।

মার্ক বলতে আরম্ভ করল প্যারিস থেকে বেরিয়ে কিভাবে সে দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, শহরে শহরে গিয়ে সাফল্যের তিলক ললাটে এঁকেছে, ভিয়েনা আর স্প্রেমবার্গে কিভাবে পরমানন্দে দিন কাটিয়েছে। শেষের দুই শহরে ওকে মাথায় নিয়ে নাচা হয়েছে বললেই চলে—কলাশিল্প মহলের সিংদরজা দুহাট করে খুলে ধরা হয়েছিল ওর সামনে।

যা শুনলাম, তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। মার্কের সই করা চিত্র নিয়ে তো কাড়াকাড়ি পড়বেই সমান উৎসাহ দেখাবে ধনপতি অস্ট্রিয়ান আর বিত্তবান ম্যাগিয়াররা।

'মাই ডিয়ার হেনরী, কিছুতেই আর চাহিদা মেটাতে পারছিলাম না। অর্ডার আসতে লাগল চারদিক থেকে! স্প্রেমবার্গের এক বড় ব্যবসাদার তো বলেই ফেললেন মার্ক ভাইডাল যা আঁকেন, তা প্রকৃতির চাইতেও সজীব মনে হয়!' হাসতে হাসতে ঠাট্টাচ্ছলে বলল মার্ক—'বুঝতেই পারছো, এরপর হয়তো একদিন শুনবে ভিয়েনিস্ কোর্টে যাবতীয় ছবি আঁকার জন্যে কাঁধে করে নিয়ে গেছে আমায়।'

জিজ্ঞেস করলাম—'বিয়ে কবে হচ্ছে?'

এইসব কথা বলতেই ডিনার খাবার সময় ঘনিয়ে এল। খেয়েদেয়ে দুভাই দুটো চুরুট ধরিয়ে বেরোলাম পায়চারী করতে। ড্যানিউব নদীর বাঁ তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বকবক করতে লাগলাম সমানে।

'ডরোথি' নৌকো থেকে নামবার সময়ে হাওয়ার মুখে যে কথাটা শুনেছিলাম বলে মনে হয়েছিল, ফের সেই কথাটা ফিরে এল মনের মধ্যে। কথাটা অবশ্য স্রেফ মনের ভুল বলেই এখনো বিশ্বাস আমার। আর, যদিও বা কেউ সত্যি সত্যিই বলে থাকে, তা থেকে কি বুঝতে হবে আমাকে? কে বলেছে, তাই তো ছাই জানি না! বুদাপেস্তে নৌকোয় উঠেছিল সেই দাম্ভিক জার্মানটা! দোষটা তার ঘাড়ে চাপালেও চাপানো যায়। কিন্তু ফট করে কাউকে দোষ দেওয়ার আগে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবার দরকার তো—বিশেষ করে কাঠখোট্টা লোকটা যখন ভুকোভারে নেমে গিয়েছিল নৌকো থেকে? তাই গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা গাড়োয়ানী ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছুই মনে হল না।

এই সব ভেবেই প্রসঙ্গটা চেপে গেলাম ভায়ার কাছে। ঠিক করলাম, উইলহেম স্টোরিজ সম্বন্ধে যা জেনেছি, তাই নিয়েই গল্প করা যাক।

মার্কের জবাবে প্রকাশ পেল ওর স্বভাবগত তাচ্ছিল্য। বলল,—

হারালানের কাছে লোকটার কথা আমিও শুনেছি। সে নাকি মহাপণ্ডিত অটো স্টোরিজের একমাত্র ছেলে। জার্মানদেশে অটো স্টোরিজের নামডাক ম্যাজিসিয়ান হিসেবে। খুবই অন্যায় সুনাম। কেননা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা জীবনপাত করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অটো স্টোরিজের স্থান খুব উঁচুতে। রসায়ন বিদ্যা আর পদার্থ বিদ্যাতেও ওঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার রয়েছে। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের পুত্রটিকে বাতিল করা হয়েছে রোডরিখ ভবনে।'

'তোর প্রস্তাব লুফে নেওয়ার আগেই নিশ্চয় ওর প্রস্তাব নাকচ হয়েছে?'

'মাস চার পাঁচ আগে হয়েছিল বলেই তো জানি।'

'অর্থাৎ দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই?'

'একেবারেই নেই।'

'ম্যাডমোয়াজেল মায়রা কি জানে যে উইলহেম স্টোরিজ তাকে বউ করে নিজের মান বাড়ানোর জন্যে খেপেছিল?'

'মনে হয় জানে না।'

'প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর থেকে কিচ্ছু ঘটেনি তো?'

'একদম না। ও তো জেনেই গিয়েছিল কোনো চান্স নেই।'

'কেন নেই? কীর্তিকলাপের জন্যে কি?'

না। উইলহেম স্টোরিজ লোকটা অদ্ভুত ধরনের। তার অস্তিত্বটাই নাকি একটা প্রহেলিকা। কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না। কারো ছায়া মাড়ায় না।'

'রাগ' শহরে?'

'হ্যাঁ, 'রাগ শহরেই। থাকে বুলেভার্ড টেকেলির একটা নিরালা বাড়ীতে। বাড়ীটা পাড়া থেকে দূরে—কেউ যায়ও না সেখানে। সবাই জানে উইলহেম স্টোরিজ একটু অদ্ভুত টাইপের মানুষ। তার বেশী নয়। কিন্তু যে লোক জাতে জার্মান, সে তো ডক্টর রোডরিখের চক্ষুশূল হবেই। হাঙ্গারিয়ানরা টিউটনিক জাতটাকে দুচক্ষে দেখতে পারেনা যে।'

'উইলহেমকে দেখেছিস কখনো?'

'মাঝে মাঝে দেখেছি। আর্ট গ্যালারীতে একদিন দাঁড়িয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন হারালান দেখিয়ে দিয়েছিল। উইলহেম অবশ্য আমাকে দেখেনি।'

'রাগ-য়ে এখনো আছে উইলহেম?'

সঠিক বলতে পারবো না। তবে মনে হয় হপ্তা দু'তিন তাকে এখানে দেখা যায় নি।'

'এ শহরে এখন সে না থাকলেই মঙ্গল।'

'বটে!' সবিস্ময়ে বলল মার্ক,' উইলহেম যে চুলোতেই থাকে থাকুক, মায়রা রোডরিখ যে কোনোদিনই শ্রীমতি স্টোরিজ হতে যাবে না—সেটা জেনে রেখো। কেননা…'

'সে শুধু শ্রীমতি মার্ক ভাইডালই হবে বলে, কেমন?'

জেটির ওপরেও হাঁটা অব্যাহত রাখলাম আমি। ইচ্ছে করেই আরও হাঁটছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল, কে যেন আমাদের পিছু নিয়েছে। সমানে পেছনে লেগে রয়েছে আমরা কি কথা বলছি তা শোনবার জন্যে। মনে হওয়াটা যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই জেটি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

সেতুর ওপর এসে দাঁড়ালাম মিনিট কয়েকের জন্যে। এই সুযোগে পেছন ফিরে দেখলাম যে পথে এসেছি সে পথে সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা। বেশ কিছুদূরে দেখলাম এক ভদ্রলোক। উচ্চতা মাঝামাঝি। চলার বেগ এত ধীর যে দেখলেই বোঝা যায় বয়সটা বিশেষ কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে।

যাই হোক, এ নিয়ে আর ভাবলাম না, মার্ককে বললাম, তার শেষ চিঠি মত সব কাগজপত্রই সঙ্গে এনেছি আমি। বিয়ের ব্যাপারে লাগতে পারে, এমন সব দলিলই পাওয়া যাবে হাতের কাছে। সুতরাং সে অনায়াসেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

মোটের ওপর, যে কথাই বলি না কেন, সব কথার মধ্যেই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রর মত জ্বল জ্বল করতে লাগল মায়রা রোডরিখ। এ যেন কম্পাসের চুম্বক কাঁটা বারে বারে ঘুরে যেতে চাইছে পোলস্টারের দিকে।

হোটেলের দিকে ফিরলাম। হোটেলে পৌঁছে শেষ বারের মত তাকালাম পেছন দিকে। খাঁ খাঁ করছে রাস্তা। নিছক গা-ছমছম কল্পনা মনে করে যদি উড়িয়ে না দিই, যদি ধরে নিই সত্যই এতক্ষণ একজন পেছনে লেগেছিল আঠার মত, তাহলেও কিন্তু জনশূন্য রাস্তায় তাকে দেখা গেল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে অনুসরণকারী!

সাড়ে দশটায় হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম আমি আর মার্ক। বিছানায় শুতে না শুতে রাজ্যের ঘুম নামতে লাগল দু'চোখে। ঠিক তখনি, আচমকা সচমকে জেগে উঠলাম আমি। স্বপ্ন দেখছি কি?…না, দুঃস্বপ্ন?—এখনো কি ঘোর কাটেনি আমার?…ডরোথির ডেকে দাঁড়িয়ে যে কথাটা কানের কাছে কাকে যেন বলতে শুনেছিলাম—সেই কথাটাই ফের তন্দ্রার মধ্যে শুনলাম না? মার্ক আর মায়রা রোডরিখের সর্বনাশ কামনা করে কে যেন ফের হুমকি দিয়ে গেল আমার তন্দ্রার ঘোরে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিন আনুষ্ঠানিক পরিচয় ঘটল রোডরিখ পরিবারের সঙ্গে।

মস্ত একটা বাগানের মধ্যে ডক্টরের আধুনিক বাড়ীর সাজসজ্জা দেখেই বোঝা যায় গৃহকর্তার রুচিতে শিল্পীর সূক্ষ্মতা আছে। চোখ ধাঁধানো চমকের যেন ছড়াছড়ি এ বাড়ীর সর্বত্র। অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা বর্ণনা দেওয়া যাক।

একটা গ্যালারী ঘর। চারুকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সাজানো সেখানে। ঘরের দেওয়াল বলতে শুধু কাঁচের জানলা। আর আছে দরজা। একটা দুটো নয়—অসংখ্য বললেও চলে। প্রতিটি দরজায় ঝুলছে বাহারি পর্দা। সাবেকি আমলের পর্দা—বিস্ময়কর শৈল্পিক সূক্ষ্মতার নমুনা বলা যায় এক একটি পর্দাকে। সে সব দরজার পর্দা তুলে যাওয়া যায় ডক্টর রোডরিখের পড়ার ঘরে, তাঁর বসবার ঘরে এবং তাঁর খাবার ঘরে।

গ্যালারীকক্ষে একটা ইজেল চোখে পড়ল। ইজেলের ওপর একটা তৈলচিত্র। কুমারী মায়রার প্রতিকৃতি। তারিফ করার মত ছবি। ছবির নীচে যার নামের স্বাক্ষর, সে আমার ভাই।

ডক্টর রোডরিখের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হয় আরো কম। মাথায় বেশ ঢ্যাঙা। সিধে মেরুদণ্ড। মাথাভরা চুলে পাক ধরেছে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে টলমল চেহারায় মজবুত বাঁধুনি দেখলেই মালুম হয় অসুখ বিসুখে কখনো কাবু হয়নি। প্রথম পরিচয়ের পরেই করমর্দনের সময় উপলব্ধি করলাম যার মুঠি এত উষ্ণ তার ভেতরটাও কত ভাল।

ম্যাডাম রোডরিখের বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রাক্তন রূপের ছিটেফোঁটা ধরে রেখেছেন ঐ বয়সেও। মার্ক তাঁর যা বর্ণনা দিয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে নিখুঁত। আদর্শ গৃহিণীর যাবতীয় গুণপণা পরিস্ফুট তাঁর মধ্যে। সারা অবয়ব ঘিরে স্নিগ্ধ দীপ্তি। পতিসঙ্গে পরম সুখী না হলে এমনি পরিপূর্ণতা চোখে পড়ে না। ছেলে মেয়েকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখেন হুঁশিয়ার অথচ মমতাময়ী মায়ের মতই। তার বন্ধুতার উষ্ণতা আমাকে স্পর্শ করল অতি গভীরে।

কিন্তু মায়রা রোডরিখ সম্বন্ধে কি লিখি তাই ভাবছি। হাসিমুখে দুবাহু বাড়িয়ে সামনে এল সে। মার্ক ঠিকই বলেছে। সত্যই আমি একটি বোন পেতে চলেছি।

মার্ক যা বলেছিল, মায়রা দেখলাম বাস্তবিকই তাই। ওর আঁকা ক্যানভাসের যে ছবিটি দেখে তারিফ করেছি একটু আগে, দেখলাম আসল মায়রাও অবিকল তাই। কচি মেয়ে, সোনালী রেশমের মত একরাশ চুল মাথায়। প্রাণবন্ত। রসিক ও বুদ্ধিমতী। ঘন নীল দুই চোখে ধীশক্তির চিকিমিকি। হাঙ্গারীবাসিন্দাদের মুখের রঙ যেমন ঝকঝকে গোলাপী হয়, তার মুখেও তেমনি ঝিকিমিকি গোলাপ-গোলাপ ভাব। ঠোঁটের গড়ন, মুখের গড়ন নিখুঁত। গোলাপের পাপড়ির মত অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হলে দেখা যায় চকচকে সাদা দাঁতের সারি। মাথায় খুব লম্বা নয়, খুব খাটোও নয়। চলাফেরা কথা বলার মধ্যে লাবণ্য যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। শরীরী রূপসুধা বললেও চলে। নিখুঁত এই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতে হচ্ছে না মায়রাকে, কষ্ট করে 'পোজ' দিতেও হচ্ছে না।

সত্যিই, মার্কের আঁকা ছবি দেখে লোকে বলাবলি করে যার ছবি, তার চাইতেও ছবি নাকি বেশী জীবন্ত। মডেলের চাইতে পোর্ট্রেট বেশী সজীব। কথাটা মায়রার ক্ষেত্রেও সমানভাবে খাটে। স্বয়ং প্রকৃতির চাইতেও কুমারী মায়রা যেন অনেক বেশী সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক।

ক্যাপ্টেন হারালানও হাজির ছিলেন। পরনে জাঁকালো ইউনিফর্ম। চালচলন চেহারা অবিকল বোনের মতই—মিল দেখলে তাক লেগে যায়। উনিও হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন আমার দিকে। আচরণে প্রকাশ পেল ভ্রাতৃভাব। মাত্র গতকাল যে বন্ধুত্বের শুরু, আজ তা গলায় গলায় বন্ধুত্বে পর্যবসিত হল। যাক, গোটা ফ্যামিলির সঙ্গেই আলাপ হল শেষ পর্যন্ত।

সেদিন বিকেলে আর বেরোনোর প্রশ্নই উঠল না। ম্যাডাম রোডরিখ মেয়েকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে সারা বাড়ীটা দেখালেন। দেখালেন বাড়ী ভর্তি আর্টের কাজ।

ডিনার খেলাম রোডরিখ পরিবারের সঙ্গে। সমস্ত সন্ধ্যাটা কাটালাম দল বেঁধে। বেশ কয়েকবার ক্ল্যাভিকর্ড-এর সামনে গিয়ে বসল মায়রা। আধুনিক পিয়ানোর পূর্ব পুরুষ এই ক্ল্যাভিকর্ড। কি আশ্চর্য মিষ্টি গলায় হাঙ্গারিয়ান গীতসম্ভার উপহার দিল বারংবার। এ গান এমনই গান যা শুনলে মন পর্যন্ত দুলে ওঠে। সেকি আনন্দ! রাতভোর হয়ে যেত যদি না ক্যাপ্টেন হারালান হুঁশিয়ার করে দিতেন—বাড়ী যাওয়ার সময় হয়েছে—এবার বন্ধ হোক আনন্দের হাট!

হোটেলে ফিরে মার্ক আমার ঘরে এল।

বলল—'বাড়িয়ে বলেছিলাম বলে মনে হচ্ছে কি? কি মনে হয়? এ মেয়ের জুড়িদার হবার মত দোসরা মেয়ে দুনিয়ায় আছে?'

'জুড়িদার!' বললাম আমি। আমি তো ভাবছি এরকম একজনও আছে কিনা এবং ম্যাডমোয়াজেল মায়রার অস্তিত্বও আদৌ আছে কিনা।'

এরপর বিছানায় টানটান হলাম দুভাই। শান্তিতে ভরপুর একটি দিনের স্মৃতিতে মেঘের ছায়াটুকুও রইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরের দিন খুব সকালে উঠে 'রাগ' শহর দেখলাম ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে।

উইলহেম স্টোরিজের সেই স্মৃতিটা ছিনে জোঁকের মতই ফিরে ফিরে আসছিল মনের মধ্যে। স্মৃতির এহেন বিরামহীন আবির্ভাবে অবাক হইনি আমি। ভাইয়েব কাছে যা-যা বলেছিলাম, ক্যাপ্টেনের কাছে তার বিন্দুবিসর্গ বলিও নি। এ ব্যাপাবে ক্যাপ্টেন হারালানও মুখে চাবি দিয়ে রইলেন। এমনও হতে পারে, এসম্পর্কে কোনো চিন্তাই আসেনি তাঁর মাথায়।

গোটা শহরে টো-টো করলাম। তারপর এলাম একটা চারকোণা পার্কের সামনে। পার্কের পাশেই গভর্নরেব জমকালো প্যালেস। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেখানে থমকে দাঁড়ালাম দুজনে।

ক্যাপ্টেন হারালান বললেন- 'এই হল প্যালেস। এখানে হপ্তা তিনেকের মধ্যে মায়বা আর মার্ককে আসতে হবে। গভর্নরেব সামনে যাবে, তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে বিয়ে করতে যাবে ক্যাথিড্র্যালে।'

'অনুমতি নেবে?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। খুবই প্রাচীন স্থানীয় রীতি। শহরের উচ্চতম অধিকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কারো বিয়ে হতে পারে না এখানে। আরও কি জানেন, এ অনুমতি যারা পায়, তারাই শক্ত গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে—নিবিড় হয় দুজনের সম্বন্ধ। ওদের এখনো বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু নিছক বাগদত্ত পর্যায়েও নেই। এই অবস্থায় যদি কোনো অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধক বিয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেও আর কাউকে বিয়ে করার জন্যে কথা দিতে এদের কেউ আর পারবে না।'

অত্যাশ্চর্য এই রীতির ব্যাখ্যা শোনাতে শোনাতে ক্যাপ্টেন হারালান

আমাকে নিয়ে এগুলেন ক্যাথিড্র্যাল অফ সেন্ট মাইকেল-এর দিকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর থেকে শুরু করে এ গীর্জেতে এত বৈশিষ্ট্য জমা হয়েছে যার বর্ণনা যে কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে। ক্যাপ্টেন খুঁটিযে খুঁটিয়ে তা শোনালেন আমাকে।

প্রাসাদ-দুর্গ অর্থাৎ ক্যাস্‌ল্ যাওয়ার সময়ে একটা বাজার পেরিয়ে যেতে হল। বিকিকিনির হাটে দেখলাম ক্রেতা আর বিক্রেতার বেজায় ভীড়। কাছাকাছি আসতে না আসতেই দারুণ একটা হট্টগোল শুনলাম। বেচাকেনার সোরগোলকেও ছাপিয়ে উঠল সেই গোলমাল।

দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে কযেকটি মেযেছেলে। ঘিরে ধরেছে একজন চাষাকে। বেচারী সেইমাত্র হোঁচট খেযে লুটিয়ে পড়েছে মাটির ওপর এবং ওঠবার চেষ্টা করছে কষ্টেসৃষ্টে। দেখে মনে হল লোকটার মেজাজ সপ্তমে চড়ে রয়েছে।

বলছে—'বলছি না, কে যেন মারল আমাকে এমন ঠেলা মারল যে মুখ থুবড়ে সটান আছড়ে পড়লাম মাটিতে।

'কিন্তু মারবেটা কে?' বলে উঠল একটি মেয়েছেলে। 'হাঁটছিলেন তো একলা। দোকানে বসে স্পষ্ট দেখছিলাম আপনাকে। ত্রিসামানায় ছিল কেউ।'

ক্যাপ্টেন হারালান তখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে লোকটা য বলল, তা এই:

দিব্বি ধীরে সুস্থে পথ চলছিল চাষাটি। আচম্বিতে মনে হল বেজায় শক্ত সমর্থ একটা লোক আছড়ে পড়ল তার ওপর। সাংঘাতিক সংঘর্ষ। এমন সাংঘাতিক যে বেচারী তাল সামলাতে পারেনি। সটান মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়। কে সেই মারকুটে লোক? বলা অসম্ভব। কেননা, ধারে কাছে কাউকেই দেখা যায়নি।

এখন প্রশ্ন হল, গল্পটার মধ্যে সত্যি কতখানি, তা কে বলবে? চাষাটি সত্যিই প্রচণ্ড সংঘর্ষে কুপোকাৎ হয়েছিল কিনা, সত্যিই কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল কিনা এবং সে ধাক্কা তার বর্ণনা মত সত্যিই বিনামেঘে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত কিনা—তা কে বলবে? কেউ ঠেলা না মারলে ঠেলা খাওয়া যায় না। এক হতে পারে, দমকা বাতাসে উল্টে পড়া। সেক্ষেত্রেও বাতাস এসে মেরেছে বলতে হবে। কিন্তু তেমন দমকা বাতাস কোথায়? বাতাস বইছে ধীরে।

অতএব ধরে নিতে হবে লোকটা হয় মরীচিকা জাতীয় মনোবিকারে

ভুগছে, নয়তো আকণ্ঠ মদ গিলে এসেছে। মদে চুর চুর হলে আপনা হতেই আছাড় খায় মাতাল।

এই হল সম্মিলিত অভিমত। চাষা বেচারা যদিও মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে চাইল না কিছুতেই।

ঘটনার সমাপ্তি ঘটল এইভাবে। দুজনে এপথ সেপথ মাড়িয়ে খাড়াই রাস্তা বেয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোলাম প্রাসাদ দুর্গে। পাহাড়ের চুড়োয় নিরেট গড়নের সেই ক্যাসল্ দেখবার মতই বটে।

ক্যাপ্টেন হারালান ফের বোঝাতে শুরু করলেন প্রাসাদ-দুর্গের বিবিধ বৈশিষ্ট্য। প্রধান তোরণও দুহাট হয়ে খুলে গেল ওঁর হুকুমে। তারপর শুরু হল সোপান আরোহণ। কমসেকম দুশ চল্লিশটা ধাপ পেরোতে হল। ইস্ক্রুপের প্যাঁকের মত পেঁচালো সিঁড়ি শেষ হল ছাদের ওপর। ছাদের কিনারা বরাবর নীচু পাঁচিল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নগরীর বিশিষ্ট অংশগুলো আমাকে দেখিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। কথায় কথায় এসে পড়লাম নগরবাসীদের আলোচনায়।

উনি বললেন—'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের শহরে গরীবের সংখ্যা আঙুল গুণে বলা যায়। দারিদ্র্যের সূচনা দেখা দিলেই অঙ্কুরে তার বিনাশ ঘটানো হয়।'

'জানি, ক্যাপ্টেন। কথাটা যে খাঁটি, তাও বুঝি। ডক্টর রোডরিগ গরীবের চিকিৎসায় কখনো বিরত থাকেন না, তাও জানি। আরও জানি ম্যাডাম রোডরিগ এবং মাদমোয়াজেল মাইরা দুজনেই অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের শিরোমণি।'

'মা আর বোনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী একাজ তো ওদের করতেই হবে। আমার কাছে সব কর্তব্যর সেরা কর্তব্য হল দানধ্যান।'

'ঠিক কথা। মহান কর্তব্য।

'সব শেষ কথা কি জানেন,' বললেন ক্যাপ্টেন হারালান, 'আমরা এমন এক শহরের বাসিন্দা যে শহরে রাজনৈতিক উন্মত্ততা অথবা পলিটিক্যাল ঝঞ্ঝাট নেই বললেই চলে। অবশ্য একটা জিনিস আমাকে স্বীকার করতেই হবে। সহ-নাগরিকদের একটা বিষম দোষ আছে।'

'সেটা আবার কি?'

'বড্ড বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন এরা। ভূত প্রেত অলৌকিক ব্যাপারে বড্ড বিশ্বাসী। অশরীরী কাহিনী বা পিশাচ জাগরণের গাঁজাখুরি উদ্ভট গল্প এদের যেন বড্ড খুশী করে। এ সব গল্প মজাদার সন্দেহ নেই—কিন্তু ওদের মজা পাওয়াটা যেন বেশী উৎকট।'

'ডক্টর রোডরিখ নিশ্চয় সে দলে পড়েন না। কারণ উনি চিকিৎসক। ডাক্তারীর সংজ্ঞা অনুসারে আষাঢ়ে বস্তুর ঠাঁই নেই ওঁর মগজে। আপনার মা আর বোন? তাঁরাও কি মানেন ভূতপ্রেত?'

'মানেন বৈকি। ওদের সঙ্গে বাকী সকলেই মানেন। এ যে কি দুর্বলতা, তা আমি হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি। এত চেষ্টা করেও ঘাড় থেকে ভূত বিশ্বাস নামাতে পারি নি। আশা করছি, এ ব্যাপারে মার্ক আমার পাশে দাঁড়াবে।'

প্যারাপেট, মানে, ছাদের কিনারা বরাবর নীচু পাঁচিল থেকে নামবার আগেই ক্যাপ্টেন মনে করিয়ে দিলেন, ঐ যে কয়েকটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওদেরই মধ্যে একটি বাড়ীর খাবার ঘরে দুপুরের খাওয়া খেতে দেওয়া হবে এখুনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লাম বুলেভার্ড টেকেলিতে। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটা ম্যানসন। বাগানের মাঝখানে শুধু একটা ম্যানসন। নিঃসঙ্গ। নিরালা। বাড়ীটার বিষাদ মাখা চেহারা দেখে মনে হল বুঝি বা পরিত্যক্ত অট্টালিকা। জানলায় জানলায় খড়খড়ি বন্ধ, ঝিলিমিলি টেনে নামানো। যেন কস্মিনকালেও খোলা হয় না জানলাগুলো। দেওয়ালে ছ্যাতলার আঁকিবুঁকি। সব মিলিয়ে বুলেভার্ডের অন্যান্য ম্যানসন থেকে একেবারে আলাদা। গরমিলটা অদ্ভুত রকমেব ছন্নছাডা, শ্রীহীন। অনেকটা পোড়োবাড়ীর মত।

রেলিংয়ের লোহার ফটক দিয়ে ঢুকলে সামনে পড়ে একটা ছোটখাট উঠোন। দুটো উইলোগাছ পোঁতা চত্বরে। বয়েসের ভারে দুটো বৃক্ষই নিষ্প্রাণ। মোটা মোটা গুঁড়ি দুটোতে দীর্ঘ ক্ষত—ফোঁপরা ভেতরটা দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট।

বাড়ীর সামনে একটা দরজা। রোদে জলে রঙ ওঠা। দরজার নীচে তিনধাপ ভাঙাচোরা সিঁড়ি।

একতলার ওপর দোতলা। দোতলার ছাদে একটা বুরুজ। বুরুজে দাঁড়ালে চোখে পড়ের বহুদূরের দৃশ্য! বুরুজের গায়ে সঙ্কীর্ণ জানলা। প্রতিটি জানলা পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা।

দেখে মনে হয়না এবাড়ীতে কেউ থাকে। থাকবার মত বাড়ীই নয়।

'কার বাড়ী?' শুধোলাম আমি।

'অদ্ভুত একটা লোকের।' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন হারালান।

'বুলেভার্ডের কলংক। এ বাড়ী নগর থেকেই কিনে নেওয়া উচিত। তারপর ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে সমান করে দেওয়া দরকার।'

'মাই ডিয়ার ভাইডাল, ও বাড়ী মাটিতে মিশলেই বাড়ীর মালিকও শহর

ছেড়ে লম্বা দেবে। যাবে তার নিকটতম আত্মীয় শয়তানের কাছে। ‘রাগ’ শহরের গুজব তাই বলে!’

‘বটে! বটে! অত্যাশ্চর্য এই মহাপুরুষটি কে শুনি?’

‘একজন জার্মান।’

‘একজন জার্মান!’

‘হ্যাঁ, প্রুশিয়ান।’

‘নাম?’

জবাব দেওয়ার জন্যে মুখ খুলেছেন ক্যাপ্টেন হারালান, এমন সময়ে খুলে গেল ম্যানসনের সরজা। বেরিয়ে এল দুটি লোক। একজনের বয়স ষাট ছুঁয়েছে। সে দাঁড়িয়ে রইল ভাঙা সিঁড়িতে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়স অত নয়। সে উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

‘আচ্ছা!’ স্বগতোক্তি করলেন ক্যাপ্টেন হারালান। ‘এখনো এখানে রয়েছে ও? আমি তো ভেবেছিলাম সরে পড়েছে।’

গেট দিয়ে বেরিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই আমাদের দেখতে পেল লোকটা। ক্যাপ্টেন হারালানকে সে চেনে নাকি? নিশ্চয় তাই। কেননা, দুজনেই তাকালো দুজনের পানে এবং সে চাহনির মধ্যে বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নেই।

লোকটাকে আমিও চিনেছিলাম। যেই সে কয়েক পা এগিয়ে গেল, অমনি আমি সবিস্ময়ে বলে ফেললাম—‘আরে, এ যে সে-ই!’

‘আলাপ আছে?’ শুধোলেন ক্যাপ্টেন হারালান। চোখ মুখের বিস্ময় গোপন থাকল না।

‘আলাপ নয়, মোলাকাৎ। বুদাপেস্ত থেকে ভুকোভার পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছিল ‘ডরোথি’র ডেকে। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি ওকে রাগ-য়ে দেখব।’

‘এখানে ও না থাকলেই বরং মঙ্গল হত,’ বললেন ক্যাপ্টেন।

‘ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার বনিবনা নেই মনে হচ্ছে?’

‘কার আছে? আমার সঙ্গে ওর আদা কাঁচকলা সম্পর্কের বিশেষ কারণও আছে। শুধু শুনে রাখুন, লোকটার স্পর্ধা অপরিসীম। বিয়ে করতে চেয়েছিল আমার বোনকে। আমি আর বাবা ওকে এমনভাবে বিমুখ করেছিলাম যে ভুলেও আর ও প্রস্তাব কোনোদিন মুখে আনবে না।’

‘সে কি! এই সে-ই লোক!’

‘চেনেন নাকি?’

'মাই ডিয়ার ক্যাপ্টেন, চিনি। ভাল করেই চিনি। এখন বুঝেছি এই মাত্র যাকে দেখলাম, নাম তার উইলহেম স্টোরিজ, স্প্রেমবার্গের স্বনামধন্য কেমিস্ট অটো স্টোরিজের ছেলে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের দুদিন উইলহেম স্টোরিজের নামটা বারে বারে ফিরে আসতে লাগল মনের মধ্যে। স্বীকার করছি, নিজে থেকে যত না ভাবলাম, তার চাইতে বেশী বার আপনা হতেই ফিরে এল ভাবনাটা। বটে, এই 'রাগ' শহরেই তাহলে থাকে উইলহেম। আরও জানলাম, লোকটার সবেধন নীলমণি একটি মাত্র চাকর আছে। নাম তার হারমান। মনিবের মতই কর্কশ—সহানুভূতিশূন্য। কাছে ঘেঁষা দায়। মনিবের মতই পেটপাতলা নয় মোটেই। হারমানের চেহারার আদল আর চলনভঙ্গী দেখে কেন জানি মনে হল এই লোকটাকেই আমার আর মার্কের পাছু নিতে দেখেছিলাম নদীতীরে বেড়ানোর সময়ে। ঘটনাটা ঘটেছিল সেইদিনই যেদিন প্রথম পৌঁছোই রাগ শহরে।

ঠিক করলাম, বুলেভার্ড টেকেলিতে উইলহেম স্টোরিজের সঙ্গে আমার আর ক্যাপ্টেন হারালানের মোলাকাৎ প্রসঙ্গ ভায়ার কাছে একেবারেই চেপে যাব।

ষোল তারিখে সকালে সবে এক চক্কর বেড়িয়ে আসার জন্য বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আবির্ভাব ঘটল ক্যাপ্টেন হারালানের। দেখে অবাক হলাম আমি। কেননা, আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল, সেদিন আর আসবেন না ক্যাপ্টেন।

'কি ব্যাপার?' সবিস্ময়ে শুধোলাম আমি। 'দারুণ চমকে দিলেন তো! খুব খুশী হলাম কিন্তু!'

ভুল হতে পারে আমার, কিন্তু মনে হল যেন ক্যাপ্টেন ঈষৎ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। আমার কথা শুনে সংক্ষেপে জবাব দিলেন—'মাই ডিয়ার ভাইডাল, বাবা কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে। বাড়ীতে বসে রয়েছেন 'আপনার পথ চেয়ে।'

'এখুনি আসছি' খুবই অবাক হয়ে বললাম। কেন জানি না। একটু অস্বস্তিবোধও দেখা দিল মনের মধ্যে।

পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে একা বসেছিলেন ডক্টর। মুখ তুলতেই লক্ষ্য করলাম ছেলের চাইতেও উনি বেশী উদ্বিগ্ন।

ডক্টরের মুখোমুখি বসলাম একটা হাতলঅলা চেয়ারে। ক্যাপ্টেন হারালান দাঁড়িয়ে রইলেন ম্যান্টলপিসে ভর দিয়ে। একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ডক্টর কথা শুরু করেন।

'মঁসিয়ে ভাইডাল, হারালানের সামনেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।'

'বিয়ের ব্যাপারে কিছু কি?'

'হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারে।'

'ব্যাপারটা নিশ্চয় সিরিয়াস ধরনের?'

'হ্যাঁ ও বটে, আবার না-ও বটে,' বললেন ডক্টর। 'যেটাই হোক না কেন, এ সম্পর্কে আমার স্ত্রী কিছুই জানেনা, মেয়েও জানেনা, আপনার ভাইও নয়। আমি চাইনা আপনাকে যা বলব, তা ওরা কেউ জানুক। আপনি নিজেই বুঝবেন আমি ঠিক বলছি, কি বেঠিক বলছি।'

আমার মন বলল, উনি যা বলতে চাইছেন তার সঙ্গে বুলেভার্ড টেকেলিতে উইলহেমের সঙ্গে আমার আর ক্যাপ্টেনের সেই মুখোমুখি সংঘর্ষর একটা সম্পর্ক আছে।

ডক্টর আরম্ভ করলেন—'গতকাল বিকেলের দিকে ম্যাডাম রোডরিখ আর মায়রা একটু বেরিয়েছিল। আমি তখন রুগী দেখতে বসেছি। এমন সময়ে চাকর মারফৎ এত্তেলা এল, এক ভদ্রলোক আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এমনই এক ভদ্রলোক যাকে আমার বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেও আমার বিবেকে আটকায়। নাম তার উইলহেম স্টোরিজ· জার্মান · নাম শুনে থাকতে পারেন·'

'জানি। লোকটার অনেক খবরই রাখি আমি' বললাম আমি।

'আপনি তাহলে জানেন, মাস ছয়েক আগে উইলহেম স্টোরিজ আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আপনার ভাই মায়রার পাণিপ্রার্থী হওয়ার অনেক আগেই আবির্ভাব ঘটেছিল তার। স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম, আমার মতই ওরাও দুচক্ষে দেখতে পারেনা উইলহেমকে। বিয়ের কোনো কথাই ওঠে না। উইলহেমকে তাই জানিয়ে দিলাম। বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে না, একথা শোনার পর মুখ চূণ করে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল উইলহেমের। কিন্তু ও আবার নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল আনুষ্ঠানিকভাবে। আমিও রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এমন সাফ জবাব দিলাম যে আশার ছিটেফোঁটাও আর রইল না মনের মধ্যে।'

ডক্টর রোডরিখ যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ক্যাপ্টেন হারালান পায়চারী করছিলেন ঘরের এ-মোড় থেকে সে-মোড় পর্যন্ত। বার কয়েক থমকে দাড়ালেন

একটা জানলার সামনে। সে জানলা দিয়ে সোজা দেখা যায় বুলেভার্ড টেকেলি।

বললাম—'ডক্টর রোডরিখ, উইলহেমের বায়নাক্কা আমিও শুনেছি। এও শুনেছি, আমার ভাই বিয়ের প্রস্তাব পাড়ার অনেক আগেই এসেছিল ওর বিয়ের আবদার।'

'মাস তিনেক আগে।'

'কাজেই, মার্কের সঙ্গে বিয়েব কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলেই যে উইলহেমকে বিমুখ করা হযেছে, তা নয়। পাত্র হিসেবে নিরেস বলেই ফিরতে হযেছে উইলহেমকে। মায়রার সঙ্গে উইলহেমের বিয়ের কোনো কথাই ভাবতে পারেন নি আপনারা।'

'একেবাবেই পারিনি! যে ভাবেই এ প্রস্তাব আসুক না কেন, নাকচ আমরা করতামই। এ বিয়ে অসম্ভব! মায়রা নিজেও দূর করে তাড়িয়ে দিত উইলহেমকে।'

'কেন বলুন তো? অপছন্দটা ব্যক্তিগত কারণে, না, উইলহেমেব সামাজিক অবস্থার জন্যে?'

'উইলহেমের সামাজিক অবস্থা তো মন্দ নয়,' বললেন ডক্টর বোডরিখ, 'বাপের কাছ থেকে ধনদৌলত যা পেয়েছে, তা নাকি নেহাৎ কম নয়। সাবা জীবনে অনেক আবিষ্কার করেছিলেন অটো স্টোরিজ। সমাজের সেবায় সে-সব আবিষ্কার কাযকরী হওয়াতেও বোজগাব করেছেন বিস্তব। কিন্তু মানুষ হিসেবে উইলহেম—'

'উইলহেমকে আমি জানি, ডক্টর রোডরিখ।'

'জানেন?'

আমি তখন সবিস্তারে বললাম, 'ডবোথির' ডেকে কি ভাবে দেখা হয়েছিল উইলহেমের সঙ্গে। এখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি লোকটা কে। দিন তিন চার জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গ পেয়েছিলাম সহযাত্রী হিসেবে। 'রাগ' শহরে পৌঁছে তাকে নৌকোয় দেখিনি। তাই ধবে নিয়েছিলাম লোকটা ভুকোভারে নেমে গিয়েছে।

বললাম—'অথচ দেখুন, ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে সেদিন ওব বাড়ীর সামনে দিযে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল স্বয়ং উইলহেম স্টোরিজ। দেখেই চিনলাম আমি।'

'তা সত্ত্বেও লোকে বলছে উইলহেম নাকি হপ্তা কয়েক শহর ছাড়া,' বললেন ডক্টর রোডরিখ।

'লোকের বিশ্বাস তাই। খানিকটা সত্যিও বটে। শহরে ছিল না বলেই তো ভাইডাল ওকে দেখেছেন বুদাপেস্তে,' মাঝখান থেকে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন হারালান। গলার স্বর কেমন যেন খিটখিটে ধরনের। 'এটাও সত্যি যে উইলহেম ফের ফিরে এসেছে।'

ডক্টর কথার খেই তুলে নিয়ে বলে চললেন-'মিস্টার ভাইডাল তো শুনলেনই উইলহেমের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত। কিন্তু তার রোজকার দিন যাপনের বৃত্তান্ত যদি শুনতে চান তো বলব, সেটা আগাগোড়া ধোঁয়াটে। সে কি করে, কোথায় থাকে, ইত্যাদি খবর জানা আছে, এমন কথা জাহির করা কে বলবে বলুন? লোকটা যেন মানব সমাজের বাইরের মানুষ। একেবারেই সৃষ্টি ছাড়া।'

'বাড়িয়ে বলছেন না তো? শুধোলাম আমি।'

'একটু বাড়িয়ে নিশ্চয় বলবো। মোদ্দা কথা এই যে, লোকটার বংশ-পরিচয় একটু সন্দেহজনক। ওর বাপের কথাই ধরুন না কেন। অটো স্টোরিজকে নিয়ে কত বিচিত্র কিংবদন্তীই না শুনেছি আমি।

'তাঁর মৃত্যুর পরেও অমর হয়ে রয়েছে সে সব কিংবদন্তী। বুদাপেস্তে একটা খবরের কাগজ পড়ে জানলাম ব্যাপারটা। সমাধি শহর স্প্রেমবার্গে ফি বছর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় বেশ ধুমধাম করে। খবরটা তাই নিয়েই। খবরের কাগজের ভাষা অনুসারে, আপনি এইমাত্র যে সব কিংবদন্তীর কথা বললেন, তার কোনোটাই, এতদিনেও হেসে উড়িয়ে দেবার মত পর্যায় পৌঁছোয়নি। কুসংস্কার এতটুকুও কমেনি। মৃত মহাপণ্ডিত মরেও বেঁচে আছেন তাঁর নামডাক নিয়ে। উনি নাকি জাদুকর। ওপার দুনিয়ার গুপ্ত রহস্য জানেন। অলৌকিক ক্ষমতা ধরেন। তাই ফি বছর স্থানীয় লোকেরা সমাধির ধারে কাছে একটা না একটা আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখবার আশায় দিন গোনে।'

ডক্টর তাই শুনে বললেন—'স্প্রেমবার্গে যদি অটো স্টোরিজের এত নাম ডাক এখনো থেকে থাকে, তাহলে রাগ-যে উইলহেম স্টোরিজকে লোকে কি চোখে দেখে, তা কল্পনা করে নিতে পারেন। অবাক হচ্ছেন না নিশ্চয়·· অথচ এই লোকটাই কিনা আবদার ধরেছিল আমার জামাই হওয়ার। গতকালও সে এসেছিল। আস্পর্ধার কথা শুনুন। ফের শুনিয়ে গেছে পুরোনো দাবীর ফিরিস্তি। বিয়ে সে করবেই আমার মেয়েকে।'

'গতকাল?' বিস্ময় আর বাগ মানল না।

'হ্যাঁ, গতকাল, এখানেই এসেছিল সে।'

ক্যাপ্টেন হারালান বলে উঠলেন—'ওর বিরুদ্ধে আর কিছু বলবার যদি

না-ও থাকে তাহলেও যেহেতু সে প্রুশিয়ান, তাই তাকে কুটুম করার ঘোরতর বিরোধী আমরা।'

ম্যাগিয়ার রক্তে, তাদের ঐতিহ্যে জার্মান বিদ্বেষ যে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে! ক্যাপ্টেনের কথায় সেই বিষম বিরাগ যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে এল।

ডক্টর রোডরিখ বললেন—'এই হল কালকের ঘটনা। আপনারও জানা দরকার। যখন এত্তেলা এল উইলহেম স্টোরিজ আবার চৌকাঠ মাড়িয়েছে আমার· মহা দ্বিধায় পড়লাম·· ভেতরে ডেকে পাঠাব, না, চাকর মারফৎ বলে পাঠাব দেখা করা সম্ভব নয়?'

'সেইটা করলেই বরং ভাল হত, বাবা,' বললেন ক্যাপ্টেন হারালান, 'প্রথম প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হবার পর থেকেই বেয়াড়া লোকটা ভালোভাবেই জেনে গেছে, এ বাড়ীর দরজার তার সামনে আর খুলবেনা—হাজার ছল ছুতো করলেও প্রবেশ নিষেধ এখানে।'

ডক্টর বললেন—'তা ঠিক। কিন্তু আমি কেলেংকারী চাইনা বলেই বাড়াবাড়ি কিছু করতে চাইনা।'

'বাবা, কেলেংকারী যাতে না ছড়ায়, সেই ব্যবস্থাই অতি সংক্ষেপে করা উচিত ছিল আমার।'

ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরে ডক্টর বললেন—'ঠিক এই কারণেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচক্ষণতা দেখাতে হয়েছে আমায়।'

ক্যাপ্টেন হারালানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা মাত্র দিন কয়েকের। কিন্তু এর মধ্যেই জেনেছিলাম ভদ্রলোক একটু রগচটা।

উইলহেমের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন ডক্টর। যে ঘরে কথা বলছিলাম, জার্মান ভদ্রলোক এসেছিলেন সেই ঘরেই। প্রথমে যে সুরে কথা বলেছে, তা হচ্ছে অসাধারণ রকমের নাছোড়বান্দামির সুর।

বৃথাই রীতিমাফিক জবাব দিলেন ডক্টর রোডরিখ। উইলহেম স্টোরিজ হার স্বীকার করবার জন্যে আসেননি। তাই আস্তে আস্তে তিরিক্ষে হতে লাগল তাঁর মেজাজ। তাঁর দাবী যখন আগে, তখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে ম্যাডমোয়াজেল মায়রার বিয়ে ভেঙ্গে দিতেই হবে। মায়রাকে তিনি ভালবাসেন। মায়রা যদি তাঁর বউ না হয়, তবে কারোরই বউ হতে পারবে না··

'কি ঔদ্ধত্য!· শয়তান কোথাকার!' দাঁত কিড়মিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন হারালান, 'বাড়ী বয়ে এসে এতবড় কথা বলে যায়! বুকের পাটা দেখেছেন! আমি থাকলে রদ্দা মেরে রাস্তায় নামিয়ে দিতাম!'

'তাতো বটেই' মনে মনেই বললাম আমি 'এই ছুটিতে যদি একবার মুখোমুখি হয়। তাহলে ডক্টর যা ভয় করছেন, তা ঘটবেই—মারপিট আটকায় কার সাধ্য।

ডক্টর বললেন—'শেষ কথা ক'টি শুনেই উঠে দাঁড়ালাম আমি। আর কোনো কথাই যে শুনতে চাইনা, উঠে দাঁড়িয়েই সে ইঙ্গিত দিলাম। বিয়ে যখন ঠিক হয়েছে। তখন বিয়ে হবেই দিন কয়েকের মধ্যেই।'

'দিন কয়েকের মধ্যেও হবে না, তার পরেও হবে না,' জবাব দিল উইলহেম স্টোরিজ।

'দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললাম আমি, এবার আসতে পারেন! এ থেকেই যে কেউ বুঝে নিত, শেষ কথা বলা হয়ে গেছে আমার। এবার মানে মানে সরে পড়াই মঙ্গল।

'কিন্তু উইলহেম স্টোরিজ নড়বার নামটি করল না। সুর নরম করে এবার চেষ্টা করল মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজোনোর। হুমকি দিয়েও সে বিয়ে বাতিলের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেনি আমার মুখ থেকে। এবার চেষ্টা শুরু হল মধুর বচনে আমার মন ভিজিয়ে কথাটা বার করে নেওয়ার। বিয়ে বাতিল হবে, শুধু এই কথা দিতে হবে আমাকে। তখন আমি দরজার সামনে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাক দিলাম চাকরকে। খপ করে আমার হাত চেপে ধরল উইলহেম। নিমেষে ফিরে এল গনগনে মেজাজ। এমন বাজখাঁই গলায় চেঁচামেচি আরম্ভ করল যে রাস্তা থেকেও শোনা গেল তার চীৎকার। আমার কপাল ভাল। স্ত্রী আর মেয়ে তখনো বাড়ী ফেরেনি।

'শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতেই হল উইলহেমকে। যাবার আগে অবশ্য গুচ্ছের হুমকি শুনিয়ে গেল আমাকে। বড় ভয়াল হুমকি। মার্ককে মায়রার বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। এমন বাধা আসবে যে বিয়ে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। স্টোরিজ ফ্যামিলি এমন অনেক কায়দা জানে যা মানুষ তার সর্বশক্তি দিয়েও রোধ করতে পারবে না। উইলহেমকে যে হঠকারী ফ্যামিলি বিমুখ করেছে, তাদের নাকনি চোবানি খাওয়াতে এই সব কায়দাই প্রয়োগ করা হবে—এইসব বাকতাল্লা ছেড়ে ধাঁ করে দরজা খুলল উইলহেম, রাগে টগবগিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত। আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম তার গোলক ধাঁধার মত দুর্বোধ্য কথাগুলোর অর্থ।'

ডক্টর আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, এ সব কথার বিন্দু বিসর্গ যেন ম্যাডাম রোডরিখ, কি তাঁর মেয়ে, অথবা আমার ভাইয়ের কানে না ওঠে। ওদের উদ্বেগমুক্ত রাখাই সমীচীন এই পরিস্থিতিতে। তার চাইতে বড় কথা আমার

ভাইকে তো আমি চিনি। তার মতিগতিও তো ক্যাপ্টেন হারালানের ধাঁচের। সমস্যার ঝটপট সমাধানের সে-ও বিশ্বাসী। ক্যাপ্টেন হারালান অবশ্য বাবার পীড়াপীড়িতে কথা দিলেন, একরোখা হবেন না। গোঁয়ার্তুমি করবেন না।

বললেন—'বেশ তো, আমি না হয় যাবো না। শায়েস্তাও করব না রাস্‌কেলটাকে। কিন্তু ধরুন সে যদি আসে আমার কাছে? ··যদি হামলা করে মার্কের ওপর? · যদি ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে আমাদের?'

ডক্টর রোডরিখ কোন জবাব দিতে পারলেন না।

কথাবার্তা ইতি ঘটল সেইখানেই। যাই ঘটুক না কেন, প্রতীক্ষায় থাকতে হয়ে আমাদের। উইলহেম স্টোরিজ কথামত কাজ শুরু করা না পর্যন্ত তো কিছু ঘটছে না, কালকের ঘটনাও কেউ জানতে পারছে না।

কিন্তু করবেটা কি উইলহেম? বিয়ে আটকাবে? কিন্তু কিভাবে? মার্কের ওপর গায়ের জোর ফলিয়ে, পাঁচজনের সামনে তাকে অপদস্থ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে কি? মায়রা রোডরিখের ওপরও বলপ্রয়োগ হতে পারে কি? কিন্তু যে বাড়ীতে তার প্রবেশ নিষেধ, সে বাড়ীতে সে ফের ঢুকবে কি করে? দরজা ভাঙার মত শক্তি নিশ্চয় তার নেই! সব চাইতে বড় কথা, বেশী বাড়াবাড়ি করলে ডক্টর রোডরিখ এবার বিনা দ্বিধায় ওপর মহলকে খবর পাঠাবেন। বেহুঁশ জার্মানের হুঁশ ফেরাতে হয় কি করে, সে বিদ্যেটায় তাঁরা আবার বিশেষ পোক্ত।

সেদিন ছাড়াছাড়ির আগে ডক্টর আবার পই পই করে ক্যাপ্টেনকে গোঁয়ার্তুমি করতে নিষেধ করলেন। উদ্ধত লোকটাকে ঢিট করতে যাওয়াটা এখন সমীচীন হবে না। নিমরাজী হলেন ক্যাপ্টেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মেয়েদেরকে নিয়ে মার্কের সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। আমার মন তখন অন্যত্র। মার্ক তা লক্ষ্য করে বার কয়েক টিপ্পনীও কাটল। প্রতিবারেই পাশ কাটানো জবাব দিলাম।

পথিমধ্যেই উইলহেম স্টোরিজের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম কি? না; উইলহেম ডক্টর রোডরিখকে যে হুমকি দিয়ে গেছে, সেই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসছিল মনের মধ্যে: 'এমন বাধা আসবে যে বিয়ে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। স্টোরিজ ফ্যামিলি এমন অনেক কায়দা জানে যা মানুষ তার সর্বশক্তি দিয়েও রোধ করতে পারবে না।' মানে কি কথাটার? ফাঁকা হুমকি হিসেবে উড়িয়ে না দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া চলে কি? মনে মনে ঠিক করলাম, ডক্টরের সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা হলেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

সেদিন গেল। তারপরের দিনও গেল। স্বস্তিভাবটা ফিরে আসতে লাগল মনের মধ্যে। উইলহেম স্টোরিজকে আর দেখা যায় নি। অথচ শহর ছেড়েও সে যায় নি কোথাও। বুলেভার্ড টেকেলির শ্যাওলা ধরা বাড়ীতে লোকও রয়েছে। ম্যানসনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি নিজেই দেখেছিলাম হারমান নামে চাকরটাকে বেরিয়ে আসতে। একবার উইলহেম স্টোরিজও আবির্ভূত হয়েছিল ছাদের সেই বুরুজে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল বুলেভার্ডের শেষ প্রান্তে—ডক্টর রোডরিখের বাড়ী সেই দিকেই।

তারপর, ১৭ই মে রাত্রে ঘটল সেই ঘটনা!

ক্যাথিড্র্যালের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। রাত্রে কারও পক্ষে ঢোকাও সম্ভব ছিলনা। যেই ঢুকুক না কেন, কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখতে পেত। তা সত্ত্বেও কে যেন মার্ক ভাইডালের সঙ্গে মায়রা রোডরিখের বিয়ের বিজ্ঞপ্তিকে যেন টান মেরে নিয়ে ফেলে গেল শতচ্ছিন্ন অবস্থায়। অন্যান্য বিয়ের নোটিশের সঙ্গে ঝুলছিল এদের নোটিশ। সব আছে—টুকরো টুকরো হয়েছে কেবল তাদেরটাই। দলাপাকানো ছেঁড়া টুকরোগুলো নজরে পড়ল সকাল হতেই।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন নোটিশ ঝোলানো হল আগের জায়গায়। কিন্তু একঘণ্টা পরেই—এবার স্পষ্ট দিবালোকে—নয়া নোটিশেরও হাল হল আগের নোটিশের মত। ১৮ই মে সারাদিনে একই ঘটনা ঘটল বারবার তিনবার। অথচ দুষ্কৃতিকারীর টিকির সন্ধানও কেউ পেল না। বেদম হয়ে শেষকালে ঠিক করা হল, যে ফ্রেমে নোটিশ ঝোলে, সেই ফ্রেমটাই মজবুত লোহার গ্রীল দিয়ে আড়াল করে রাখা হবে।

নোটিশ ছেঁড়ার মত একটা আহাম্মুকি প্রচেষ্টা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলল। অনেক কিছুই রটনা হল বিভিন্ন রসনায়। তারপর আর কারো কিছু মনে রইল না।

রইল শুধু আমার, ডক্টর রোডরিগের এবং ক্যাপ্টেন হারালানের। তিন-জনেই বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলাম। কাজটা যে কার, সে বিষয়ে মুহূর্তের সংশয়ও এল না কারো মনে; উইলহেম স্টোরিজ যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে আমাদের বিরুদ্ধে। এ যেন সেই লড়াই পর্বের প্রথম খণ্ডযুদ্ধ। বিঘোষিত বৈরিতার প্রথম টক্কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রহস্যজনক এই যে কাণ্ড, এর কোনো ব্যাখানা কারোর মাথাতে না এলেও, নাটের গুরুটিকে তো কল্পনা করা গেল। এই কাজে যার পরমোল্লাস, সে ছাড়া আর কে হতে পারে বলুন? এই যদি তার পয়লা হামলার নমুনা হয়, তাহলে এর পরের হামলাগুলি কি এর চাইতেও গুরুতর হবে? রোডরিখ পরিবারের ওপর প্রতিহিংসা-পর্ব কি এই ঘটনা দিয়েই শুরু হল?

পরের দিন খুব সকালে কাপ্টেন হারালান যখন ডক্টরকে খবরটা দিলেন, তখন তাঁর ক্রুদ্ধ মূর্তিটা অনুমান করে নিতে পারেন।

রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন—'সেই রাসকেলের কাজ ··কি ভাবে ছিঁড়ল জানি না—কিন্তু সে ছাড়া আর কেউ ছেঁড়েনি। ও কিন্তু থামবেনা—আরও নষ্টামি চালিয়ে যাবে। তার আগেই ওর বিটলেমি বন্ধ করতে হবে। যে ভাবেই হোক।'

আমি বললাম—'মাই ডিয়ার হারালান, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়, এমন কিচ্ছু করবেন না।'

'মাই ডিয়ার ভাইডাল, বদমাসটা বাড়ী থেকে বেরোনোর আগেই বাবা যদি খবর পাঠাতেন আমাকে, অথবা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও ঢালাও হুকুম দিতেন ওকে টাইট দেওয়ার, তাহলে কোনকালে সরিয়ে দিতাম পথের কাঁটা।'

'আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস, এ ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামানোই মঙ্গল।'

'কিন্তু ও যদি ফিচলেমো না থামায়?'

সেক্ষেত্রে পুলিশের শরণ নেওয়াই শ্রেয়। মায়ের কথা, বোনের কথা খেয়াল রাখবেন।'

'আপনি কি মনে করেন, নোটিশ কুচিকুচি হওয়ার কেলেংকারী ওদের কানে পৌছোবে না'?

'আমরা বলব না। মার্ককেও না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপরে দেখা যাবে কি করা যায়।'

'বিয়ে হয়ে গেলে?·· ধরুন, তার আগেই যদি কিছু ঘটে যায়?' সারাদিন চাপা উদ্বেগে কাঁটা হয়ে রইলেন ডক্টর রোডরিখ। কিন্তু মেয়ে-বউয়ের মাথায় সান্ধ্য মজলিশের প্রসঙ্গ ছাড়া রইল না আর কিছুই। সেই দিনই ইভনিং পার্টিতে সই পড়বে বিয়েব চুক্তিতে। বিস্তর নেমন্তন্ন পত্র ছেড়েছেন ডক্টর।

তিনি নিরপেক্ষ মানুষ – দহরম মহরম সব মহলেই। কাজেই তাঁর মত খানদানী ম্যাগিয়ার পরিবারে আসার আমন্ত্রণ পৌছোলো সৈনিক মহলে, ম্যাজিস্ট্রেট মহলে এবং পাবলিক অফিসার মহলে। দেড়শ অভ্যাগত কুলিয়ে যায়, এমনি একটি বড়সড় ঘরে ব্যবস্থা হল পার্টির। বিয়ে চুকে গেলে খাওয়া দাওয়া হবে গ্যালারীতে।

বিকেলের দিকে সম্পূর্ণ হল সব আয়োজন। জিরোতে গেলেন মহিলারা। ঠিক সেই সময়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম একটা জানলার সামনে। হঠাৎ মেজাজটা বেজায় খিঁচড়ে গেল উইলহেম স্টোরিজকে দেখে। লোকটা সেখানে বিনা মতলবে আচমকা এসে পড়েছে কিনা বুঝলাম না। মাথা হেঁট করে ধীর পদে হাঁটছিল সে নদীর তীর বরাবর। বাড়ীর সামনে এসেই কিন্তু সিধে হল শিরদাঁড়া। সটান তাকাল আমাদের দিকে। যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল দুই চোখে। সে কি জলন্ত চাহনি!

বার কয়েক সামনে পেছনে পায়চারী করল উইলহেমল। ম্যাডাম রোডরিখও লক্ষ্য করলেন তার পায়চারী। হাতের ইশারায় ডক্টরকে দেখালেন। ডক্টর এমন আশ্বাস দিলেন যাতে ভাবনা না বাড়ে। বিচিত্র লোকটার সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ বেমালুম চেপে গেলেন।

বলে রাখি, আমি আর মার্ক যখন হোটেলে ফিরছি, একটা বাগিচার মাঝে মুখোমুখি হয়েছিলাম উইলহেমের সঙ্গে। ভাইকে দেখেই সে যেন পাথর হয়ে গেল। ভাবসাব দেখে মনে হল, চড়াও হবে কিনা, তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়েছে। শেষ পর্যন্ত দাড়িয়েই রইল অনড় দেহে, ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ, মৃগীরুগির হাতের মত শক্তকাঠ হয়ে গেল হাত···· পড়ে যাবে নাকি? জ্বলন্ত দুই চোখ দিয়ে দিয়ে······যেন পুড়িয়ে মারতে চাইল মার্ককে। ভায়া কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করল না।

ছাড়িয়ে আসার পর শুধোলো মার্ক—'লোকটাকে দেখলে তো?'

'দেখলাম।'

'ওরই নাম উইলহেম স্টোরিজ। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম।'

'জানি।'

'জানো?'

'ক্যাপ্টেন হারালান এর আগে দেখিয়েছিলেন।'

'আমি তো ভেবেছিলাম লোকটা বিদেয় হয়েছে 'রাগ' থেকে।'

'এখন দেখা যাচ্ছে, হয় নি। হলেও আবার ফিরে এসেছে।'

'এলেই বা কি, গেলেই বা কি।'

'কিছুই না।' মুখে বড়াই করলাম বটে, মন কিন্তু বলল এসময়ে উইলহেম্‌ স্টোরিজ শহর-ছাড়া হলেই বরং অধিক স্বস্তি পাওয়া যেত।

রাত নটা নাগাদ প্রথম দিকের ঘোড়ায় টানা গাড়ীগুলো এসে দাঁড়ালো ডক্টর রোডরিখের বাড়ীর সামনে। ধীরে ধীরে ভরে এল ঘরগুলো। ইউনিফর্ম আর উৎসব-সজ্জার মাঝে মাঝে ঝলমল করতে' লাগল মেয়েদের বাহারি পরিচ্ছদ। অতিথিরা ঘুর-ঘুর করতে লাগলেন এ-ঘরে সে-ঘরে। গেলেন গ্যালারীতে। ডক্টরের পড়ার ঘরে সাজানো বিয়ের যৌতুক দেখে তারিফ করলেন। বিয়ের চুক্তিপত্রটা রাখা ছিল বিশাল ড্রইংরুমের একটা টেবিলের ওপর। আজ রাতেই সই পড়বে তাতে। আর একটা টেবিলে ছিল গোলাপ আর কমলা-কুঁড়ির ভারী সুন্দর একটা ফুলের তোড়া। ম্যাগিয়ার বিয়ের রীতি অনুযায়ী ফুলেব তোড়ার পাশেই মখমলের গদীতে রয়েছে কনের মুকুট।

সান্ধ্য-মজলিশ ভাগ করা হয়েছে সমান তিনভাগে। আগে কনসার্ট। শেষে বল-নাচের আসর। মাঝে সই হবে বিয়ের কনট্র্যাক্ট।

ম্যাগিয়াররা দারুণ সঙ্গীত পাগল। তাই কনসার্ট বাজনা উপভোগ করলেন প্রত্যেকে।

এরপর কনট্র্যাক্ট সই হবার পালা। যথোচিত ভাবগাম্ভীযর মধ্যে শেষ হল সই পর্বও। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি। অতিথিরা আসন ছেড়ে ছোট ছোট দল পাকিয়ে শুরু করলেন গুলতানি। কেউ কেউ গেলেন আলো-ঝলমলে বাগানে। হাতে হাতে চালান হতে লাগল মন-চাঙা-করা সরাব।

অর্কেস্ট্রা তৈরী হয়েছে নতুন গৎ বাজানোর জন্যে - ক্যাপ্টেন হারালান ইঙ্গিত করলেই মুখর হবে বাজনাগুলো। এমন সময়ে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল গ্যালারীর শেষের দিকে। যে দরজা দিয়ে গ্যালারী থেকে বাগানে ঢোকা যায়—গলাটা ভেসে এল সেইখান থেকেই। গলার আওয়াজ তখনো বেশ-খানিকটা তফাতে হলে কি হবে, কর্কশ কণ্ঠর নিনাদ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল দূর থেকেও। অদ্ভুত একটা গান গাইছে গলার মালিক। সে গানে না আছে মাত্রা, না আছে স্বর-মাধুর্য। গানের কথায় সুরের বাঁধুনির বালাই নেই, আছে কেবল কিম্ভূতকিমাকার অতি বিদঘুটে এক ছন্দ।

ওয়ল্‌স্‌ নাচ সবে শুরু হতে যাচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে নাচবার জন্যে জোড়ায় জোড়ায় তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল অতিথিরা। বিদিগিচ্ছিরি গানটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সকলের চরণ-যুগল। উৎকর্ণ হয়ে প্রত্যেকেই ভাবছিল, ব্যাপারটা কি? ইভনিং পার্টির প্রোগ্রাম নয় তো? হঠাৎ চমকে দেওয়ার জন্যে চেপে রাখা হয়েছিল এতক্ষণ?

ক্যাপ্টেন হারালান হন্ হন্ করে এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।

'এটা আবার কি?' শুধোলাম আমি।

'জানি না।' যে গলায় জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন, তাতে উদ্বেগ যেন ঝরে ঝরে পড়ল।

'গানটা আসছে কোত্থেকে! রাস্তা থেকে নয় তো?'

'না···মনে হয় না।'

বাস্তবিকই, এ গান গাইছে যে সে রয়েছে কিন্তু বাগানে। গাইতে গাইতে আসছে গ্যালারীর দিকে। দরজার মুখেই এসে গেছে হয়ত।

খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন ক্যাপ্টেন হারালান। টেনে নিয়ে গেলেন গ্যালারী আর বাগানের মাঝের দরজার দিকে। সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সারা বাগানটা চার চোখ দিয়ে চষে ফেললাম। আলো ঝলমল করছিল বাগানের এ-মোড় থেকে সে-মোড় পর্যন্ত··

অথচ, কাউকেই দেখতে পেলাম না দুজনে।

পাশে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর এবং ম্যাডাম রোডরিখ। দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর। ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন কেবল মাথা নেড়ে।

গানটা তবুও শোনা যাচ্ছিল। আগের থেকেও জোর শোনা যাচ্ছিল। আরও উদ্ধত কণ্ঠে গাইতে গাইতে যেন ক্রমশই এগিয়ে আসছে কাছে· আরো কাছে

মায়রার হাত নিজের হাতে নিয়ে মার্ক এসে দাঁড়াল আমাদের কাছে গ্যালারীর মধ্যে। ম্যাডাম রোডরিখ ফিরে গেলেন মেয়ে মহলে। উদ্বিগ্ন প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হল তাঁর ওপর। কিন্তু দেখে মনে হল জবাব দিতে পারছেন না।

'আমি গিয়ে দেখছি!' বলেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্যাপ্টেন হারালান। পেছনে পেছনে গেলেন ডক্টর রোডরিখ। জনাকয়েক চাকর নিয়ে আমিও গেলাম।

আচম্বিতে গাইয়ে লোকটা যেন গ্যালারীর কয়েক হাত দূরে এসেই বোবা হয়ে গেল।

বাগানে নেমে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমরা। আলোর দৌলতে ছায়া মায়ার চিহ্নমাত্র ছিল না বাগানে। তাই চুলচেরা তল্লাসি চালাতে পেরেছিলাম আমরা। তা সত্ত্বেও কাউকে পেলাম না···

তবে কি বুলেভার্ড টেকেলি দিয়ে রাত করে বাড়ী ফিরছে কোনো পথিক? গলা ছেড়ে গান গাইছে ফাঁকা রাস্তায়?

কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। স্পষ্ট দেখলাম খাঁ-খাঁ করছে বুলেভার্ড।

একটি মাত্র নিঃসঙ্গ আলো জ্বলছিল শ-পাঁচেক গজ দূরে বাঁদিকে—একটি মাত্র টিমটিমে আলো। ম্যাড়মেড়ে আলোটা জ্বলছে উইলহেম স্টোরিজের বাড়ীর ছাদে যে বুরুজ আছে, তার একটা জানলায়।

গ্যালারীতে ফিরে এলাম। অতিথিদের গাদাগাদা প্রশ্নে ঝালাপালা হয়ে গেল কান। জবাব একটাই ছিল: ইসারায় সবাইকে ওয়ল্‌স্‌ নাচ আরম্ভ করতে বলা।

সঙ্কেতটা ক্যাপ্টেন হারালানকেই দিতে হল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জুটি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন অভ্যাগতরা।

মুখবন্ধ সবে শেষ করেছে অর্কেস্ট্রা। তারপরেই গলাবাজিটা আবার শোনা গেল। গাইয়েকে কেউ দেখতে পেল না। গানটা কিন্তু এবার যেন ফেটে পড়ল ড্রইংরুমের ঠিক মাঝখানে।

শঙ্কিত হলেন অভ্যাগতরা। সেই সঙ্গে রাগে ঘেন্নায় জ্বলে উঠলেন প্রত্যেকেই। হেঁড়ে গলায় তারস্বরে গাওয়া হচ্ছে ফ্রেডরিক মার্গ্রেভ-এর 'হিম্ অফ হেট'—ঘৃণার স্তুতি-গান। ঘৃণার প্রচণ্ডতা বীভৎসভাবে মূর্ত হয়েছে বিখ্যাত এই জার্মান-স্তুতি-গানে। এ গান গাওয়া মানে সুপরিকল্পিতভাবে সরাসরি ম্যাগিয়ার স্বদেশপ্রেমকে হেনস্থা করা।

গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে সে গানে অথচ যার হেঁড়ে গলা ফেটে পড়ছে ড্রইংরুমের ঠিক মাঝখানে—তাকে কেউই দেখতে পাচ্ছে না গান যখন গাইছে, তখন সে দাঁড়িয়েও আছে সেখানে অথচ কারোরই চোখে পড়ছে না তার ছায়াটুকুও

নাচিয়েরা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গোটা ড্রইংরুম আর গ্যালারী জুড়ে, দেখতে দেখতে তাঁদের মধ্যে প্যানিক ছড়িয়ে পড়ল। বিষম আতঙ্কে বিশেষ করে কাঠ হলেন মেয়েরা।

হন্ হন্ করে ড্রইংরুমে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন হারালান। দুই চোখ ধক ধক্ করছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। দুহাত বাড়িয়ে উনি যেন ক্যাঁক করে ধরতে চাইছিলেন এমন একজনকে যাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে, 'হিম অফ হেট'-এর শেষ কথাটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নীরব হল কণ্ঠ।

তারপরেই আমি যা দেখলাম, শ-খানেক ব্যক্তিও তাই দেখলেন—অথচ আমার মতই চোখে দেখা দৃশ্যটাকে মন দিয়ে বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

টেবিলের ওপর রাখা ছিল ফুলের তোড়াটা। আচমকা টুকরো টুকরো

হয়ে গেল পুষ্প-স্তবক—চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ফুলগুলো এবং মনে হল কে যেন মাড়িয়ে পিষে গেল ছেঁড়া ফুলের রাশি ··তারপরেই কুচি কুচি হয়ে বিয়ের কনট্র্যাক্ট উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর !···

এবার ভয় পেলাম। অদ্ভুত এই ঘটনাস্থল ছেড়ে প্রত্যেকেই পালাতে চাইল বাইরে। মনকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি কি পাগল হয়ে গেছি? চোখের সামনে এই যে প্রহেলিকার পর প্রহেলিকার জাল বোনা হয়ে চলেছে, এসব কি আমার মন বিশ্বাস করছে ?

ক্যাপ্টেন হারালান ঠিক তখনি আমার পাশে এসে দাড়ালেন। বিষম রাগে ফ্যাকাশে মুখে বললেন দাঁতে দাঁত পিষে—'উইলহেম স্টোরিজ এসেছে! এ কাজ তার!'

উইলহেম স্টোরিজ? · ক্যাপ্টেনের মাথা কি খারাপ হয়ে গেল ?· ·

উনি না হলেও, আমি এবার ঠিকই পাগল হব। আমি ঘুমোইনি—জেগেই ছিলাম। স্বপ্নও দেখিনি—প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে ছিলাম। অথচ আমি দেখলাম ·হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখলাম—ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলের ওপর রাখা মখমলের গদী থেকে কনের মুকুট শূন্যে উঠছে। কার হাতে মুকুট শূন্যে উঠল, তা দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল শূন্যে ভাসতে ভাসতে ড্রইংরুম পেরিয়ে গ্যালারীর মধ্যে দিয়ে বাগানে মিলিয়ে গেল কনের মুকুট !

'আর না· আর সওয়া যায় না!'···দাঁত কিড়মিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন হারালান।

বলেই ছিটকে গেলেন ড্রইংরুম থেকে, বিজলী রেখার মতই ধেয়ে গেলেন হলঘরের ভেতর দিয়ে এবং রাস্তায় নেমেই ছুটলেন বুলেভার্ড টেকেলি বরাবর।

আমিও ঝটিতি পেছন নিলাম তাঁর।

আগে ক্যাপ্টেন, পেছনে আমি—এই ভাবেই দৌড়োলাম দুজনে। দৌড়োতে দৌড়োতে এসে দাঁড়ালাম উইলহেম স্টোরিজের ম্যানসনের সামনে। দেখলাম, বুরুজের একটা জানলা তখনো খোলা রয়েছে—অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জানলার ম্যাড়মেড়ে আলো। ফটকের হাতল ধরে জোরে নাড়া দিলেন ক্যাপ্টেন। কি করছি, অতশত না ভেবে, আমিও হাত লাগালাম ক্যাপ্টেনের সাথে। কিন্তু এক চুলও নড়াতে পারলাম না নিরেট ফটককে।

কয়েক মিনিট ধরে খামোকা মেহনৎ করে হাঁপিয়ে উঠলাম। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল রাগের মাত্রা। শেষকালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল বুদ্ধি বিবেচনা···

আচমকা কবজার ওপরে ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ভারী ফটক।

শুধু শুধু উইলহেম স্টোরিজকে দোষারোপ করছিলেন ক্যাপ্টেন হারালান ...উইলহেম স্টোরিজ বাড়ী ছেড়ে বাইরেই বেরোয়নি। বেরোয়নি বলেই সে নিজেই এসে খুলে ধরল ফটক এবং সশরীরে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকাল হতে না হতেই নানান রকম গুজব ছড়িয়ে গেল সারা শহরে আশ্চয এই কাণ্ডকারখানাকে কেন্দ্র করে। যেমনটি আশা করেছিলাম, দেখলাম ঘটলও তাই। সাধারণ মানুষ এসব ব্যাপারকে স্বাভাবিক বলে মানতেই চাইল না। অথচ আমার বিশ্বাস, যা কিছু ঘটেছে, সবই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত হতেই পারে না। সবই লৌকিক, অলৌকিক একেবারেই নয়। তবে হ্যাঁ, সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডগুলোর মনোমত ব্যাখ্যা খাড়া করাও দরকার। কিন্তু সেটা হল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

যে দৃশ্যের বর্ণনা এর আগে দিয়েছি, তারপর উৎসব যে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছিল, তা না বললেও চলে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল মার্ক আর মায়রা ফুলের তোড়া পা দিয়ে মাড়ানো, বিয়ের চুক্তিপত্র ফালি ফালি হয়ে উঠে যাওয়া এবং সবার চোখের সামনেই কনের মুকুট লোপাট হওয়া দেখে।

বিয়ের ঠিক আগেই একি কুলক্ষণ!

সেদিন কাতারে কাতারে লোককে দেখা গেল ছোট ছোট দল পাকিয়ে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। উত্তেজিত গুলতানিতে মুখর প্রত্যেকেই। কেউ কেউ অতিরিক্ত মাত্রায় রঙ-চড়ানো গালগল্প জুড়ে দিল। আর সবাই অস্বস্তিভরা চোখে ঘন ঘন তাকাতে লাগল বাড়ীর দিকে।

রোজকার মত সেদিন কিন্তু সকালে বাড়ীর বাইরে পা দেননি ম্যাডাম রোডরিখ। মেয়েও বাড়ী ছেড়ে নড়েনি—রয়েছে মায়ের কাছে। অদ্ভুত সেই ঘটনার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। এখন দরকার পুরো জিরেন।

আটটার সময়ে খুলে গেল আমার ঘরের দরজা। ডক্টর এবং ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্ক। চার জনের মধ্যে কিছু আলোচনার দরকার। হয়ত দু'একটা ব্যাপারে একমতও হতে হবে। প্রয়োজন হলে জরুরী ব্যবস্থার আয়োজনও করতে হবে। এত কথা রোডরিখের বাড়ীতে বলাটা সমীচীন হবে না। সারা রাত একসঙ্গে ছিলাম দুই ভাই। ভোরের আলো

ফুটতে না ফুটতেই মার্ক দৌড়েছিল ম্যাডাম রোডরিখ আর বাগদত্তার খবর নিতে। তারই কথায় ডক্টর আর ক্যাপ্টেন হারালান এসেছেন আমার ঘরে।

মার্ক বললে—'হেনরী, হুকুম দিয়ে এলাম—কাক পক্ষীকেও যেন ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। 'আড়িপাতার কোনো সম্ভাবনাই নেই এখানে। আমরা ছাড়া কেউ নেইও ঘরের মধ্যে।'

সে কী অবস্থা ভাইয়ের! কাল রাতে যে মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করেছে, আজ তা ভীষণভাবে পাণ্ডুর। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। অবশ্য পরিস্থিতি যে রকম ঘোরালো, ধাক্কাটাও সইতে হয়েছে তাকে সেই অনুপাতে। তার বেশী ঘাবড়ায়নি।

ডক্টর রোডরিখ নিজেকে জোর করে সামলানোর চেষ্টা করছিলেন। ছেলের অত চেষ্টা নেই। তাঁর দৃঢ়সংবদ্ধ ঠোঁট আর উত্তেজিত চাহনি দেখলেই পরিষ্কার মালুম হয় অষ্টপ্রহর এখন কি চিন্তা ঘুরছে মাথার মধ্যে।

ডক্টর বললেন—'মঁসিয়ে ভাইডাল, কাল রাতের ঘটনার সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় এবার বলুন।'

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, নাস্তিকের অভিনয় করে যাওয়াই ভাল। সবাই যা দেখেছি, তা নিয়ে যেন মোটেই মাথা ঘামাতে চাই না। ও সবে গুরুত্বও দিতে চাই না। যেহেতু ঘটনাগুলোর কোনো ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো যায় না, তাই উত্তম পন্থা হল এমন ভান করা যেন কোনো ঘটনাটাই তেমন অসাধারণ নয়। খাপছাড়া যেন কিছুই চোখে পড়েনি। তা সত্ত্বেও সত্যি কথা বলতে কি, ডক্টরের প্রশ্নে আমি বাস্তবিকই হকচকিয়ে গেলাম।

বললাম—'ডক্টর রোডরিখ, কাল রাতের ঘটনা এমন কিছু বিরাট ঘটনা নয় যে তা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হবে। এমনও তো হতে পারে, কেউ গাড়োয়ানী ইয়ার্কি করে গেছে? বলুন, কি বলবেন এবার, লোক ঠকানো যাদের কারবার, এমনি কোনো প্রবঞ্চক হয়ত জুটেছিল আপনার পার্টিতে··· আনন্দের হাটে নিজেও কিছু আনন্দ পরিবেশন করে গেছে ভেনট্রিলোকুইজম-এর পিলে চমকানো খেল দেখিয়ে···জানেন তো আজকাল এ কৌশল যারা শিখেছে, তারা অদ্ভুত ভেলকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে··'

ক্যাপ্টেন হারালান আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার চোখে চোখ রেখে মনের কথা ধরবার চেষ্টা করছিলেন। ওঁর চাউনির মানেটা অতি পরিষ্কার: 'এসব ছেলে ভুলোনো স্তোকবাক্য শুনে ঠকবার জন্যে আমরা আসিনি এখানে!'

ডক্টর বললেন—'মঁসিয়ে ভাইডাল, মাপ করবেন, ও সব জাদু ভেল্‌কিতে আমার একদম বিশ্বাস নেই··'

আমি বললাম—'ডক্টর, এ ছাড়া আর কিছু আমার মাথাতেও আসছে না। আর যা আছে, তা অলৌকিক আবিষ্কার· টেনে-টুনে সেরকম একটা মানে দাঁড় করানো যায় বটে ও ব্যাপারটা আমি আবার নাকচ করে রেখেছি গোড়া থেকেই· '

'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ফস্‌ করে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন হারালান, 'নেহাতই ইহলোকের ব্যাপার· কিন্তু কি কৌশলে তা ঘটে চলেছে, সে গুপ্ত রহস্য আমরা কেউই জানি না।'

'একই কথা হল', জেদ ছাড়লাম না আমি, 'কাল রাতে যে গলায় গান গাওয়া হয়েছে, সে গলা মানুষের গলা ছাড়া অমানুষিক নয় নিশ্চয় · সুতরাং তা ভেনট্রিলোকুইজম্‌-এর ভেল্‌কি হবে না কেন ? '

ডক্টর রোডরিখ যে ভাবে মাথা নাড়লেন যে, স্পষ্ট বোঝা গেল এ সব ব্যাখ্যায় তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

আমি বললাম—'আবার বলছি, উৎসবের ভীড়ে বাইরের লোকের ঢুকে পড়াটা বিচিত্র কিছু নয়। ড্রইংরুমে তার গোপন প্রবেশের উদ্দেশ্যই ছিল জার্মান-দেশে বানানো 'হিম্‌ অফ্‌ হেট' গেয়ে ম্যাগিয়ারদের স্বদেশপ্রেমকে আচ্ছা করে অপমান করে যাওয়া, তাদের জাতীয়তাবোধের ঝুঁটি ধরে নেড়ে যাওয়া।'

অনুমিতিটা বিশ্বাসযোগ্য। মেনে নিয়েও যে জবাব দিলেন ডক্টর, তাতে ঘোর-প্যাঁচ নেই মোটেই। মানে অতি সাদা।

বললেন,—'মঁসিয়ে ভাইডাল, আপনার কথা মেনে নিলেও রহস্য রহস্যই থেকে যাচ্ছে। আপনি বলছেন, হয় কোনো প্রবঞ্চক নয় কোনো বদমাস অপরিসীম ঔদ্ধত্য আর বুকের পাটা নিয়ে বাড়ী ঢুকেছিল কাল রাতে। ভেনট্রিলোকুইজম্‌-এর কারসাজিতে গানটা তার গলা থেকেই বেরিয়েছে। এ ব্যাখ্যা একেবারেই বিশ্বাস করি না আমি। যদিও বা তা সম্ভব হয়, ফুলের তোড়া আর বিয়ের কন্‌ট্র্যাক্ট কে ছিঁড়ল ? কনের মুকুট কার অদৃশ্য হাতে উধাও হল ? বলুন, কার কারসাজিতে এ জিনিস সম্ভব ?'

সত্যিই তো, ভেল্‌কির জাদুকর যতবড় কুশলী ম্যাজিশিয়ানই হোক না কেন, এ দুটি কাণ্ড তাদের কীর্তি হতেই পারে না। ধড়িবাজ ম্যাজিশিয়ানের অবশ্য অভাব নেই ! তবুও এ-কাণ্ড কি ম্যাজিকেও সম্ভব ?

ক্যাপ্টেন হারালান তখন বললেন—'মাই ডিয়ার ভাইডাল, আরও আছে।

ফুলের তোড়ার প্রতিটি ফুল যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেছে, বিয়ের কন্‌ট্র্যাক্ট যে হাজার কুচি করে উড়িয়ে দিয়েছে, ব্যায়ামবীরের মত যে কনের মুকুট বয়ে নিয়ে গেছে ড্রইংরুমের মাঝখান দিয়ে, তারপর চোরের মত উধাও হয়েছে দরজার বাইরে—সেও কি আপনার ভেনট্রিলোকুইজম্?'

জবাব দিলাম না আমি।

আরও গরম হয়ে বললেন ক্যাপ্টেন—'নাকি আপনি বলতে চান যে আমরা সবাই ভুল দেখেছি—মরীচিকার মত মায়ার খেলা নিয়ে ভয় পাচ্ছি?'

মরীচিকা তো নয়ই। একশ' জনেরও বেশী বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে বিস্ময়কর ঘটনাগুলো ঘটেছে একে একে! চোখের ভুল এক-আধজনের হতে পারে—সবার কি করে হয়?

সেকেণ্ড কয়েক মুখে কোনো কথা সরল না। তারপর ডক্টর তাঁর মত প্রকাশ করলেন।

বললেন—'যে রকমটি ঘটেছে, সেই রকম ভাবেই ঘটনার বিচার করা যাক। মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই। যা ঘটেছে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নেই। উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কেননা, সবই বাস্তব। তাই যদি হয়, তাহলে গাড়োয়ানী ইয়ার্কির প্রসঙ্গ এখানে আসছেই না। আমি তো বলব, আমাদের কোনো শত্রু উৎসব ভণ্ডুল করে দিয়ে চরম শোধ নিয়ে গেছে গতকাল।'

সিদ্ধান্তটা ফোঁপরা নয়—সমস্যাটিও সহজ নয়।

সবিস্ময়ে মার্ক বললেন—'শত্রু! আপনার, না আমার, ডক্টর রোডরিখ? চেনেন তাকে?...'

'চিনি', বললেন ক্যাপ্টেন হারালান। 'তোমার আগেই যে আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—সে।'

'উইলহেম স্টোরিজ?'

'উইলহেম স্টোরিজ।'

তখন মার্ককে সবই বলা হল। অ্যাদ্দিন যা চেপে রাখা হয়েছিল, খোলসা করা হল সব কিছু। দিন কয়েক আগেই কিভাবে বিয়ের নতুন চেষ্টা করে গেছে উইলহেম স্টোরিজ, ডক্টর তা বর্ণনা করলেন সবিস্তারে। কোন রকম শর্তের বালাই না রেখে মুখের মত জবাবটা কিভাবে দেওয়া হয়েছে, তাও জানল আমার ভাইটি। ফলে, রোডরিখ ফ্যামিলিকে এক হাত নেওয়ার জন্যে কি-কি হুমকি দিয়ে গেছে উইলহেম, সে কথাও বলা হল মার্ককে। হুমকি-গুলোর জাতই আলাদা—যে কারণে কাল রাতের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর

পেছনে উইলহেমের হাত না থেকেই পারে না—এমন একটা সন্দেহও উঁকিঝুঁকি মারছে সবার মনে।

মার্ক উত্তেজিত হয়ে বললে—'আশ্চর্য! এত কথা সবাই চেপে গেছেন আমার কাছে! বলছেন আজ, যখন মায়রার ওপর সত্যি সত্যিও চড়াও হয়েছে হতভাগা! এতক্ষণে সময় হল আপনার আমাকে হুঁশিয়ার করার!··· ঠিক আছে, উইলহেম স্টোরিজকে আমি দেখে নিচ্ছি···'

অনেকক্ষণ শলাপরামর্শ করার পরে, যুক্তিযুক্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল। আমি প্রস্তাব করলাম—'বন্ধুগণ, চলুন, টাউন হলে যাওয়া যাক। পুলিশ-প্রধান এখনো যদি এ ব্যাপারে আদ্যোপান্ত না শুনে থাকেন, তবে তাঁকে তা জানানো হোক। রোডরিখ পরিবারের সঙ্গে জার্মান ভদ্রলোকের সম্পর্কটা এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটা বলা হোক। সেই সঙ্গে বলা হোক উইলহেম স্টোরিজ, মার্ক আর তার বাগদত্তার ভবিষ্যৎ ভণ্ডুল করার জন্যে কি-কি ভয় দেখিয়েছে। মানুষের সব শক্তি দিয়েও যা রোখা যায় না, এমনি সব ভেল্‌কি দেখিয়ে নাকি সে বিয়ে ভণ্ডুল করবে। হুমকিটা ফাঁকা আস্ফালন বলেই যদিও আমার বিশ্বাস—মিছে তড়পানি। সব শোনার পর পুলিশ প্রধানই ঠিক করবেন বিদেশী জার্মানটার বিরুদ্ধে আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না।'

কথাটা মনে ধবল সবার। ঠিক হল, মার্ক যাবে ডক্টর রোডরিখের বাড়ীতে। আর আমি, ডক্টর এবং ক্যাপ্টেন যাবো টাউন হলে।

তখন বেলা সাড়ে দশটা। গত রাতের ঘটনা পৌঁছে গেছে 'রাগ' শহরের ঘরে ঘরে। তাই ডক্টর ছেলেকে নিয়ে টাউন হল যাচ্ছেন দেখে রাস্তার লোকে বুঝে নিল কেন যাওয়া হচ্ছে।

টাউন হল পৌঁছে খবর পাঠালেন ডক্টর। সঙ্গে খাসকামরায় ডেকে পাঠালেন পুলিশ ডিরেক্টর।

মঁসিয়ে হেনরিক স্টেপার্ক লোকটি আকার ছোটখাট হলে কি হবে, উৎসাহ উদ্যমে যেন সদাই ভরপুর। ভদ্রলোকের মনটা ষোল আনা ব্যবহারিক। গোয়েন্দাগিরির সহজাত প্রবৃত্তি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

বললেন, 'প্রথমেই একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ডক্টর রোডরিখ। এমন কিছু আপনি করেছেন কি যার জন্যে কারো ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন আপনি? ঘেন্না করে বলেই কি কেউ উঠে পড়ে লেগেছে আপনার ফ্যামিলির সবাইকে জব্দ করার জন্যে? ম্যাডমোয়াজেল মায়রা রোডরিখের সঙ্গে মঁসিয়ে মার্ক ভাইডালের আসন্ন বিয়েটাই কি এ সবের মূল?'

'আমার তাই মনে হয়।' বললেন ডক্টর।

'লোকটা কে বলে মনে হয়?'

'তার নাম উইলহেম স্টোরিজ।'

নামটা অবশ্য বেরুলো ক্যাপ্টেন হারালানের মুখ দিয়ে। শুনে, পুলিশ প্রধান তিলমাত্র অবাক হয়েছেন বলে মনে হল না।

ডক্টর তখন ফলাও করে বললেন কিভাবে উইলহেম স্টোরিজ তাঁর কন্যার পাণি-পীড়ন করতে চেয়েছিল, কিভাবে নতুন করে বায়না ধরেছিল এই সেদিন এবং প্রস্তাবটা ফের নাকচ হবার পর কিভাবে বিয়ে ভণ্ডুল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। ভয় দেখিয়ে বলেছিল, স্টোরিজ ফ্যামিলি এমন অনেক মন্ত্রগুপ্তি জানে যা নাকি মানুষ তার সর্বশক্তি দিয়েও রোধ করতে পারে না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক, 'তাই অমানুষিক কাণ্ড-কারখানার শুরু হল বিয়ের নোটিশ ছেঁড়া দিয়ে। কেউ তাকে দেখতেও পেল না।'

মঁসিয়ে স্টেপার্ক একমত হলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁরও মতে, সব কিছুর মূলে উইলহেম স্টোরিজের থাকাটা বিচিত্র নয়।

বললেন—'অনেকদিন ধরেই ওর ওপর আমার সন্দেহ আছে। নালিশ-টালিশ যদিও পাইনি কখনো। লোকটা থাকে গুপ্তভাবে, সবার অগোচরে। কেউ জানে না, সে কি নিয়ে থাকে, কিভাবে থাকে। লোকটার জন্ম স্প্রেমবার্গে, কিন্তু জন্মস্থান থেকে পিঠটান দিল কেন? ওর নিবাস দক্ষিণ প্রুশিয়ায়, এ তল্লাটের কেউ ওর জাতভাইদের দেখতে পারে না; তা সত্ত্বেও সে দেশ ছেড়ে ম্যাগিয়ারে থাকে কেন? একমাত্র বুড়ো চাকরকে নিয়ে বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ীতে অষ্টপ্রহর দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকে কেন? বাড়ীর চৌকাঠ কেউ মাড়ায় না কেন? ফের বলছি, ওর প্রতিটি কার্যকলাপ সন্দেহজনক, খুবই সন্দেহজনক।'

'এখন কি করতে চান, তাই বলুন মঁসিয়ে স্টেপার্ক,' শুধোলেন ক্যাপ্টেন হারালান।

'একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে,' জবাবে বললেন পুলিশ-চীফ। 'ও-বাড়ীতে এখুনি হানা দেওয়া দরকার। তা'হলেই মিলবে কিছু দলিল-দস্তাবেজ… কিছু সূত্র…'

'কিন্তু হানা দিতে গেলে গভর্ণরের হুকুমনামা দরকার না?' শুধোলেন ডক্টর রোডরিখ।

'গোলমাল তো একটা বিদেশীকে নিয়ে। শুধু বিদেশী বলে নয়, সে আবার

তড়পে এসেছে আপনার বাড়ী গিয়ে। কাজেই হিজ এক্সেলেন্সি হুকুমনামা মঞ্জুর করবেন—কোনো সন্দেহই নেই তাতে।'

'আপনারা একটু বসুন। প্যালেসে যাচ্ছি আমি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব হুকুমনামা নিয়ে—তছনছ করে ছাড়বো বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ী।'

আধঘণ্টা পরেই মঁসিয়ে স্টেপার্ক ফিরে এলেন হুকুমনামা নিয়ে। ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন গভর্ণর—যা খুশী করতে পারেন পুলিশ চীফ—প্রয়োজন মত যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

'জেন্টেলমেন,' বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক—'এবার আমার আগেভাগে এগোন দিকি। আপনার একপাশে আমি, আর একপাশে আমার পুলিশ দল। বিশ মিনিট লাগবে ও বাড়ী পৌঁছোতে। রাজী?'

'রাজী'। জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন হারালান। ওঁর সঙ্গেই টাউন হল থেকে বেরোলাম আমি—রওনা হলাম বুলেভার্ড টেকেলির দিকে।

নবম পরিচ্ছেদ

মঁসিয়ে স্টেপার্ক যেদিক দিয়ে যাবেন, সে-পথ গিয়েছে শহরের উত্তরাঞ্চল দিয়ে। ওঁর পুলিশ বাহিনী কিন্তু এগোবেন শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে। ক্যাপ্টেন হারালান আর আমি রওনা হব ড্যানিউবের পাড় বরাবর।

মোড় ঘুরে এগোলাম বুলেভার্ড টেকেলি বরাবর। থামলাম উইলহেম স্টোরিজের বাড়ীর সামনে।

পকেটে হাত পুরে এক ভদ্রলোক পায়চারী করছিলেন ফটকের সামনে। ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি।

পুলিশ চীফ-ই বটে। পূর্বব্যবস্থামত আমি আর ক্যাপ্টেন হারালান গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হল ছ'জন সাদা-পোষাকী পুলিশ! মঁসিয়ে স্টেপার্কের অঙ্গুলি হেলনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রেলিং বরাবর। সঙ্গে করে একজন তালার মিস্ত্রী এনেছে ওরা। হয়ত জোর করে দরজা খুলতে হতে পারে।

যথারীতি সব ক'টা জানলা বন্ধ। বুরুজের গবাক্ষে পর্দা টানা। ফলে বুরুজের ভেতরে কি আছে, দেখা যাচ্ছে না।

আমি বললাম মঁসিয়ে স্টেপার্ককে—'ভেতরে কেউ নেই—থাকতে পারে না।'

উনি বললেন—'সেইটাই তো দেখতে চাই। বাড়ী ফাঁকা থাকলে অবাক হব বৈকি। বাঁদিকের চিমনীটা দেখুন—ধোঁয়া উঠছে না?'

বাস্তবিকই ছাদের চিমনি দিয়ে ভুষোভর্তি এক ঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এল ভক্ করে।

'মনিব বাড়ী না থাকলে, চাকরটা তো আছে।' বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। 'দুজনের একজন হাজির থাকলেই হল। দরজা খুলতে একজনই যথেষ্ট।'

আমি তখন ভাবছিলাম, যেহেতু ক্যাপ্টেন হারালান উপস্থিত, অতএব উইলহেম স্টোরিজ অনুপস্থিত থাকলেই মঙ্গল। বাগ শহর ছেড়ে লম্বা দিলে আরো মঙ্গল।

রেলিং-য়ে লাগানো লোহার পাতের ওপর জোরে কড়া ঠুকলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। সেকি আওয়াজ! তারপব প্রতীক্ষায় বইলাম ভেতর থেকে দরজা খোলাব।

এক মিনিট গেল। কেউ এল না। ফের ঝন্‌ঝন্ শব্দে নড়ে উঠল কড়া।

'কানে কালা নাকি।' বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। তালা-মিস্ত্রীব দিকে ফিরে হুকুম দিলেন—'খোলো।'

যন্ত্রপাতির ভেতর থেকে একটা যন্ত্র বেছে নিল মিস্ত্রী। তালাব গর্তে তালাখোলা কাঠি ঢুকতে না ঢুকতেই দু-ফাঁক হয়ে গেল ফটক।

পুলিশ-চীফ, আমি এবং ক্যাপ্টেন হাবালান ঢুকলাম উঠোনের ভেতর। সঙ্গে বইল চাবজন পুলিশ, বাইবে দুজন।

তিন ধাপ সিঁড়ি পেবিয়েই বাড়ীব দরজা। উঠোনেব দরজাব মত এ-দরজাও বন্ধ।

পাল্লাব ওপব তিনবার হাতের ছড়ি ঠুকে শব্দ করলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

সাড়া নেই। কোনো শব্দ ভেসে এল না বাড়ীব ভেতর থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তালার মিস্ত্রী। সব খোল চাবির তোড়া থেকে আবার একটা চাবি বেছে নিয়ে ঢোকালো তালার ফুটোয। কে জানে হুঁশিয়ার উইলহেম স্টোরিজ পুলিশকে বাড়ী ঢুকতে না দেবার মতলব করে হয়তো দুটো-তিনটে তালা এঁটে বসে আছে এ দরজায়—নয়তো হুড়কো তুলে দিয়েছে ভেতর থেকে।

কিন্তু সেরকম কিছুই তো দেখা গেল না। অতি সহজেই খুলল তালা এবং দুহাট হল দরজা।

'চলুন, ভেতরে ঢোকা যাক।' বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

দরজার মাথায ফ্যান-লাইটের আলো লোহার ঝাঁজরির ফাঁক দিযে ছড়িয়ে

পড়েছে গলিপথে। অপর প্রান্তেও আলো আসছে কাঁচের জানলা দিয়ে। অন্য একটা দরজার গায়ে বসানো জানলাটা। সে দরজা খুললেই বাগান।

গলিপথে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হেঁকে উঠলেন পুলিশ-চীফ—'ভেতরে কেউ আছে ?'

জবাব নেই। বার কয়েক আরো জোরে চেঁচিয়েও সাড়া এল না ভেতর থেকে। কান খাড়া করে, খুব মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করে ক্ষীণ একটা আওয়াজ অবশ্য কানে ধরা পড়েছিল। মনে হল যেন পাশের একটা ঘরে কি যেন হড়কে গেল ··তবে সেটা কানের ভুল না হয়েই যায় না।

গলিপথ দিয়ে হন হন করে হেঁটে গেলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। আমি রইলাম পেছনে। আমার পেছনে ক্যাপ্টেন হারালান।

সিঁড়ির পাহারায় রইল একজন পুলিশ।

দরজা খুলতেই গোটা বাগানের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান। ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘেসো জমি। না জানি কতদিন ঘাস কাটা হয়নি লনের। ফলে, লম্বা লম্বা অধেক শুকনো ঘাসগুলো যেন ধুঁকছে জমিতে। ঘেসো-জমি ঘিরে একটা চক্রাকার পথ। বেশ ঘন ঝোপের বর্ডার দিয়ে ঘেরা রাস্তা। এর ঠিক পেছনেই দেখা যাচ্ছে লম্বা-লম্বা গাছের সারি। গাছগুলো নিশ্চয় পোঁতা হয়েছিল পাঁচিলের গা-ঘেঁষে। এখন তাদের উঁচু মাথা প্রতিবেশী পাঁচিলের স্কন্ধভূষাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে।

অবহেলার ছাপ ফুটে রয়েছে সব কিছুর মধ্যে।

তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হল বাগান। রাস্তার ওপর কিন্তু টাটকা পদচিহ্ন চোখে পড়ল। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। বাড়ীর এদিকের জানলাগুলো বন্ধ বাইরের খড়খড়ি দিয়ে। দোতলার শেষের জানলাটাই কেবল খোলা সিঁড়ি আলো করার জন্যে।

পুলিশ-চীফ বললেন—'ওরা সবে বাড়ী ফিরেছে দেখা যাচ্ছে। তাই দরজায় শুধু তালা দেওয়া—খিল দেওয়া হয়নি ··হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে বোধহয়··· ভয়ও পেয়েছে।'

আমি বললাম—'আপনার ধারণা তাহলে ওরা আগেই খবর পেয়েছে ? না, মশাই না। আমার তো মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে।'

কিন্তু তাতে মঁসিয়ে স্টেপার্কের সংশয় যে গেল না, তা তাঁর ঘাড় নাড়া দেখেই বুঝলাম।

আমি তখন বললাম—'যাই হোক, চিমনী থেকে ধোঁয়া যখন বেরুচ্ছে। তখন বাড়ীর কোথাও না কোথাও আগুন জ্বালানো হয়েছে।'

'খোঁজো আগুনটা!' হুকুম দিলেন পুলিশ-চীফ।

উঠোনের মত বাগানটাও বিলকুল ফাঁকা কিনা এবং সত্যিই কেউ সেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে কিনা, এ বিষয়ে আগে মনের সব সংশয় মেটালেন পুলিশ-চীফ। তারপর অর্ডার দিলেন দরজা বন্ধ করে ফের বাড়ীতে ঢুকতে।

গলিপথ দিয়ে যাওয়া যায় চারটে ঘরে। বাগানের গা-ঘেঁসা ঘরটিতে কেউ বুঝি রান্নাবান্না করছিল। আরেকটা ঘর দিয়ে যাওয়া যায় সিঁড়িতে। সিঁড়ি উঠেছে দোতলায় এবং সেখান থেকে চিলে কোঠায়।

খানাতল্লাসি শুরু হল রান্নাঘর থেকে। জানলা খুলে দিল একজন পুলিশ—তুলে নিল খড়খড়ি। খড়খড়ির কাঠে দেখলাম লজেন্স-আকারের ক্ষুদে ক্ষুদে ফুটো। অতি সামান্যই আলো আসছিল সেই ছিদ্রপথে।

রান্নাঘরের আসবাবপত্র এতই সাদাসিদে যে আর বলবার নয়। যেটুকু না থাকলেই নয়—আছে শুধু তাই। লোহার একটা উনুন। উনুনের চিমনী অদৃশ্য হয়েছে মস্ত একটা চুল্লীর মাথার ওপরকার আচ্ছাদনের তলায়। দুপাশে দুটো বাসনপত্র রাখার তাকঅলা আলমারী। মাঝখানে একটা টেবিল। দুটো বেতের চেয়ার। দুটো কাঠের টুল। দেওয়ালে ঝুলছে কিছু বাসন-কোসন। এককোণে মেঝেতে বসানো গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক···ওজন আর পেণ্ডুলামের ভারে দিব্বি চলছে ঠিক্‌টিক্‌ শব্দে। ওজন দেখে বোঝা গেল, গত সন্ধ্যায় দম দেওয়া হয়েছে ঘড়িতে।

উনুনে তখনও কিছু কয়লা পুড়ছে। ফলে যে ধোঁয়া উঠছে, বাইরে থেকে আমরা তাই দেখছি।

'রান্নাঘর রয়েছে,' বললাম আমি—'কিন্তু রাঁধুনি কোথায়?'

'রাঁধুনির মনিবটাই বা কোথায়?' বললেন ক্যাপ্টেন হারালান। 'খুঁজেই দেখা যাক,' জবাব দিলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

একতলার যে-দুটো ঘরে আলো আসছিল উঠোন থেকে, এবার একে একে দেখা হল সেই ঘর দুটি। একটা ঘর ড্রইংরুম। মান্ধাতা আমলের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। কার্পেট, পর্দা, কেদারার ওয়ার্ড—সব কিছুই জার্মানে তৈরী। কিন্তু ব্যবহারে ব্যবহারে দফারফা হয়ে এসেছে। ম্যাণ্টেলপীস, মানে, জলন্ত কাঠ রাখবার পেল্লায় লোহার জোড়া-পাত্রর ঠিক ওপরকার তাকে, বসানো একটা কারুকাজ করা ঘড়ি। বদরুচি না থাকলে এমন কায়দায় কেউ ঘড়ি বসায় না। দুটো কাঁটাই নিশ্চল। কাঁচের ওপর ধূলোর স্তর। অর্থাৎ দীর্ঘদিন অচল হয়ে রয়েছে ঘড়ি বেচারী। একটা দেওয়ালে জানালার দিকে মুখ করে

ঝোলানো একটা ছবি। ডিমের মত ফ্রেমে বাঁধানো প্রতিকৃতি। একটা গুটোনো কাগজে নাম লেখা : অটো স্টোরিজ।

চেয়ে রইলাম আমরা প্রতিকৃতির দিকে। বলিষ্ঠ ডিজাইন, রঙের কাজ স্থূল ধরনের। তলায় নাম সই করেছেন এক অজ্ঞাত শিল্পী। সব মিলিয়ে ছবির মত ছবি বটে। খাঁটি শিল্প।

ক্যাপ্টেন হারালান তো চোখ সরাতে পারলেন না ক্যানভাস থেকে।

আমার কথাই বলি। অটো স্টোরিজের মুখ গভীর ছাপ আঁকল আমার অন্তরের অন্দরে। কারণটা কি? বর্তমান মানসিক অবস্থার জন্যেই কি ও-মুখ এতটা দোলাচ্ছিল আমার মনে? নাকি, পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অজ্ঞাতসারেই আচ্ছন্ন হয়ে আসছিলাম আমি? আলগা হয়ে যাচ্ছিল আমার মনের বাসা?

যাই হোক, শূন্য ঘরে মহাপণ্ডিত অটো স্টোরিজকে মনে হল যেন কল্প-লোকের প্রাণী। মস্ত মাথা, উস্কখুস্ক চুল, উন্নত কপাল, জ্বলজ্বলে চোখ দেখে দেখে মনে হল প্রতিকৃতিটি বুঝি জীবন্ত। মনে হল যেন নড়ছে ওঁর ঠোঁট। মনে হল বুঝি বা এই মুহূর্তে ফ্রেম থেকে এক লাফে নেমে দাঁড়িয়ে অপার্থিব কণ্ঠে উনি হুংকার দিয়ে উঠবেন :

'কি হচ্ছে এখানে? আমার শান্তি বিঘ্নিত করা। এতবড় স্পর্ধা কার?'

ভেনেসিয়ান খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা জানলা দিয়ে আলো যা আসছিল, তা অতি সামান্য। খড়খড়ি খোলার দরকারও ছিল না। আলো অন্ধকারে প্রতিকৃতিটাকে মনে হল আরো অদ্ভুত, আরো বলিষ্ঠ। মনে দাগ কেটে যাওয়ার মত জোরদার।

অটো এবং উইলহেম স্টোরিজের মধ্যে চেহারার মিল দেখে পুলিশ-চীফ মনে হল তাজ্জব হয়ে গেছেন।

আমাকে বললেন—'বয়সের ফারাক না থাকলে বাপের ছবির সঙ্গে ছেলের ছবির কোনো তফাৎ থাকত না। দুজনেরই চোখ একই ধাঁচের, কপাল একই গড়নের, বিশাল ঘাড়ের ওপর খাড়া করা মুণ্ডুটোও যেন একই মাথা···ভাবসাব তো দেখছি রীতিমত পৈশাচিক! কি ইচ্ছে জানেন? ইচ্ছে হচ্ছে দুজনকেই ধরে মন্ত্র ফুঁকে ভূত ঝেড়ে দিই।'

'তা যা বলছেন,' সায় দিয়ে বললাম! 'বাপ বেটার চেহারায় আশ্চর্য মিল।'

ক্যাপ্টেন হারালান যেন পেরেক পোঁতা হয়ে আটকে গিয়েছিলেন ছবির

সামনে মেঝের ওপর। এমন অসাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বা ছবির মানুষ জ্যান্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

'ক্যাপ্টেন, আসবেন তো?' শুধোলাম আমি।

করিডর দিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ঘরটাকে কারখানা বলা যায়। কিন্তু ছিরিছাঁদ মোটেই নেই। সবই এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। সাদা কাঠের তাক, রাশি রাশি বই ঠাসা প্রতিটি তাকে। অধিকাংশ কেতাব বাঁধাই হয় নি। বেশীর ভাগ বই দেখলাম গণিত, রসায়ন আর পদার্থবিদ্যার ওপর লেখা। এককোণে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি; একটা পোর্টেবল ফার্নেস, বকযন্ত্র; অ্যালেমবিক, মানে চুয়ানোর সাবেকি পাত্র; এ ছাড়াও কয়েকটা ধাতুর নমুনা চোখে পড়ল; আমি হেন ইঞ্জিনীয়ারও চিনতে পারলাম না সে-সব ধাতু—মনে হল নতুন ধরনের কিছু ব্যাপার। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর পাহাড় প্রমাণ কাগজপত্র আর লেখবার সরঞ্জাম। সেই সঙ্গে তিন চারটে মোটা মোটা কেতাব—অটো স্টোরিজ সারা জীবনে যা লিখেছেন তারই অমনিবাস ভল্যুম। পাশেই একটা পাণ্ডুলিপি। হেঁট হয়ে দেখলাম, বইটা অপটিক্স অর্থাৎ দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোক বিজ্ঞান নিয়ে লেখা। অটো স্টোরিজের বিখ্যাত সই রয়েছে এ-পাণ্ডুলিপিতেও। কাগজপত্র, কেতাব, পাণ্ডুলিপি—সমস্ত বাজেয়াপ্ত করে গালামোহর করে রাখা হল।

খানাতল্লাসি করে এ-ঘরে এমন কিছু আর পাওয়া গেল না যা আমাদের কাজে লাগতে পারে। যখন চলে আসছি, তখন মঁসিয়ে স্টেপার্কের চোখে পড়ল একটা কিম্ভূতকিমাকার গড়নের নীলচে রঙের শিশি। ম্যাণ্টলপিসের ওপর রাখা ছিল শিশিটা।

গোয়েন্দা-মনের সহজাত অনুসন্ধিৎসার জন্যেই হোক, কি নিছক কৌতূহলের তাগিদেই হোক, শিশিটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। উদ্দেশ্য ছিল হিসেবী চোখে খুঁটিয়ে দেখা। কিন্তু গোড়াতেই মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলেন নিশ্চয়। নইলে ম্যাণ্টলপিসের একেবারে ধার ঘেঁসে রাখা শিশিটা ওঁর হাতের মুঠোয় আসতে না আসতেই মেঝেতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে কেন?

হলদেটে রঙের একটা পাতলা তরল পদার্থ গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। খুবই উদ্বায়ী পদার্থ—এত তাড়াতাড়ি উড়ে যেতে লাগল যে তৎক্ষণাৎ দেখা গেল খানিকটা বাষ্প। সেই সঙ্গে নাকে এল একটা অদ্ভুত গন্ধ। সে গন্ধের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার মত কিছুই মাথায় আসছে না। তবে, গন্ধটা খুবই ফিকে—এত ফিকে যে নাকে ধরা পড়েও যেন পড়তে চাইছে না।

মঁসিয়ে স্টেপার্ক বলে উঠলেন—'আরে! ঠিক সময়ে আছাড় খেলো তো শিশিটা।'

'তা যা বলেছেন,' টিপ্পনী কাটলাম আমি। 'শিশিতে অটো স্টোরিজের আবিষ্কার আছে কিনা।'

'অটো স্টোরিজের ছেলের কাছে ফরমুলা তো আছে,' বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। 'কাজেই আর এক শিশি বানিয়ে নিতে পারবে'খন।' তারপর দরজার দিকে হুকুম ছাড়লেন—'চলো দোতলায়।' যাবার সময়ে অবশ্য করিডোরে একজন সাগরেদকে মোতায়েন করে যেতে ভুললেন না।

রান্নাঘরের সামনেই যে দরজা, তার চৌকাঠ পেরোতেই সিঁড়ি। কাঠের রেলিং দেওয়া। আমাদের পায়ের ভাবে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে কাতরে উঠল সিঁড়ি।

চাতালে উঠে দেখলাম পাশাপাশি দুটো ঘর। তালা নেই দরজায়। কাজেই তামার হাতল ধরে শুধু ঠেলা মারতেই দুহাট হল পাল্লা।

প্রথম ঘরটা নিঃসন্দেহে উইলহেম স্টোরিজের শোবার ঘর। ঘরে আসবাব বলতে একটা লোহার খাট, খাটের পাশে টেবিল, ওক্ কাঠের জামাকাপড় রাখার আলমারী, তামার পায়াওলা প্রসাধন-টেবিল, আরামকেদারা, পুরু মখমল মোড়া হাতলওলা চেয়ার এবং আরও দুটি চেয়ার। বিছানার চাদর নেই; জানলায় পর্দা নেই। আসবাবপত্রের ধরন দেখলে বোঝা যায় যে-টুকু না হলেই নয়, সেইটুকু ছাড়া বাড়তি আসবাবকে ঠাঁই দেওয়া হয়নি ঘরের মধ্যে। দরকারী কাগজপত্র একখানাও নেই, না আছে ম্যান্টলপিসের ওপর, না আছে এককোণে রাখা ছোট্ট গোলটেবিলের ওপর। অত ভোরেও বিছানা পরিষ্কার হয় নি। না হলেও রাত্রে যে কেউ শুয়ে গেছে বিছানায়, এমন অনুমান করাটা অসঙ্গত হবে না।

প্রসাধন-টেবিলে পরীক্ষা করতে গিয়ে মঁসিয়ে স্টেপার্ক দেখলেন, বেসিনে জল রয়েছে এবং কিছু সাবানের বুদবুদ জলে ভাসছে।

বললেন—'চব্বিশ ঘণ্টা আগে এ জল কেউ ব্যবহার করলে সাবানের বুদবুদ চব্বিশঘণ্টা পরে আর থাকত না। কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি, লোকটা এখান থেকে কেটে পড়ার আগে আজ সকালেই বেসিনে মুখ ধুয়েছে।'

আমি বললাম—'তাই যদি হয়, তাহলে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে কি? অবশ্য আপনার স্যাঙাতদের যদি দেখে ফেলে তাহলে আলাদা কথা।'

'সে যদি আমার স্যাঙাতদের দেখে, তাকেও দেখবে আমার স্যাঙাতরা।'

ফলে, তাকে আমার কাছেই নিয়ে আসা হবে—আমার তাই হুকুম। তবে আমার তো মনে হয় না ও ধরা দেবে নিজেকে।'

ঠিক সেই সময়ে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনলাম। শব্দটা এল পাশের ঘর থেকে। মেঝের আল্‌গা তক্তা কে যেন এইমাত্র মাড়িয়ে গেল।

এ-ঘর থেকেই পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা ছিল। কাজেই ঘুরে গিয়ে চাতাল দিয়ে ফের পাশের ঘরে ঢোকার দরকার হল না।

একলাফে আগে পুলিশ-চীফ, পেছনে ক্যাপ্টেন হারালান পৌছোলেন মাঝের দরজার সামনে এবং টান মেরে হুহাট করলেন পাল্লা।

ভুল শুনেছিলাম নিশ্চয়। কেননা, ঘরে কেউ নেই।

এমনও হতে পারে, শব্দটা এসেছে ওপরের ঘর থেকে। চিলেকোঠার সেই ঘর থেকেই তো বুরুজে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত ঘরটার আসবাবপত্র দেখা গেল প্রথম ঘরের চাইতেও সাদাসিদে। মজবুত ক্যানভাস ফিট করা একটা ফ্রেম, বহু-ব্যবহারে চ্যাপ্টা একটা তোষক, কয়েকটা মোটা কম্বল, একটা উলেব বেড-কভাব, এক জগ জল, ম্যাণ্টলপিসের ওপর বালি পাথরের একটা বেসিন, ম্যাণ্টলপিসের চুল্লীতে পোড়াকাঠের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, মোটা খসখসে কাপড়ের কয়েকটা পোশাক, ওক্‌কাঠের একটা পেটিকা যার মধ্যে বিস্তর গেরস্থালী কাপড চোপড়।

নিঃসন্দেহে এ ঘরে বুড়ো চাকর হাবমান থাকে। পুলিশ-চীফ আরো একটা জিনিস দেখালেন। আলো বাতাস ঢোকাব জন্যে প্রথম ঘরের জানলা মধ্যে মধ্যে যদিও বা খোলা হয়, দ্বিতীয় ঘরের উঠোনমুখো জানলাগুলো বারোমাসই বন্ধ থাকে। কথাটা যে নির্জলা সত্যি, তা পরখ করতেই প্রমাণিত হল। জানলার ছিটকিনি দারুণ শক্ত হয়ে গিয়েছে। খড়খডির লোহার কাজ মরচে ধরে ক্ষয়ে এসেছে।

যাই হোক, এ-ঘর বিলকুল ফাঁকা। একই ব্যাপাব যদি বুরুজ, চিলেকোঠা এবং রান্না ঘবের নীচে পাতাল-ঘরেও দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে মনিব এবং ভৃত্য, হুজনেই পয়াকার দিয়েছে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে নিশ্চয় ফের ফিরে আসার জন্যে নয়।

মঁসিয়ে স্টেপার্ককে আমি শুধোলাম—'তদন্তর খবরটা আগেভাগে উইলহেম স্টোরিজ জেনে ফেলেনি তো?'

'না, মশায়, না। আমার ঘরে লুকিয়ে না থাকলে, কিম্বা হিজ এক্সেলেন্সির ঘরে ঘাপটি মেরে না থাকলে আমাদের আসার খবর তার জানা সম্ভব নয়। এই দুটো ঘরেই আলোচনা করেছিলাম ওকে নিয়ে।'

'বুলেভার্ডে আসবার সময়ে আপনাদের দেখে ফেলেছিল নিশ্চয়।'

'হতে পারে—দেখে ফেললেও পালাবে কিভাবে?'

'পেছনকার খোলা মাঠ দিয়ে।'

'এত কম সময়ে বাগানের অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোতেই পারে না। তাছাড়া ওদিকে রয়েছে কেল্লার পরিখা। সেটাও টপকে যাওয়ার সাধ্যি কারো নেই।'

ওঁর মতে আমরা যখন বাড়ীতে হানা দিয়েছি, তার অনেক আগেই হারমানকে নিয়ে বাড়ীর বাইরে গিয়েছে উইলহেম স্টোরিজ।

ঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে গেলাম আমরা। তিন তলায় ওঠার সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা একটা আওয়াজ কানে ভেসে এল। দারুণ জোরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল নীচের তলায় সিঁড়ি। কে যেন বেগে ওপরে উঠছে অথবা নামছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শব্দ শুনলাম। আছড়ে পড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে যন্ত্রণায় গুঙিয়ে ওঠা।

সিঁড়ির রেলিঙয়ে ভর দিয়ে হেঁট হয়ে দেখলাম, পাঁজরে হাত বুলোতে বুলোতে ওপরে উঠছে একজন পুলিশম্যান। নীচের তলায় একে পাহারায় রেখে আসা হয়েছিল।

'ব্যাপার কি, লাডউইগ?' শুধোলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

লোকটা যা জবাব দিল, তা এই—সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এমন সময়ে শুনতে পেয়েছিল ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ—যা আমরাও শুনেছি ওপর থেকে। ঝাঁ করে ঘুরে বেচারী দেখতে গিয়েছিল কি ব্যাপার—সবেগে ঘুরতে গিয়েই বোধহয় পা পিছলে গিয়েছিল। দুটো পা-ই সরে গিয়েছিল ধাপ থেকে। ফলে সটান চিৎপটাং হয়ে পড়েছে মেঝেতে। পিঠে লেগেওছে নিদারুণ। অবশ্য পড়ার কারণটা এখনও ধোঁয়াটে ওর কাছে। ওর মতে, কে যেন ওর পা ধরে হয় ঠেলে দিয়েছে, নয় হ্যাঁচকা টান মেরেছে। ফলে, তাল সামলাতে না পেরে পপাত ধরণীতল হতে হয়েছে বেচারাকে। শেষের কথাটা যদিও দিব্যি গেলেই বলল কনস্টেবল, তবুও বিশ্বাস হল না কারুর। কেননা, উঠোনের দরজায় আর একজন পাহারাদার ছাড়া গোটা নীচের তলায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না।

'হুঁ।' বেজায় চিন্তিত মুখে বললেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

এক মিনিট পরেই পৌঁছোলাম তিনতলায়। চিলেকোঠা ছাড়া এ-তলায় আর কিছু নেই। ছাদের তিনকোনা পাঁচিলের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত টানা চিলে কোঠা। ছাদের দুটো ছোট ছোট স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছিল ঘরের মধ্যে। একনজরেই দেখা গেল ঘর শূন্য—কেউ লুকিয়ে নেই।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ধ্যাবড়া মই। মই পৌঁছেছে বুরুজের মধ্যে। ছাদ জুড়ে ঠেলে ওঠা বুরুজে উঠতে হলে যে দরজা পেরোতে হবে সেটি ছাদের সঙ্গে শুইয়ে লাগানো। মানে, চোরা-দরজা। পাল্লাটা ঝুলছে একটা ওজনের ভারে।

মঁসিয়ে স্টেপার্ককে আমি বললাম—'চোরা-দরজা তো দেখছি খোলা।' মঁসিয়ে স্টেপার্ক অবশ্য তার আগেই মইয়ের ধাপে একটা পা দিয়েছেন।

বললে—'হ্যাঁ, মঁসিয়ে ভাইডাল, দরজা খোলা। হাওয়ার ঝাপটাও আসছে খোলা দরজা দিয়ে। এরই আওয়াজ একটু আগে আমরা শুনেছিলাম নিশ্চয়। আজকের হাওয়া বইছেও খুব জোরে। ছাদের বায়ু নির্দেশক মুরগীটাও দিব্বি ক্যাঁচ-কোঁচ করছে।'

আমি বলে উঠলাম—'কিন্তু যে আওয়াজ একটু আগে আমরা শুনেছি, সেটা পায়ের আওয়াজ নয় কি?'

'পায়ের আওয়াজ হলে তো কাউকে দেখা যাবে? কেউ ছিল কি?'

'ওপরেও থাকতে পারে তো, মঁসিয়ে স্টেপার্ক?'

'আকাশের বাসায়?'

ক্যাপ্টেন হারালান মুখে চাবি এঁটে কথাবার্তা শুনছিলেন আমাদের। এখন শুধু বুরুজের দিকে আঙুল তুলে বললেন—'ওঠা যাক।'

মঁসিয়ে স্টেপার্কই আগে উঠলেন। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত একটা দড়ি ঝুলছিল। সেই দড়ি ধরে মই বেয়ে উঠে গেলেন বুরুজের মধ্যে।

পেছনে উঠলেন ক্যাপ্টেন হারালান। তাঁর পেছনে আমি। তিনজনে ওঠবার পর দেখা গেল, ঘরের যা আয়তন, তিনজনেই যেন ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে।

ঘর তো নয়, যেন একটা খাঁচা। লম্বায় চওড়ায় আটফুট, উচ্চতায় দশফুট। প্রায় অন্ধকারই বলা চলে। মটকার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচ বসানো সত্বেও আলো আসছিল অতি সামান্য।

অন্ধকারের কারণ উলের পর্দাগুলো ছিল বলে। বাইরে থেকেও আমরা তা দেখেছি। পর্দা টেনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় ভেসে গেল ঘর।

আগেই বলে রাখি, সারা বাড়ীতে যা দেখে এলাম, বুরুজে তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। অর্থাৎ, ঘরের মধ্যে কাকপক্ষীকেও দেখা গেল না। সুতরাং, পুলিশ বাহিনী নিয়ে গোটা বাড়ী ঘেঁটিয়েও মঁসিয়ে স্টেপার্ক যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। এ বাড়ীর রহস্যের কোনো কিনারাই হল না।

আমি ভেবেছিলাম, নিশ্চয় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা চলে বুরুজে। আকাশ পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়। ভুল ভেবেছিলাম। ঘরে আসবাব বলতে দেখলাম কেবল একটা টেবিল আর একটা কেঠো আর্ম চেয়ার।

টেবিলের ওপর অনেকগুলো খবরের কাগজ পাওয়া গেল। বুদাপেস্তে যে কাগজে উইলহেম স্টোরিজের আসন্ন বার্ষিকীর খবর ছাপা হয়েছিল, সে কাগজটিও ছিল গাদার মধ্যে। সব ক'টি কাগজই বাজেয়াপ্ত করলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

বেশ বোঝা গেল, কারখানায় বা ল্যাবোরেটরীতে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলে জিরেন নিতে এ-ঘরেই আসত উইলহেমের পুত্ররত্ন। বিশেষ ঐ প্রবন্ধটিও তার নজর এড়োয়নি। নিজের হাতে লাল কালি দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে।

আচম্বিতে একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল। রাগ আর বিস্ময় মিশোনো ভয়ানক চীৎকার।

মটকায় লাগানো তাকে একটা কার্ডবোর্ড বাক্স দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন হারালান। শুধু দেখেই ক্ষান্ত হন নি, খুলেছিলেন

খুলে কি বার করলেন বাক্সর ভেতর থেকে?

ডক্টর রোডরিখের বাড়ী থেকে গত রাতে লোপাট হওয়া সেই কনের মুকুটটি!

দশম পরিচ্ছেদ

এরপর আর কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। উইলহেম স্টোরিজ নিশ্চয় আছে এর মধ্যে।

মই বেয়ে নেমে এলাম আমরা। শেষবারের মত খুঁটিয়ে ঘরে ঘরে চোখ বুলিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

সামনের দরজায় আর ফটকে তালা দিয়ে শীলমোহর করে দেওয়া হল। ঢোকবার সময়ে বাড়ীটাকে যে রকম ছন্নছাড়া পরিত্যক্ত ভাবে দেখেছিলাম, ফেলেও এলাম সেইভাবে। চীফের অর্ডারে দুজন কনস্টেবল অবশ্য রয়ে গেল সেই শ্রীহীন ভবনকে চোখে রাখার জন্যে।

বিদায়কালে মঁসিয়ে স্টেপার্ক পই-পই করে বলে দিলেন, গোটা তদন্তটা যেন গোপন থাকে। বুলেভার্ড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রোডরিখ ভবনে ফিরে এলাম আমি আর ক্যাপ্টেন হারালান।

বাড়ীতে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই চাকর আমাদের নিয়ে গেল পড়ার ঘরে। ডক্টর এবং মার্ক বসেছিলেন সেখানে আমাদের পথ চেয়ে। চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই এমন মুষল ধারে প্রশ্নবৃষ্টি আরম্ভ করলেন যে বুঝলাম মনে মনে কি দারুণ অধীর হয়ে উঠেছেন দুজনে।

বুলেভার্ড টেকেলির•বাড়ীতে যা-যা ঘটেছে তা সবিস্তারে বলবার পর ওঁদের ঘৃণা আর বিস্ময়ের ধরনটা আঁচ করা যায়। আমার ভায়া তো কিছুতেই সামলাতে পারল না নিজেকে। ক্যাপ্টেন হারালানের মতই সে-ও উইলহেম স্টোরিজকে টিপে মারতে চাইল আদালত নাক গলানোর আগেই। বৃথাই আমি প্রতিবাদের স্বরে জানালাম যে এতক্ষণে হয়ত শত্রু শহর ছেড়েই লম্বা দিয়েছে।

ডক্টর বললেন, উনি দেখা করবেন 'রাগ' শহরের লাটসাহেবের সঙ্গে। উইলহেম স্টোরিজ বিদেশী। সুতরাং তাকে দেশছাড়া করার নোটিশ জারী করতে মোটেই দ্বিধা করবেন না লাটসাহেব।

ফের বুঝিয়ে বলতে হল আমাকে ম্যাডাম রোডরিখ আর তাঁর মেয়ে যেন এসব ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ না জানেন। পুলিশ যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এবং উইলহেম স্টোরিজের মুখোস খসিয়েছে—এ প্রসঙ্গ ওঁদের কাছে গুপ্ত রাখা বিশেষ দরকার।

মুকুট সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব মনে ধরল সবার! মার্ক বলবে, সে নিজেই বাগানে পেয়েছে মুকুটটা। তাতেই বোঝা যাবে, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কেউ গাড়োয়ানী ইয়ার্কি করে গেছে। বিটলেমো ঘুচিয়ে দেওয়া হবে তার ঘাড় ধরে টেনে আনার পর।

সেই দিনই গেলাম টাউন হলে। মুকুট ফেরৎ চাইলাম মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছ থেকে। রাজী হলেন ভদ্রলোক। মুকুট নিয়ে বাড়ী এলাম আমি।

সেই রাতেই ম্যাডাম রোডরিখ আর তাঁর মেয়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে রয়েছি, এমন সময়ে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেল মার্ক। ফিরে এসেই বললে—'মায়রা, মাই ডিয়ার মায়রা, দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ।'

'আমার মুকুট!' সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল মায়রা। ছুটে এল মার্কের দিকে।

মার্ক বললে—'হ্যাঁ, মুকুট। পেলাম বাগানের মধ্যে। ঝোপের আড়ালে পড়েছিল।'

'কিন্তু গেল কিভাবে? তাতো বুঝলাম না।' অবাক হলেন ম্যাডাম রোডরিখ।

'কি ভাবে আবার।' জবাব দিলেন ডক্টর। 'ফাজলামি করেছে কেউ। অভ্যাগতদের সঙ্গে ভিড়ে নষ্টামি করে গেছে। রাবিশ ব্যাপার। এ নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না।'

'মার্ক, ডিয়ার মার্ক, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' চোখ ছলছল করে উঠল মায়রার।

পরের কটা দিনে নতুন কিছুই ঘটল না।

মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছ থেকে ২৯শে মে একটা খবর পেলাম। অটো স্টোরিজের মৃত্যুবার্ষিকী নাকি ২৫ তারিখে উদ্‌যাপিত হয়েছে স্প্রেমবার্গে। উৎসবে বিপুল দর্শক সমাগম হয়েছিল। শহরের মানুষ ছাড়াও আশপাশের শহর থেকে লোকে এসেছিল কাতারে কাতারে—এমন কি বার্লিন থেকেও। সে কি ভীড় গোরস্থানে—জায়গা দেওয়াই দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভীড়ের চাপে দুর্ঘটনা ঘটেছে বিস্তর। দম আটকে মারাও গেছে অনেক। উৎসবের দিন গোরস্থানে তিলধারণের জায়গা না থাকায় বহু লোক পরের দিন সেখানে ঢুকতে পেরেছে—উৎসবের দিন নয়।

ভুললে চলবে না, অটো স্টোরিজের জীবন ও মরণ—দুটোই রাশিরাশি উপকথায় ছেয়ে গিয়েছে। অলীক হোক আর নাই হোক, কাহিনীগুলো এদের মনের মধ্যে এমন শেকড় গেড়ে বসেছে যে দলে দলে এসেছে তাঁর মরণের পরেও তাকলাগানো ভেল্‌কি দেখবার আশায়। উৎসব প্রাঙ্গণে পিলে চমকানো ঘটনা ঘটা উচিত ছিল। আর কিছু না হোক, প্রুশিয়ান পণ্ডিত ভদ্রলোক কফিন খুলে নিজে থেকেই উঠে এলেও চলত। সেই মুহূর্তে যদি ব্রহ্মাণ্ডের সব কানুন ওলোটপালোট হয়ে যেত, তাহলেও কেউ অবাক হত না। পৃথিবী সহসা উল্টোদিকে আবর্তন শুরু করত অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাকসাট আরম্ভ হলেই সৌরজগতে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যেত। এ-রকম আরও কত কাণ্ড হলেও হতে পারত।

লোকের মুখে মুখে এমনি কত রসালো গুজব শোনা গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি দেখা গেল? না, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অনুষ্ঠিত হল উৎসব পর্ব। সমাধিস্তম্ভ উলটে পড়ল না, কবর-নিবাস ছেড়ে মৃত পণ্ডিত ধাঁ করে উঠে এল না। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে যে নিয়মে পৃথিবী পাকসাট দিয়ে আসছে, সে নিয়মেও কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না।

কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার হল অটো স্টোরিজের গুণধর পুত্রের সেখানে সশরীরে

উপস্থিত থাকাটা। সে যে 'রাগ' শহরে নেই, এইটাই হল তার অকাট্য প্রমাণ। আমি মনে মনে ভাবলাম, আবার ফিরে না আসার জন্যেই বোধহয় এই পথ নিয়েছে উইলহেম।

খবরটা পাওয়ামাত্র আমি ক্যাপ্টেন হারালান আর মার্কের কানে তুললাম। লাটসাহেবের সঙ্গে মঁসিয়ে স্টেপার্কের কথাবার্তা হল তিরিশে মে।

'নতুন কিছু শুনলেন?'

'না, মঁসিয়ে ল্য গভর্ণর।'

'উইলহেম স্টোরিজ কি ফের ফিরতে চায় রাগে? সম্ভাবনা আছে?'

'না।'

'বাড়ীতে এখনো পাহারা রয়েছে তো?'

'দিবারাত্রি।'

'আমার উচিত এ-কেলেংকারীর আদ্যোপান্ত বুদাপেস্তে লিখে পাঠানো। উত্তেজনা যতটা হওয়া উচিত ছিল, তার চাইতেও বেশী হয়েছে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার অধিকারও আমার রয়েছে।' বললেন গভর্ণর।

পুলিশ-চীফ তখন জবাব দিলেন—'উইমহেম স্টোরিজ যতক্ষণ 'রাগ' শহরে মুখ না দেখাচ্ছে, ততক্ষণ ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ২৫ তারিখে সে স্প্রেমবার্গে ছিল, সে খবর তো আমরা পেয়েছি।'

'তা ঠিক, মঁসিয়ে স্টেপার্ক। কিন্তু ফিরে আসার লোভ যখন হবে উইলহেমের, তখন তাকে রোখবার ব্যবস্থা করা দরকার তো।'

'এ আর এমন কি কঠিন কাজ মঁসিয়ে ল্য গভর্ণর। লোকটা বিদেশী। শহর থেকে বহিষ্কারের একটা হুকুমনামাতেই কাজ হবে।'

গলা চড়িয়ে বললেন গভর্ণর—'শুধু 'রাগ' শহর থেকে নয়, গোটা অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান অঞ্চল থেকে নির্বাসন দেওয়ার হুকুম বলুন।'

সায় দিলেন পুলিশ-চীফ—'অর্ডারটা পেলেই সীমান্ত প্রহরীদের খবর পাঠিয়ে দেব, মঁসিয়ে ল্য গভর্ণর।'

সেই মুহূর্তে সেইখানে বসেই সই করা হল হুকুমনামায়। সারা রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল উইলহেম স্টোরিজের।

ডক্টর তার পরিবারবর্গ আর বন্ধুবান্ধবদের নিশ্চিন্ত করার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হল। কিন্তু অলৌকিক কাণ্ডকারখানার গুপ্ত রহস্য গুপ্তই রয়ে গেল আমাদের কাছে।

এর পরে যা ঘটবে, সেই মুহূর্তে আমরা তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। বিয়ে হবে পয়লা জুন। পাকা ব্যবস্থা।

পয়লা জুন যেন আর আসতে চায় না। এক-একটা ঘণ্টা এক-একটা বছরের মত সুদীর্ঘ মনে হচ্ছিল। সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত রাখা আমার কর্তব্য জেনেও আমি নিজেই ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলাম। তাই, যখন তখন বুলেভার্ড টেকেলি ঘুরে আসার বাতিক দাঁড়িয়ে গেল আমার। কিসের তাড়নায় যেতাম, কোন অজানা শিহরণ আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যেত সেখানে, তা নিজেই জানিনা।

পুলিশ হানা দিয়ে আসার পর থেকে স্টোরিজ ভবন একইভাবে ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দরজা জানলা আগের মতই ছিল বন্ধ, উঠোন আর বাগানে কারো টিকিও দেখা যেত না। বুলেভার্ড টেকেলিতে দিবারাত্রি টহল দিত কয়েকজন কনস্টেবল। সাবেকি কেল্লাবাড়ীর আলসে থেকে খোলা মাঠ পর্যন্ত—সর্বত্র ছিল তাদের গতি। বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ানোর সাহস হয়নি এখনো মনিব বা চাকরের। তা সত্ত্বেও মনটা ছোঁক-ছোঁক করত আমার। ভূতে পাওয়া মানুষের মত বারবার যেতাম আর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মার্ক আর ক্যাপ্টেন হারালানকে অত বুঝিয়েও নিজের মনের সঙ্গে অত কস্তাকস্তি করেও যদি দেখতাম কেল্লাবাড়ীর ল্যাবোরেটরীর চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে অথবা বুরুজের বাতায়ন দিয়ে কেউ মুখ বাড়াচ্ছে—তাহলেও মোটেই অবাক হতাম না।

রাগ-শহরের জনগণ প্রাথমিক ভয়ের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এমন কি, ভুতুড়ে ব্যাপারটা নিয়ে গুজগুজ-ফুসফুস করতেও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ভয়ে মরছিলাম আমরা, মানে ডক্টর রোডরিখ, আমার ভায়া, ক্যাপ্টেন হারালান, আমি নিজে। উইলহেমের প্রেত যেন শয়নে-স্বপনে আমাদের তাড়া করছিল।

তিরিশে মে বিকেল চারটে নাগাদ সবাই জড়ো হলাম ডক্টর রোডরিখের বাড়ীতে। বুলেভার্ড টেকেলিতে দাঁড়িয়ে দুটো ঘোড়ার গাড়ী। একটায় থাকবে মায়রা—সঙ্গে বাবা-মা এবং ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড বিচারপতি নিউম্যান। অপরটায় থাকবে মার্ক—সঙ্গে ক্যাপ্টেন হারালান, তাঁর দোস্ত লেফটেন্যাণ্ট আর্মগার্ড এবং আমি। কনের সাক্ষী হবেন মঁসিয়ে নিউম্যান আর ক্যাপ্টেন হারালান। মার্কের সাক্ষী হব আমি আর লেফটেন্যাণ্ট আর্মগার্ড।

ক্যাপ্টেন হারালান আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। সত্যিকারের 'বিয়ে সেদিন হবে না—হবে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে একটা অনুষ্ঠান। গভর্ণর অনুমতি দেবেন। তারপর বিয়ে হবে পরের দিন গির্জের মধ্যে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত এবং আক্ষরিক অর্থে ওদের বিয়ে না হলেও, দুজনের মধ্যেকার বন্ধন কিন্তু বিয়ের বন্ধনের চাইতে তিলমাত্র কম হবে না। কেননা, কোনো দুর্বিপাকের ফলে বিয়ে যদি নাও হয় ওদের, তাহলে সারা জীবনটা দুজনকে চিরকুমার-চিরকুমারী হয়ে থাকতে হবে।

ম্যানসনের প্রধান তোরণ পেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ী দুটো এগোলো লাট-সাহেবের প্যালেসের দিকে।

চত্বরে আর প্যালেস প্রাঙ্গণেই দেখা গেল অগুন্তি লোক এসে দাঁড়িয়েছে বর কনেকে দেখবে বলে। হয়তো গতবারের ঘটনা মনে পড়ায় ভীড় আরো বেড়েছে। অথবা নতুন কিছু তাজ্জব ঘটনা দেখবার আশায় এসেছে।

প্রাঙ্গণে ঢুকলো গাড়ীদুটো। এসে দাঁড়ালো সিঁড়ির সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার হাতে হাত রেখে মায়রা এবং মঁসিয়ে নিউম্যানের হাতে হাত রেখে ম্যাডাম রোডরিখ ঢুকে পড়ল ফেস্টিভ্যাল হলে। পেছনে মার্ক, ক্যাপ্টেন হারালান, লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড এবং আমি।

উৎসব-অধিকর্তা ঘোষণা করলেন, গভনর আসছেন। ওঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সবাই।

সিংহাসনে গিয়ে বসলেন গভর্ণর। কনের বাপ-মাকে জিজ্ঞেস করলেন মার্ক ভাইডালের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে তাঁদের মত আছে কিনা। এরপর চিরাচরিত প্রশ্ন বর কনেকেও জিজ্ঞেস করলেন গভর্ণর।

'মার্ক ভাইডাল, শপথ করছেন মায়রা রোডরিখকে পত্নী হিসেবে বরণ করবেন?'

'শপথ করছি।' জবাব দিল ভাই আমার। ওকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছিল।

'মায়রা রোডরিখ, শপথ করছেন মার্ক ভাইডালকে পতিরূপে গ্রহণ করবেন?

'শপথ করছি।' জবাব দিল ম্যাডমোয়াজেল মায়রা!

মহামান্য লাটসাহেব তখন ঘোষণা করলেন—'মহারানী এমপ্রেস প্রদত্ত অধিকার বলে এবং 'রাগ'-শহরের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, আমি, 'রাগ' শহরের গভর্ণর, মার্ক ভাইডালের সঙ্গে মায়রা রোডরিখের বিয়ের লাইসেন্স দিচ্ছি। আমাদের ইচ্ছে এবং আদেশ—বিয়ে যেন আগামকালই যথাবিহিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হয় শহরের ক্যাথিড্রাল চার্চে।'

সুচারুভাবে শেষ হল অনুষ্ঠান। যাঁরা এসেছিলেন, নতুন ভেল্‌কি তাঁদের মেজাজ খিঁচড়ে দেয়নি। মুহূর্তের জন্যে এমনি একটা আশঙ্কায় আমার মন যে দোলেনি, তা নয়। তবে যে দলিলে আমরা সই করলাম, তা শতছিন্ন হয়নি। যে লেখনী নিয়ে সাক্ষীরা বা বর-কনে সই দিল, তাও হাত থেকে কেউ কেড়ে নেয়নি।

উইলহেম স্টোবিজ তাহলে স্প্রেমবার্গেই রয়ে গিয়েছে! স্বদেশবাসীদের আনন্দবর্ধনের জন্যে সেখানে থাকলেই তো হয়। বাগ-শহরে এলে ক্ষমতার দফারফা হয়ে যাবে যে।

জাদুকর উইলহেমকে নিয়ে বড্ড বেশী নাচানাচি হয়েছে। তবে মনে তার যে ইচ্ছেই এখন থাকুক না কেন, মায়রা রোডরিখ মার্ক ভাইডালের বউ যদি নাও হয় এখন, ইহজীবনে আর কারোরই হতে পারবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

পয়লা জুন এসে গিয়েছে।

পৌনে দশটায় বাড়ী ছেড়ে রওনা হল সারি সারি গাড়ী। আবহাওয়া অতি চমৎকার। রোদ উঠেছে। কাতারে কাতারে লোক চলছে ক্যাথিড্রাল অভিমুখে। সবারই চোখ সারির সামনের গাড়ীর দিকে। কনের রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ সবাই। মুগ্ধ বরকে দেখেও। জানলায় জানলায় হাসিভরা মুখ। চারিদিক থেকে অভিনন্দনের পর অভিনন্দন। প্রত্যাভিনন্দনের যেন শেষ নেই।

আমি তো বলেই ফেললাম—'শহরের এই মধুর স্মৃতি চিরদিন থেকে যাবে আমার মধ্যে।'

জবাব দিলেন লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড—'মঁসিয়ে ভাইডাল, এ সম্মান শুধু আপনাকে নয়, আপনার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সকে সম্মান জানাচ্ছে হাঙ্গারিয়ানরা। ফ্রান্সকে আমরা ভালবাসি। আনন্দের তুফান ছুটেছে কেন জানেন? এ-বিয়ে ফ্রান্সের একজনকে নিয়ে আসছে রোডরিখ পরিবারে।'

স্কোয়ারে পৌঁছে গাড়ী আর এগোতে চায় না—এত ভীড়।

ক্যাথিড্রাল থেকে পুব-হাওয়ায় ভেসে এল আনন্দমুখর ঘণ্টাধ্বনি। দশটার একটু আগেই সারি ঘণ্টার সে-কি মিষ্টি ঐকতান শুরু হয়ে গেল সেণ্ট মাইকেলের সুর মিলিয়ে।

দশটা পাঁচে আমাদের গাড়ী দুটো এসে দাঁড়ালো সোপান শ্রেণীর সামনে। দুহাট হয়ে গেল মাঝের দরজা।

গির্জের ভিতরে তিল ধারনের জায়গা নেই। জনগণ যেখানে পেরেছে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বাইরের সিঁড়িতেও তেমনি ভীড়।

সমাগত দর্শকদের মনের মধ্যে অতীত ঘটনাবলী উঁকিঝুঁকি মেরে থাকলেও ক্যাথিড্র্যালের মধ্যে সে-সবের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল কি? এক কথায়—না। কারণ অলৌকিক ঘটনাবলীর পেছনে নাকি দৈত্য-দানবের হাত ছিল। গির্জের মধ্যে ভূত প্রেতদের জারিজুরী খাটে না। ভগবানের চৌকাঠ মাড়ানোর ক্ষমতা কোনো পিশাচের নেই।

দুই সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে মার্ক আর মায়রার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রধান পুরুৎমশায়।

বললেন কম্পিত কণ্ঠে—অথচ সূচীভেদ্য স্তব্ধতার দরুন গির্জের প্রতিটি কোন থেকে স্পষ্ট শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ, বললেন—'মার্ক ভাইডাল, মায়রা রোডরিখকে বধূরূপে বরণ করতে রাজী আছো?'

'আছি,' জবাব দিল আমার ভাই।

'মায়রা রোডরিখ, মার্ক ভাইডালকে স্বামীরূপে মেনে নিতে রাজী আছো?'

'আছি,' মায়রার গলা অনেকটা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো।

অভিষেক বয়ান আওড়ানোর আগে মার্কের হাত থেকে বিয়ের আংটি-গুলো নিয়েছিলেন প্রধান পুরোহিত। আশীর্বাদ পর্ব সাঙ্গ হলে উনি হেঁট হয়ে একটা আংটি পরাতে গেলেন তরুণী কনের আঙুলে···

ঠিক তখুনি একটা চীৎকারে খান্ খান্ হয়ে গেল গির্জের স্তব্ধতা·· আতঙ্কে বিহ্বল সেই চীৎকার রক্ত হিম করে দিল অনেকের।

আর, তারপরেই আমি যা দেখলাম, আরও হাজার জনে দেখল সেই একই দৃশ্য।

ডীকন আর সাব-ডীকন টলমল করতে করতে পিছু হটে গেলেন, দেখে মনে হল যেন বলিষ্ঠ ঠেলায় ঠিকরে পড়লেন দুজনে। প্রধান পুরুতের মুখ কেঁপে উঠল থর থর করে। নিদারুণ যাতনায় কুঁকড়ে গেল মুখমণ্ডল, আতঙ্ক ফুটে উঠল দুই চোখে। মনে হল, অদৃশ্য একটা প্রেতের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন উনি। পরক্ষণে তাঁকেও হাঁটু ভেঙে লুটিয়ে পড়তে হল মেঝেতে· ····

প্রায় একই সঙ্গে ঘটল এর পরের ঘটনাটা। বিদ্যুৎ-চমকের মতই পর-পর ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল বলে কেউ বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কি ঘটছে, তাই বুঝতে পারার আগেই আমার ভাই আর মায়রা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর·····

ঠিক তারপরেই আংটিগুলো উড়ে এল গির্জের মাঝখানে, একটা সজোরে ঠিকরে পড়ল আমার মুখে

এরপর শোনাগেল সেই কণ্ঠ। আমি শুনলাম। আমার সঙ্গে শুনল সহস্র জনে। ভয়াল সেই কণ্ঠ আমরা সবাই চিনি। উইলহেম স্টোরিজ কথা কইছে:

'নিপাত যাক নবদম্পতি· নিপাত যাক!'

অভিসম্পাতটা এল যেন অতি কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল জনতা। সাংঘাতিক হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। মায়রা উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারল না। বুক ফাটা শব্দে কেঁদে উঠে অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ল মার্কের বাহুমধ্যে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বচক্ষে দেখা ক্যাথিড্র্যালের অঘটন এবং বোডবিথ ভবনের কাণ্ডকারখানার পরিণতিতে তফাৎ ছিল না। দুটো ব্যাপারই যে একই হাতের কারসাজি তাতে সন্দেহ নেই। দুক্ষেত্রেই উইলহেম স্টোরিজ এসেছে। একা। একাই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড করে পণ্ড করে গেছে উৎসব। কিন্তু সবটাই কি নিছক হাত সাফাই? মানতে পারলাম না আমি। হতেই পারে না। গির্জের কেলেঙ্কারী অথবা কনের মুকুট চুরী—কোনটাকেই হাতের জাদু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাজেই সিরিয়াস হতে হল আমায়। জার্মানট নিশ্চয় বাপের কাছ থেকে কোনো বৈজ্ঞানিক গুপ্ত বিদ্যে শিখেছে। এ বিদ্যের বলে অদৃশ্য হওয়া যায়। বিদ্যেটা নিশ্চয় এমন একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের ফল যার বিবরণ এখনো কারও জানা নেই। অদৃশ্য হওয়াটা খুব মুশকিলের ব্যাপার কি? · কিছু কিছু আলোক রশ্মি অর্ধস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে সরাসরি গলে যায় যার ফলে অর্ধস্বচ্ছ বস্তুটাকে আংশিক স্বচ্ছ বলে মনে হয়। কিন্তু একি ভাবছি আমি? উল্টোপাল্টা চিন্তা করছি কেন · বাবিশ, যত্তো সব বাবিশ চিন্তা এসব বাজে চিন্তা যাতে কাউকে বলে না ফেলি, সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে আমাকে।

জ্ঞান ফেরার আগেই অজ্ঞান অবস্থাতেই মায়রাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। নিজের ঘরে বিছানা শোয়ানোর পর সেবাযত্নের ত্রুটি হল না—কিন্তু বৃথাই। ডক্টরের অত চেষ্টা সত্ত্বেও জ্ঞান ফিরল না মায়রার। জ্ঞান না

ফিরলেও নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সমানে, প্রাণটাও আটকে রইল খাঁচায়। এত ধাক্কায় সে ঘায়েল হয় নি। শেষের আবেগোচ্ছ্বাস তাকে নিকেশ করেও করতে পারল না। সত্যিই বিস্মিত হলাম আমি।

ডক্টর রোডরিখের অনেক সহযোগী ডাক্তার পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এলেন মায়রার বিছানার পাশে। ওর নিশ্চল দেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। মোমের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল মায়রার মুখ। চোখের পাতা বোজা। বুকের খাঁচায় হৃদপিণ্ড ধুকপুক করছে অনিয়মিত ছন্দে—বুকের ওঠানামাও তাই নিয়মিত ছন্দে নয়। নিশ্বাস বইছে কি বইছে না ধরা মুশকিল।

মার্ক ওর হাত ধরে রেখেছিল। কাঁদছিল। মিনতি মাখানো কণ্ঠে ডাকছিল ঃ

'মায়রা! ডিয়ার মায়রা!'

ম্যাডাম রোডরিখ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বৃথাই বলছিলেন!

'মায়রা, বাছারে! এই যে আমি তোর মা তোর পাশে রয়েছি।'

কিন্তু মেয়ের চোখ আর খুলল না। ওদের কারও কথা শুনতে পেলে তো চোখ খুলবে।

ডাক্তাররা কসুর করলেন না জবর-জবর দাওয়াই দিতে। একবার মনে হল এই বুঝি জ্ঞান ফিরে এল মায়রার···অস্পষ্ট দু'চারটে কথাও ফুটল কাঁপা ঠোঁটে মানে ধরা গেল না। মার্কের মুঠোয় কেঁপে উঠল হাত। ক্ষণেকের জন্যে চোখের পাতাও ঈষৎ ফাঁক হল। কিন্তু আধখোলা চোখে সে কি শূন্য চাহনি! অর্থহীন· ·বোবা দৃষ্টি!

মার্ক এ-চাহনির অর্থ হাড়ে হাড়ে টের গেল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আচমকা ঃ

'উন্মাদ! পাগল!'

আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে। শক পেয়ে ও নিজেই না শেষে পাগল হয়ে যায়। এখুনি ওকে এঘর থেকে সরানো দরকার অন্য ঘরে। এ ঘরে চলুক যমে-মানুষে লড়াই। শেষ চেষ্টা করুক ডাক্তাররা।

কি আছে এই নাটকের শেষে? মায়রা কি ফের বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পাবে? শুশ্রূষা দিয়ে কি লুপ্ত বোধ ফিরিয়ে আনা যাবে? এ উন্মত্ততা কি সাময়িক—পাগলামির ঘোর কেটে যাবে তো?

ক্যাপ্টেন হারালান আমাকে একা পেয়ে বললেন—'বন্ধ করুন এই প্রহসন!'

বন্ধ করব? কি বলতে চান ক্যাপ্টেন? উইলহেম স্টোরিজ শুধু শহরেই পুনরাবির্ভূত হয় নি, বজ্জাতিও শুরু করেছে। নাটের গুরু সে—কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তাকে ধরা যাবে কোথায়?

সবচাইতে বড় কথা, এই যে কীর্তি হয়ে গেল, এ সম্বন্ধে শহরের লোকে ভাবছে কি? সাদা মাটা ব্যাখ্যায় তাদের কৌতূহল মিটবে কি? এ তো আর ফ্রান্স নয়। অলৌকিক কাণ্ডকাবখানার ওপর ছড়া তৈরী হবে, গান বাঁধা হবে। শুধু চলবে হাসি ঠাট্টা মস্করা। এদেশের কাণ্ডই আলাদা।

আগেই বলেছি, পিলে চমকানো অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারের দারুণ ভক্ত এই ম্যাগিয়াররা। অশিক্ষিত মহলের কুসংস্কার দূর কবার ক্ষমতা ত্রিভুবনের কারো নেই। পেটে যাদের বিদ্যে আছে, তাঁরা এসব বিচিত্র ব্যাপারকে বাসায়নিক বা পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত নয়া আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেবেন। কিন্তু নিরক্ষর মহলে এ জাতীয় ঘটনার মানে একটাই—খোদ শয়তান নাক গলিয়েছে রোডরিখ পরিবারে এবং উইলহেম স্টোরিজই সেই মূর্তিমান শয়তান।

শহর যেন ফেটে পড়ল পবের দিন থেকে। ডক্টব বোডরিখের বাড়ীতে যা ঘটেছে, তাব সঙ্গে গির্জের ঘটনার যে যোগাযোগ আছে, লোকের মুখে মুখে তা ফিরতে লাগল। দিব্বি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল শহর, শান্তি উড়ে গেল নতুন বিপত্তিতে। প্রতিটি বাড়ীতে, প্রতিটি পবিবারে আরম্ভ হয়ে গেল উইলহেমের কেচ্ছা। সেইসঙ্গে সকলেরই মনে পড়ে গেল অদ্ভুত সেই মানুষটার কথা, যার সারা জীবন কেটেছে বুলেভার্ড টেকেলির নিস্তব্ধ বাড়ীব মধ্যে—রুদ্ধ জানলা, আর উঁচু পাঁচিলের আড়ালে।

তাই, হাটে হাঁড়ি ভাঙতেই পঙ্গপালেব মত লোক ছুটল বুলেভার্ড অঞ্চলে। গোটা শহবটা যে ভেঙ্গে পড়বে সেখানে, এ আব আশ্চয কি। কিন্তু কোন্ দুর্দমনীয় টানে সবাই ছুটল, তা নিজেবাই জানে কিনা সন্দেহ।

সকলেই যেন টগবগ কবে ফুটছিল সীমাহীন ঘৃণায়। প্রতিশোধ নেওয়ার দুবন্ত বাসনায়—বজ্জাত উইলহেমের নষ্টামিতে এ ক্রোধ একান্ত স্বাভাবিক।

রাগ শহবের লাটসাহেব ঢালাও হুকুম দিলেন পুলিশ-চীফকে। যে রকম অবস্থা, সেবকম ব্যবস্থা হোক। আতংক বাডতে বাডতে শেষে যেন অবস্থা আয়ত্বের বাইরে না চলে যায়—আয়োজন হোক তেমনি ভাবেই। আগে থেকেই সতর্কমূলক ব্যবস্থা করা হোক। উইলহেম স্টোবিজের নামোল্লেখ যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হল। বুলেভার্ড টেকেলির স্টোরিজ ভবন যাতে লুঠ হয়ে না যায়, রুষ্ট জনতা বাড়ী ঢুকে না পড়ে, সে ব্যবস্থাও করতে হল।

ইতিমধ্যে আমি কিন্তু সমানে মাথা খাটিয়ে চলেছি। আগে যে অনুমতি পত্রপাঠ নাকচ করেছিলাম, হালে পানি না পেয়ে এখন তাকেই পাত্তা দিতে হচ্ছে। আমার এই অনুমতি যদি শক্ত জমিব ওপর খাড়া থাকতে পারে, যদি এমন কেউ থাকে যে নিজেকে খুশীমত অদৃশ্য করার শক্তি অর্জন করেছে—

তাহলে তা যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, জনগণের জীবন বিপর্যস্ত করে ছাড়বে সে। প্লেটো তার 'রিপাবলিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এক আশ্চর্য উপকথার বর্ণনা দিয়েছেন। একটি রাখাল ছেলে, নাম তার জিজিস, এক দৈত্যের কবর থেকে একটা আংটি পেয়েছিল। আংটিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরলেই অজ্ঞান হওয়া যেত। জিজিস শেষ পর্যন্ত সেই ভাবে অদৃশ্য হয়ে রাজা ক্যানডলকে হত্যা করবে এবং ক্ষমতা দখল করে বসবে।

জিজিস-এর কাহিনী সত্যে পরিণত হলেও মানতে হবে আমার আইডিয়াটা তার চাইতেও অবাস্তব। কিন্তু সত্যিই যদি অদৃশ্য হওয়ার মহাশক্তি—কেউ মুঠোয় এনে থাকে, তাহলে ব্যক্তি নিরাপত্তার দফারফা হয়ে গেল। কোন মানুষই আর নিরাপদ নয়।

উইলহেম স্টোরিজ শহরে ফিরে এসেছে, অথচ কেউ তাকে দেখেনি। কাজেই শহরের মধ্যে যেখানে খুশী তার যাওয়া রোধ করার ক্ষমতাও আমোদের নেই। অস্বস্তির আরও একটা কারণ আছে: আবিষ্কারটা নিশ্চয় বাপের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে উইলহেম। গুপ্ত বিদ্যেটা আর কাউকে শিখিয়ে বসেনি তো? চাকর হাবম্যানও কি অদৃশ্য হতে পারে মনিবের মত?

যখন খুশী যে ভাবে খুশী যে কোন বাড়ীতে ঢুকে বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে ওরা—কিন্তু কি করে তা বন্ধ করা যায়। পারিবারিক জীবনে গোপনতা বলে যে আর কিছুই থাকবেনা এরপর থেকে। নিজের বাড়ী বসেও কিউ দিব্বি গেলে বলতে পারবে যে অন্য কেউ তার ঘরে বসে নেই? আব কেউ আড়ি পাতছে না ঘরোয়া কথায়? অথবা গুপ্তচরের আবিভাব ঘটেনি চৌহদ্দির মধ্যে? একেবারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। বাইরে বেরোলেই কি রক্ষে থাকবে? অষ্টপ্রহর ফেউয়ের মত পেছনে লেগে থাকবে এমন একজন যাকে চোখে দেখা যায় না। যার নজর চাড়া হওয়া যায় না এবং যার দয়ার ওপর নির্ভব করে থাকা ছাড়া আর পথ নেই। যে কোন মুহূর্তে যে কোনো ধরনের হামলাবাজি তো এখন থেকে আকচার ঘটবে। হামলা আটকানোর পথ কি? এ অবস্থা চললে দুদিনেই সমাজ জীবন তছনছ হয়ে যাবে না কি?

তারপরেই মনে পড়ল বাজারের সেই ঘটনার কথা। আমি আর ক্যাপ্টেন হারালান দুজনেই স্বচক্ষে দেখেছিলাম কিভাবে একটা লোক আচমকা ঠিকরে পড়েছিল মাটিতে। কে নাকি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। অদৃশ্য আততায়ী। এখন দেখছি লোকটা খাঁটি কথাই বলেছিল। নিশ্চয় কেউ তাকে

ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—হয় উইলহেম স্টোরিজ, নয় হারম্যান, নয় অন্য কেউ। ঠেলার চোটে এই কথাই শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাবতে হচ্ছে—যেখানেই যাই না কেন, জানি এমনি ধরনের ঠোকাঠুকি লাগবেই লাগবে।

তারপর আরও অনেক কথা ভীড় করে এল মনে। গির্জের নোটিশ বোর্ড থেকে নোটিশ ছেঁড়ার ঘটনা, বুলেভার্ড টেকেলির ভবন খানাতল্লাসির সময়ে পাশের ঘরে চলাফেরার আওয়াজ, আচকা মেঝেতে পড়ে খামোকা একটা শিশি ভেঙে যাওয়া।

এখন বুঝছি, উইলহেম স্বয়ং হাজির ছিল বাড়ীর মধ্যে। খুব সম্ভব হারম্যানও ছিল! আমরা ভেবেছিলাম শহর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে উইলহেম। কিন্তু সে শহরেই ছিল। তাই শোবার ঘরে দেখেছি সাবান জল, রান্নাঘরের উনুনে আগুন।

হ্যাঁ, ওরা দুজনেই হাজির ছিল খানাতল্লাসির সময়ে। উঠোন, বাগান, বাড়ী তল্লাসীর সময়ে আমাদের সঙ্গেই ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চম্পট দেওয়ার সময়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকে ওরাই ধাক্কা মেরে কুপোকাৎ করে গিয়েছিল। হঠাৎ হানা দিয়েছিলাম বলেই কনের মুকুট পেয়েছিলাম বুরুজের মধ্যে। সরাবারও ফুরসুৎ পায় নি উইলহেম স্টোরিজ।

এবার আমার কথাই ধরা যাক। 'ডরোথি' নৌকোয় ড্যানিউবে জলযাত্রার সময়ে বিশেষ সেই ঘটনার এখন একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম যাত্রী ভদ্রলোক নেমে গেছে। আসলে লোকটা তখন নৌকোর ওপরেই ছিল। অদৃশ্য অবস্থায় থাকার দরুন কেউ দেখতেও পায়নি!

লোকটা জানে চক্ষের নিমেষে কিভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে হয়। ম্যাজিশিয়ান যেমন জাদুকাঠি ঠেকিয়ে যখন তখন অদৃশ্য হতে পারে, বা দৃশ্যমান হতে পারে, উইলহেমও তেমনি কায়দা শিখেছে খুশীমত অদৃশ্য হওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয় পরনের জামাকাপড়ও। হয় না কেবল হাতের জিনিসপত্তর। তাই আমরা চুক্তিপত্র আর ফুলের তোড়া শতচ্ছিন্ন হতে দেখেছি, কনের মুকুট চোখের সামনে উড়ে যেতে দেখেছি, বিয়ের আংটিকে শূন্যপথে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।

তবুও এ ব্যাপারে ম্যাজিক আছে বলা যায় না। গুপ্ত সমিতির ভাষায় তন্ত্রমন্ত্র বা জাদু কাহিনীও নয়। নিছক বস্তুজগতের আওতায় পড়ে গোটা ব্যাপারটা। উইলহেম স্টোরিজ এমন কোনো রসায়নের ফরমূলা পেয়েছে যার বেশ খানিকটা চোঁ-চোঁ করে গেলা যায়…কোন রসায়ন? নিঃসন্দেহে শিশির সেই রসায়ন—যে শিশি পড়ে ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উবে গিয়েছিল

ভেতরকার তরল পদার্থটা। কি কি আরক মিশালে বানানো যায় রসায়নটা, তা আমরা জানি না। জানতে চাই, কিন্তু কোনোদিনই বোধ হয় জানা যাবে না!...

উইলহেম স্টোরিজের রক্তমাংসের শরীরটা এখন অদৃশ্য; কিন্তু অদৃশ্য হলেও কি সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে? চোখে যে ধরা পড়ে না, তাকে ছোঁযার মধ্যেও ধরা যাবে বলে মনে হয় না আমার।

ওর পঞ্চভূতের শরীরটা এখনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বিস্তার—এ তিনটির কোনটি হারায়নি। শরীরটাও এখনো পর্যন্ত রক্তমাংসেই গড়া রয়েছে। তবে হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না বলেই যে ছোঁয়া যাবে না—এমন কোনো কথা নেই! ও-কথা খাটে ভূতেদের বেলা। আমাদের যে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে, সে ভূত নয়!'

কপালক্রমে একবার যদি তার হাত, কি ঠ্যাং বা মুণ্ডুটা চেপে ধরা যায়, তাহলে চোখে না দেখা গেলেও ধরে রাখা তো যাবে। গায়ে ওর যত শক্তিই থাকুক না কেন, জেলখানার গরাদ ভেঙে বেরুনোর মত জোর তো নেই।

এই যে এত ভাবছি, এ সবই যুক্তিব সোপান বেয়ে এগুনো ছাড়া আর কিছুই নয়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুক্তির প্রত্যেকটা ধাপ রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য। অথচ এত যুক্তি খরচ করেও যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রইলাম। পবিস্থিতিব কোনো সুরাহা তো হল না। জনগণের নিরাপত্তারও কোনো বালাই রইল না। এখান থেকে অষ্টপ্রহর আতঙ্ক আর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটবে আমাদের। ঘরের বাইরে থাকলেই বা কি, ভেতরে থাকলেই বা কি, দিনেই হোক কি রাতেই হোক, কেউ-ই নিরাপদ নই। পাশের ঘরে সামান্য আওয়াজ হলে, ছাদের বাতাসের গতি নির্দেশক মোরগ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করলে, পোকামাকড়ের ঝিঁ-ঝিঁ ঐকতান শুনলে, হাওয়ায় নড়বড়ে জানলা বা দরজা কেঁপে উঠলে, এখন থেকে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠবে।

রোজকার কাজকর্মের মধ্যে, খাবার টেবিলে খেতে বসে, সন্ধ্যে নাগাদ আড্ডার আসরে, রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে—আদৌ যদি ঘুম আসে—জানতেও পারবো না বাড়ীর মধ্যে কোনো আগন্তুক ঢুকে পড়ল কিনা, উইলহেম স্টোরিজ বা তার কোনো সাগরেদ চুপিসাড়ে বাড়ী ঢুকে গুপ্তচরের মত আমাদের গতি-বিধির ওপর নজর রেখেছে কি না, কথাবার্তা কান পেতে শুনছে কি না, গুহ্যতম পারিবারিক কাহিনীও মুখস্থ করে রাখছে কি না।

ডক্টর রোডরিখের বাড়ীতে দিনরাত পাহারা থাকলে কি হবে, তার মত

লোকের বাড়ী ঢুকতে বাধা কোথায়? একবার যদি অন্দরমহলে সে আসে, তখন তার যা-খুশী করাটা আটকাচ্ছে কে?

তাছাড়া, অদৃশ্য শত্রু এখন কোথায়? একটার পর একটা পিলে চমকানো ঘটনায় প্রমাণিত হল যে সে এখনো রয়েছে শহরবাসীর মধ্যেই। আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার জন্য সে একপায়ে খাড়া—অথচ সব শাস্তির বাইরে।

প্রথম ঘটনার পর তুঙ্গে পৌছালো আমাদের হতাশা! সাধু মাইকেলের উপাসনা মন্দিরের সেই রক্ত-হিম-করা কাণ্ড-কারখানার পর দুদিন কেটেছে। অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটেনি। মায়রার স্বাস্থ্য যা ছিল, তাই রয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও লুপ্ত, বিছানায় এখনো বন্দিনী, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে প্রাণটা এখনো দোদুল্যমান।

৪ঠা জুন ঘটল ঘটনাটা। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর রোডরিখ ফ্যামিলির সকলে জড়ো হয়েছেন গ্যালারীতে। সঙ্গে আছি আমি এবং আমার ভায়া। মোক্ষম কি করা যায়, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছি উত্তেজিতভাবে। এমন সময়ে যেন সাক্ষাৎ শয়তান হেসে কুটিপাটি হল আমাদের ঠিক কানের গোড়ায়।

আঁৎকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই। ক্ষিপ্তের মত মার্ক আর ক্যাপ্টেন হারালাম ছিটকে গেলেন গ্যালারীর একদিকে। বুক কাঁপানো হাসিটা ঐ দিক থেকেই এসেছে মনে হল। দুজনেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল। কিন্তু কয়েক পা র বেশী এগোনো গেল না।

ঠিক দু'সেকেণ্ড লাগল ঘটনাটা ঘটতে। দু সেকেণ্ডের মধ্যে আমি দেখলাম যেন ঝলসে উঠল আলোর একটা রেখা। আলো নয়—ঝকঝকে ছুরিব ফলা। খুনের সঙ্কল্প নিয়ে শূন্যপথে অধবৃত্ত রচনা করে নেমে এল বিদ্যুতেব ফলার মতই। টলমল করে টলে উঠল আমার ভায়া এবং এবং খপ করে তাকে দুবাহুর মধ্যে ধরে ফেলল ক্যাপ্টেন হারালান।……

দৌড়ে গেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম একটা কণ্ঠ—সেই কণ্ঠ যা এখন আমরা হাড়ে-হাড়ে চিনেছি!—দাঁতে দাঁত পিষে বলচে—

'মায়রা রোডরিখ জীবনে মার্ক ভাইডালের বউ হতে পারবে না। ইহজীবনে পারবে না!'

পরক্ষণেই দমকা বাতাসে সব কটা মোমবাতির শিখা দুলে উঠল, বাগানের দিকের দরজা সহসা দুহাট হয়েই আছড়ে পড়ল দমাস করে। বুঝলাম নাছোড়বান্দা শত্রু, আবার বুড়ো আঙুল দেখালো আমাদের।

ডিভানে শুইয়ে দিলাম ভাইকে। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন ডক্টর রোডরিখ। কপাল ভাল মার্কের। ক্ষত গুরুতর নয়। ছুরীর ফলা বাঁ-দিকের পিঠের হাড়

ছুঁয়ে নেমে গেছে লম্বা কাটা ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় নি। কাটা জায়গাটা দেখলে অবশ্য গা-কিরকম করে ঠিকই। কিন্তু ও ঘা শুকিয়ে যাবে কয়েকদিনেই। এ-যাত্রা ছুরী ফস্‌কেছে গুপ্ত-ঘাতকের। কিন্তু প্রতিবারেই কি ফস্‌কাবে?

শুশ্রূষার পর মার্ককে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। পাশে বসলাম আমি। ওকে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম, কি করে মোকাবিলা করা যায় এই পরিস্থিতির। আমার বুদ্ধিশুদ্ধিকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানানো হচ্ছে। যে ভাবেই হোক সমাধান করতেই হবে এ অবস্থার। তাতে হয়ত আমার প্রিয়পাত্রদের অনেককে জীবনপণ করতেও হবে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সমস্যার যাতে সমাধান হবে, সে পথে এক পা-ও এগোতে পারিনি আমি। তার আগেই ঘটল পর-পর বেশ কয়েকটা উৎপাত। নাটকীয় না হলেও, ঘটনাগুলো কেমন জানি অদ্ভুত এবং খাপছাড়া। ফলে, ভাবনা আমার বেড়েই গেল।

সেই দিনই (৪ঠা জুন) রাত্রে একটা দারুণ জোরালো আলো দেখা গেল ঘণ্টাঘরের সবচাইতে উঁচু জানলায়। বহুদূর থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ল সেই আলো। একটা জ্বলন্ত মশাল উঠছে, নামছে, সরে সরে যাচ্ছে এপাশে-ওপাশে। ঠিক যেন দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে সারা বাড়ীতে।

পুলিশ প্রধান সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তক্ষুনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন সদরঘাঁটি থেকে—সোজা উঠে গেলেন ঘণ্টাঘরে। আলোটা অবশ্য ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মঁসিয়ে স্টেপার্ক এ. কাণ্ডের পরেও আশা করেছিলেন কাউকে হয়ত দেখতে পাবেন। কিন্তু ভোঁ-ভোঁ—কারও টিকিও দেখা গেল না অকুস্থলে। মেঝের উপর পড়েছিল নেভানো মশালটা। তখনো রজনের গন্ধ বেরোচ্ছিল মশাল থেকে। কিন্তু ফুরিয়ে গিয়েছিল দাহ্য পদার্থ।

কে জানে লোকটা—ধরা যাক তার নাম উইলহেম স্টোরিজ—পিঠটান দিয়েছে, না, ঘাপটি মেরে রয়েছে ঘণ্টাঘরের আনাচে-কানচে। থাকলেও তার হদিশ পাওয়া তো সম্ভব নয়।

চত্বরে কাতারে কাতারে লোক জমে গিয়েছিল। নিষ্ফল আক্রোশে বৃথাই তারা তর্জন গর্জন করলে। কেউ সাড়াও দিলনা। কে জানে, কুকর্মের হোতা দেখেশুনে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল কি না।

পরের দিন সকালবেলা আধ-পাগল শহরবাসীদের আর এক দফা মাথা ঘুরিয়ে দিল অদৃশ্য আততায়ী।

ঠিক সাড়ে দশটার সময়ে বেজে উঠল ঘণ্টা। নারকীয় সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় মরা মানুষকে যখন কবরস্থ করা হয়—তখন। বাজনায় বিষম ভয়ের সুর।

এবার তো উইলহেম স্টোরিজ আর একা নয়। এতগুলি ঘণ্টা একযোগে বাজানো একা মানুষের কর্ম নয়। নিশ্চয় বেশ কয়েকজন সাগরেদ নিয়ে ফের খেল্ দেখাতে এসেছে উইলহেম। আর কেউ না থাক, চাকর হারম্যান তো আছেই।

সেণ্ট মাইকেল স্কোয়ারে দলে দলে জড়ো হল শহরবাসীরা। দূর অঞ্চল থেকেও দৌড়ে এল সবাই। ঘণ্টা কে বাজালো, তা দেখা চাই। ফের পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক তাঁর দলবল নিয়ে। উত্তর দিকের মিনারে ওঠার ঘোরানো সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন সবার আগে—টপাটপ সিঁড়ি টপকে পৌছালো ঘণ্টাঘরের মধ্যে। লুভরের ভেতর দিয়ে আলো এসে দিন করে তুলেছে গোটা ঘরটা·

কিন্তু বৃথা·· বৃথাই হানা দেওয়া সেখানে টাওয়ারে কেউ নেই গ্যালারিতেই কেউ নেই· ! পুলিশ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বোবা হয়ে গিয়েছিল দুলন্ত ঘণ্টাগুলো·· অদৃশ্য ঘণ্টা বাদকরা তার আগেই মিলিয়ে গিয়েছে বাতাসে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আমার আশঙ্কা তাহলে মিথ্যে নয়। উইলহেম স্টোরিজ রাগ-শহর ছেড়ে যায়নি। ডক্টর রোডরিখের বাড়ীর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করেছে সে। ছুরী ফসকেছে ঠিকই! কিন্তু সেজন্যে তো ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। যে-কাজ সে একবার করতে গিয়েছিল, সে-কাজ তাকে আবার হাসিল করতেই হবে। কাজেই এখন থেকে প্ল্যান করা দরকার। কিভাবে বদমাইশটাকে রোখা যায়, তার একটা ছক এখন থেকেই তৈরী করে ফেলা দরকার।

কাজের ছক ভাবাটা খুব কঠিন হল না। ঠিক করলাম যাদের ওপর উইলহেমের ঝাল সব চাইতে বেশী আগে জড়ো করা যাক তাদের।

গাঁ-বাচানোর এমন আয়োজন করা হবে যাতে ওদের ত্রিসীমানায় আসার ক্ষমতা কারো থাকবে না। কি ব্যবস্থা করা যায়, খুব কষে মাথা খাটিয়ে সে-পথ বার করে ফেললাম। তারপর তা কাজে পরিণত করলাম বিন্দুমাত্র দেরী না করে।

ভাইকে ছুরী মারার প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ৬ই জুন সকালে ওকে সরানো হল ডক্টর রোডরিখের বাড়ীতে—মায়বার পাশের ঘরে। মার্কের ঘা তখন দ্রুত শুকোচ্ছে। তারপর, ডক্টরকে খুলে বললাম আমার ফন্দী। গোড়া থেকে শেষ পযন্ত গোটা প্ল্যানটা মনে ধরল ওঁর। সাফ বলে দিলেন, সেই মুহূর্ত থেকে আমি যেন. নিজেকে অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডাব বলে মনে কবি। কম্যাণ্ডাবের কাজ আরম্ভ কবলাম সঙ্গে সঙ্গে। একটু ঝুঁকি অবশ্য নিতে হল। মার্ক আর মায়রার পাহারায রাখতে হল একজন মাত্র চাকবকে। তারপব তন্নতন্ন করে বাড়ীটার আগাপাশতলা ইন্সপেকসন করে এলাম। আমাকে সাহায্য করলেন বাডীশুদ্ধ সবাই, মায় ক্যাপ্টেন হারালান আব ম্যাডাম রোডরিখ পযন্ত। আমাব কথায় উনি মেযের বিছানায় বসে পাহাবা দেওয়া ত্যাগ কবলেন।

পযবেক্ষণ শুরু হল বাড়ীর আগা থেকে। কনুইতে কনুই ঠেকিযে আমরা চিলেকোঠাগুলোর এমোড় থেকে ওমোড পযন্ত টহল দিলাম। তাবপর দেখলাম সব কটা ঘব, একটা কোনও বাদ দিলাম না। মানুষ গলার মত ফাঁক বাখলাম না আমাদেব মাঝে। বলাবাহুল্য, টহল দেওয়ার সময়ে দরজার পর্দা তুললাম, চেযার সরালাম, খাটেব তলা আর আলমাবীর তলায হাত রাখলাম—কিন্তু একটা সেকেণ্ডেব জন্যেও গা-ঘেঁষাঘেঁষি বন্ধ করলাম না। এক-একটা ঘব এমনিভাবে চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানোর মত দেখে তালা ঝুলিয়ে দিলাম। চাবি রাখলাম নিজেব কাছে।

ঘণ্টা দুয়েক লাগল এ-কাজ সারতে। সাবা বাড়ী সেবে যখন সদর দবজায় পৌছোলাম, তখন একটা ব্যাপারে অন্তত আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না আমাদের মধ্যে। না, আর কোনো আশংকা থাকতে পাবে না। বাইবের কেউই অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে নেই বাড়ীব মধ্যে। যেভাবে সারা বাড়ী ইন্সপেকসন কবে এলাম, তাতে একটা মশাও গলতে পাবেনি মানুষ-দেওয়াল ভেদ করে—অদৃশ্য মানুষ তো নয়ই।

সুতরাং, সদর দবজায খিল দিযে তালা ঝুলিয়ে চাবি বাখলাম আমার পকেটে। আমাব অনুমতি ব্যতিবেকে এখন আর কারো পক্ষে বাড়ীর চৌহদ্দিব মধ্যে আসা সম্ভব নয়। একশ গুণ অদৃশ্য হলেও নয। আগন্তুককে যদি চিনতেও পারি, তাহলেও তাকে বাডীর ভেতব খাতিব কবে আনাটা আমার পক্ষেও আর অতটা সহজ হবে না।

এরপর থেকেই দরজাব কড়া নড়লেই সাড়া দেওয়া শুরু করলাম আমি নিজেই। কাজটা কুলি-কামাবের, কিন্তু সঙ্গে থাকতেন হয় ক্যাপ্টেন হারালান

স্বয়ং, অথবা তিনি না থাকলে চাকর-বাকরের মধ্যে থেকে একজন যার ওপর আস্থা রাখা যায়। ঈষৎ ফাঁকা করা হত কপাট, সঙ্গী থাকত ভেতরে। কিন্তু আমি দরজার ফাঁকে নিজে গিয়ে ভরাট করে রাখতাম ফাঁকটা। চেনা মুখকে ঢুকতে দিতে হবে? বেশ তো, আমরা তিনজনেই পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসতাম—গায়ে গা লেগে থাকত তিন জনেরই—কপাট বন্ধ হত ধীরে ধীরে আমরা ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

ফলে, বাড়ীর ভেতরে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে ছিলাম সকলে। বাড়ী না বলে তাকে কেল্লা বলাই বরং উচিত।

অথবা, জেলখানা। আমি জানি, ঠিক এই শব্দ দিয়েই বন্ধ করা যায় আমার বারকট্টাই। কেল্লা না বলে বাড়ীটাকে বোধহয় জেলখানাই বানিয়ে ফেলেছিলাম। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু যে-বন্দীত্ব চিরস্থায়ী নয়, সে-বন্দীত্ব সওয়া যায়। আমরাও দীর্ঘদিনের জন্যে কি কয়েদ থাকছি? মনে তো হয় না।

বিরাম ছিল না আমার মাথা খাটানোর। অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে দিবানিশি সে কি চিন্তা। উইলহেম স্টোরিজের দুর্বোধ্য প্রহেলিকার সমাধান করি আর না করি, সমাধানের পথে খানিকটা এগিয়েছিলাম বইকি।

কাঠখোট্টা হলেও দু'চার কথায় জিনিসটা বুঝিয়ে বলা যাক। হয়ত দরকার হতে পারে এই ব্যাখ্যাটা।

প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো গেলে তা সাত রঙে ভেঙে যায়। সাতটা রঙ একসঙ্গে মিশে গেলে আবার যে কে সেই অর্থাৎ সাদা আলো। এই যে সাতটা রঙ, অর্থাৎ, লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল, বেগুনী—এই নিয়েই 'সৌর বর্ণালী'।

কিন্তু চোখে যা দেখা যায়, বর্ণালীর সবটাই কি তাই? না, আরও এমন অনেক রঙ আছে যা চোখে ধরা পড়ে না? আমাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায় না? রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা যা, এই সব রশ্মির ধর্ম নিশ্চয় তা থেকে আলাদা? জাত ছাড়া বলেই না এসব রশ্মি এখনো অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে আমাদের ধারণায়? বর্ণালীর সাতটা রঙ কয়েকটা কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে, যেমন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সরাসরি চলে যায়—বাধা পায় না। ঠিক তেমনি, অজ্ঞাত এই রশ্মিগুলোই বা সব রকম কঠিন পদার্থের মধ্যে সরাসরি যাবে না কেন?* তাই যদি হয়, তাহলে এসব রশ্মি যে নেই, একথা

*জুল ভের্ণ এ-কাহিনী লেখার পর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এবং ইনফ্রারেড রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁর থিওরী আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বলা যায় না। কেননা, রশ্মিগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেও আমরা তো বুঝতে পারি না।

হতে পারে অটো স্টোরিজ এই জাতীয় শক্তিশালী রশ্মিগুলো আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন এমন একটা রসায়নের ফরমুলা যা জীবিত প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে চামড়ার ওপরে চলে আসে এবং সৌর-বর্ণালীর বিভিন্ন রশ্মিগুলোর ধর্ম পাল্টে দেয়।

এই পর্যন্ত যদি মাথায় আনা যায়, তাহলে বাকীটুকুও জলবৎ তরলং হয়ে দাঁড়ায়। যে শরীরে এমনি রসায়ন প্রবেশ করেছে এবং চামড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, বাইরের আলো সেই শরীরের সংস্পর্শে এলেই ভেঙে গিয়ে ওপরে বর্ণিত অজ্ঞাত রশ্মিতে পর্যবসিত হবে। নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী অজ্ঞাত রশ্মিগুলো তখন অস্বচ্ছ শরীরের মধ্যে দিয়ে দিব্বি গলে যাবে। কিন্তু যেই শরীরের আর একদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরুবে রশ্মিগুলো, অমনি তা ফের মিলেমিশে আগেকার আলোয় পরিণত হবে। ফল দাঁড়াবে কি ? না, অস্বচ্ছ শরীরটা চোখে দেখা যাবে না—মনে হবে যেন, নেই।

কয়েকটা ব্যাপার অবশ্য ধোঁয়াটেই থেকে যাচ্ছে। যেমন, উইলহেম স্টোরিজকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। তার পরণের জামাকাপড়কেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ তার হাতে ধরা জিনিস দেখা যায় কেন ?

সব চাইতে ধোঁয়াটে হল, আশ্চর্য রসায়নের নামটা। জিনিসটা কি আমি জানি না। যদি জানতাম তাহলে নিজেই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সম-শক্তিতে শক্তিমান হয়ে টক্কর দেওয়া যেত শত্রুর সঙ্গে। কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন অসম শক্তি নিয়েই কুপোকাৎ করা যাবে তাকে।

একটা উভয় সংকট অবশ্য আছে। অজ্ঞাত রসায়নটার নাম যাই হোক না কেন, এর অদৃশ্য-করণের ক্ষমতা হয় সাময়িক, না হয় চিরস্থায়ী। সাময়িক যদি হয়, তাহলে নিশ্চয় কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নতুন করে রসায়ন খেতে হয় উইলহেমকে। কিন্তু ক্ষমতাটা যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহলে নিশ্চয় প্রতিষেধক রসায়ন খেয়ে অদৃশ্য-করণের ক্ষমতা নষ্ট করতে হয় উইলহেমকে ফের দৃশ্যমান হওয়ার জন্যে। কেননা, অনেক পরিস্থিতিতে অদৃশ্য থাকাটা সুবিধেজনক তো নয়ই, বরং বিলক্ষণ বিড়ম্বনা। রসায়নের ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন, দরকার মত বস্তুটা সংগ্রহ করা হয় নিশ্চয় আগে থেকে জড়ো করে রাখা ভাঁড়ার থেকে। কারণ, সঙ্গে বেশী রসায়ন নিয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়।

এই পর্যন্ত পরিষ্কার হওয়ার পর মনকে জিজ্ঞেস করলাম খাপছাড়া কয়েকটা ঘটনার ব্যাখ্যানা। যেমন, ঘণ্টাধ্বনি এবং উন্মাদ মশাল-নৃত্য। জবাব

পেলাম না। এমন হতে পারে যে মহাশক্তিতে টইটুম্বুর এই আশ্চর্য আরক পান করে উইলহেম নিজেই বোধকরি পাগল হতে বসেছে। খাপ ছাড়া ঘটনাগুলো তারই প্রমাণ। অর্থহীন কাণ্ডকারখানার এ-ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যানা হতে পারে না।

চিন্তাধারার এই ধরনের এলোমেলো গতি-প্রকৃতির জন্যই আমি মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছে গেলাম। আমার প্রস্তাব খুলে বললাম। দুজনেই তখন ঠিক করলাম, এখন থেকে বুলেভার্ড টেকেলির স্টোরিজ-ভবন পুলিশ আর সৈন্য দিয়ে এমনভাবে ঘিরে রাখা হবে দিবারাত্র যাতে সশরীরে বাড়ীর মালিক ভেতরে সেঁধোতে না পারে। পরিণামে উইলহেম হারাবে তার আশ্চর্য আরকের গোপন ভাণ্ডার এবং ল্যাবোরেটরী। তখন বাছাধনকে বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দৃশ্যমান হতেই হবে, নয়তো বরাবরই অদৃশ্য হয়ে থাকতে হবে। এই ভাবেই কাহিল করা যাবে উইলহেমকে। ওর মাথা খারাপ হওয়ার অনুমানটা যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে নিজের বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেই পাগলামি এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোবে যে তখন তাকে ক্যাঁক করে পাকড়াও করা খুব কঠিন কাজ হবে না।

মঁসিয়ে স্টেপার্ক কোনো বাধা দিলেন না আমার প্রস্তাবমত আয়োজনে। উনিও নানান কারণে স্টোরিজ-ভবনকে ঘেরাও করে রাখতে চাইছিলেন। তাতে শহরবাসীদের প্রাণটা খানিকটা শান্ত হবে। রাগ-শহর এমনিতে খুব শান্তিপূর্ণ। এ শহরেব সুখ-শান্তিতে অন্যান্য ম্যাগিযার শহরের চোখ টাটায়। প্রশান্ত সেই শহরের অশান্তি এখন কল্পনারও অতীত। এ শহরের সঙ্গে তুলনা চলে এখন শত্রু আক্রান্ত এমন একটা শহরের সঙ্গে যেখানে বোমাবর্ষণেব আশংকা ঝুলছে মাথার ওপর এবং প্রত্যেকেই জানতে চাইছে প্রথম বোমাটা পডবে কোথায় এবং তাতে তার নিজের বাড়ীটা গুঁড়িয়ে পাউডার হবে কি না।

বাস্তবিকই, উইলহেম স্টোরিজ না করতেই বা পারে কি? বিশেষ করে যখন দেখছি শহব ছেডে বেরোয়নি সে। উপরন্তু স্টোরিজ নিজেই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে—সে আছে, শহরেই আছে, চম্পট দেয়নি।

পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ডক্টর রোডরিখের বাড়ীতে। অভাগা মাইরার জ্ঞান এখনো ফেরেনি। ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করে সে যা বলে, তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ কাউকে দেখেও দেখতে পায় না। কানেও শুনতে পায় না—আমরা কথা বললেও কানে ঢোকে না। মার্ক অথবা নিজের মাকেও চিনতে পারে না মাযরা।

অসামান্য মনোবল দিয়ে নিজেকে খাড়া করে রেখেছিলেন ম্যাডাম রোডরিথ। জিরোতেন অতি সামান্যক্ষণ—তাও স্বামীর ঠেলায় পড়ে। কিন্তু ঘুমিয়েও নিস্তার ছিল না ওঁর। দুঃস্বপ্ন দেখতেন যেন আমাদের এত কড়া ব্যবস্থাকেও নস্যাৎ করে অদৃশ্য আততায়ী ঢুকে পড়েছে বাড়ীর মধ্যে। এবং ঘুর ঘুর করছে কন্যার আশেপাশে!

এটা ঠিক যে এই অবস্থা দীর্ঘদিন চললে খাড়া থাকা মুস্কিল হবে তার পক্ষে।

ডক্টর রোডরিথের সহযোগী চিকিৎসকরা আসতেন—রোজই। আসতেন এবং অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মায়রাকে পরীক্ষা করতেন। কিন্তু মনটা কেন এমনিভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তা বলতে পারতেন না। এ এমনই একটা অবস্থা, যে অবস্থায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কোনো শঙ্কটও নেই। এক কথায় অচলাবস্থা, বাহ্যিক জগতের সব কিছুর প্রতি আশ্চর্য এক উদাসীনতা · প্রশান্ত মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই দুঁদে বৈদ্যরাও হালে পানি পেলেন না।

তিনদিনের মাথায় দু'পায়ে খাড়া হতে পেরেছিল আমার ভায়া। তারপর থেকেই মায়রাব ঘর ছেড়ে আর নড়েনি। আমিও বাড়ী ছেড়ে পারতপক্ষে বেরোতাম না। বেরোলে যেতাম টাউনহলে মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছে। ভদ্রলোকের কাছে শুনে আসতাম রাগ-শহরবাসীদের বর্তমান মতিগতি কি। ওঁর মুখেই শুনেছি, আতঙ্কে দিশেহারা হযে রয়েছে বাসিন্দারা। তাদের মতে নাকি উইলহেম স্টোরিজ এক দঙ্গল অদৃশ্য মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছে অসহায় শহরবাসীদের ওপর।

ক্যাপ্টেন হারালান কিন্তু হরবখৎ উধাও হয়ে যেতেন আমাদের 'বেল্লা' ছেড়ে। বদ্ধমূল একটা ধারণা নিয়ে টোঁ-টোঁ করতেন রাস্তায় রাস্তায়। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও বলতেন না। হয়ত কিছু ফন্দী নিয়েই উনি চক্কীপাক দিতেন রাস্তায়—আমি গেলে বাগড়া দেব, এই ভয়েই বোধহয় সঙ্গে নিতেন না। উইলহেম স্টোরিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অত্যন্ত অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়েই কি উনি বেরোতেন রাস্তায়? নাকি তক্কে তক্কে ছিলেন কবে খবর আসে যে উইলহেমকে দেখা গিয়েছে স্প্রেমবার্গ বা অমুক জায়গায়? আমাকে মনোভাবটা বললেও নিশ্চয় আমি ওকে ধরে রাখতাম না। বরং সঙ্গে সঙ্গে যেতাম এবং পথের কাঁটা সরানোয় হাত লাগাতেও পারতাম।

কিন্তু তা কি ঘটবে? খুব সম্ভব না। রাগ শহরে তো নয়ই, অন্যত্রও উইলহেমের টিকি দেখা যাবে না।

এগারোই জুন সন্ধ্যেবেলা মার্কের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। আগের চাইতেও ওকে অনেক বেশী অভিভূত দেখলাম। ভয় হল ওর স্বাস্থ্য নিয়ে। শরীর ভেঙে না পড়ে। দিন কয়েকের জন্যে শহর ছেড়ে ওকে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে ভালো হত। ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও চলত। কিন্তু ভায়া যে মায়রার কাছ ছাড়া হবে না কিছুতেই। গোটা রোডরিখ পরিবারটাকে শহরছাড়া করা যায় না কিছুদিনের জন্যে? প্রস্তাবটা বিবেচনার উপযোগী নয় কি? মনে মনে তোলপাড় করার পর কথাটা ডক্টর রোডরিখের কাছে পাড়ব ঠিক করলাম।

সেইদিন কথা শেষ হওয়ার পর বললাম মার্ককে:

'ভাইরে, তুই দেখছি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস। কিন্তু ভুল করছিস। মায়রার জীবন নিয়ে ভয় নেই। সব ডাক্তারই তাই বলছেন। চেতনা ফিরছে না সাময়িকভাবে। জ্ঞান ঠিকই ফিরবে।'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মার্ক বললেন—'তুমি আমাকে নিরাশ হতে বারণ করছ। কিন্তু দাদা, জ্ঞান ফিরে এলেও রাক্ষসটার দয়ার ওপর ওর প্রাণ ঝুলবে—ভুলোনা সেকথা।'

—'কে জানে এইমাত্র যা বললাম, তা আড়ি পেতে শুনে নিল কিনা উইলহেম; আমরা ভাবছি, ও এখন অনেক দূরে। কিন্তু এই মুহূর্তে এখানেই তো সে থাকতে পারে। ঐ তো! ..ঐ দরজার পেছনেই পায়ের শব্দ শুনছি আমি ওখানেই রয়েছে ও! · এসো! ..মারো! মেরে ফ্যালো।...কিন্তু তাও কি সম্ভব? এ রাক্ষসকে মারাও কি সম্ভব?'

এই তো আমার ভায়ের মনের অবস্থা! এ-রকম টানাপোড়েন আর বেশীদিন চললে ওর অবস্থাও যে মায়রার সমান হবে না, এমনি আশঙ্কা করাটা কি আমার অন্যায়?

অভিশপ্ত এই আবিষ্কার করতে গেলেন কেন অটো স্টোরিজ? করার পর কেনই বা আবিষ্কারটা দিয়ে গেলেন এমন এক ব্যক্তির হাতে যার মুঠোয় আগে থেকেই সঞ্চিত রয়েছে অনেক অশুভ অস্ত্র?

শহরের অবস্থাও তেমন কিছু না। ঘণ্টাঘরের চূড়ো থেকে উইলহেমের সেই বিকট চেঁচানির পর ('এই যে, আমি এখানে।') নতুন কোনো ঘটনাও আর ঘটেনি। না ঘটলেও ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে শহরের প্রতিটি মানুষ। কেউ চায় না তার বাড়ী এসে অদৃশ্য মানুষ ভুতুড়ে উৎপাত করে যাক। উপাসনা মন্দিরে সেই বিশ্রী গণ্ডগোলের পর পালিয়ে গিয়ে লুকোনোর মতও জায়গাও নেই কোনো গির্জেতে। কর্তৃপক্ষ বৃথাই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল জনগণকে—

কিন্তু মন থেকে ভয় তাড়ানো গেল না। এ-যেন জুজু-আতঙ্ক—সাপের মত পেঁচিয়ে ধরছে মনকে।

শ'খানেক ঘটনার মধ্যে থেকে একটা বাছাই করা ঘটনা বলা যাক। এ-থেকেই বোঝা যাবে কি ধরনের পাগলামি পেয়ে বসেছিল শহরবাসীদের।

বারো তারিখে সকালবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি পুলিশ-প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে। সেন্ট মাইকেল স্কোয়ার থেকে শ'খানেক গজ তফাতে দেখা হল ক্যাপ্টেন হারালানের সঙ্গে। পাশে গিয়ে বললাম—'মঁসিয়ে স্টেপার্কে'র কাছে যাচ্ছি। আসবেন না কি?'

ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন না। যন্ত্রবৎ এলেন আমার পিছু পিছু। চত্বরের কাছাকাছি আসতেই শুনলাম বুক-কাঁপানো চীৎকার।

দু'ঘোড়ায় টানা একটা জমকালো গাড়ী উল্কাবেগে ছুটে আসছে রাস্তা দিয়ে। পথচারীরা ছিটকে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। নিশ্চয় আসন থেকে ছিটকে পড়েছে গাড়োয়ান—ফলে খুশীমত দৌড়োচ্ছে ঘোড়া দুটো।

কিছু পথচারীর মাথায় কেন জানি অদ্ভুত একটা ধারণা ঢুকে গিয়েছে। চলন্ত শকটের অদৃশ্য গাড়োয়ান আর কেউ নয়—উইলহেম স্টোরিজ স্বয়ং। উন্মত্ত চীৎকার ভেসে এল কানে—'উইলহেম!... উইলহেম!... উইলহেম!...'

ক্যাপ্টেন হারালানের দিকে ফিরতে না ফিরতেই দেখি ক্যাপ্টেন তীরের মত ছুটেছেন শকটের দিকে। উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার—ছুটন্ত শকটের গতিরোধ করা।

রাস্তায় তখন লোক গিজ গিজ করছে। সমুদ্রনির্ঘোষের মত চতুর্দিক থেকে শোনা যাচ্ছে উইলহেম স্টোরিজের নাম। অর্ধোন্মাদ জনতার মাথার ওপর দিয়ে এলোমেলো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বিস্তর পাথরের টুকরো। উত্তেজনা এমন চরমে উঠেছিল কোনের অস্ত্রাগার থেকে গাদা বন্দুকের ধমকও শোনা গেল বার কয়েক।

গুলি লাগল একটা ঘোড়ার উরুতে। হোঁচট খেল ঘোড়া। শকটও হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেচারার ওপব।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল জনতা। কেউ ধরল চাকা, কেউ শকটের বাক্স, কেউ চাকার সঙ্গে লাগানো ডাণ্ডা। একশ জোড়া হাত হাতড়ে ধরতে গেল উইলহেম স্টোরিজকে...কিন্তু হাওয়া ছাড়া মুঠোয় কিছুই ধরা পড়ল না।

তার মানে শকট উল্টে পড়ার আগেই পাশে লাফিয়ে পড়েছিল উইলহেম। শহরবাসীদের পিলে চমকে দেওয়ার আরও একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়।

ব্যাপারটা যে আসলে তা নয়, তা পরিষ্কার হয়ে গেল অচিরে। সঙ্গে সঙ্গে

দৌড়ে এল একজন কৃষক। বাজারের চত্বরে গাড়ীঘোড়া রেখে গিয়েছিল লোকটা। সেই ফাঁকে চম্পট দিয়েছে জোড়াঘোড়া। জোড়ার একটিকে রাস্তায় লুটোতে দেখে সেকি রাগ তার! কেউই অবশ্য কর্ণপাত করল না তার কথায়। জনতার অন্ধরোষ থেকে আমরা অতিকষ্টে তাকে আড়াল করে না রাখলে আমার তো মনে হয় ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হত ঐখানেই।

ক্যাপ্টেন হারালানকে ডেকে নিয়ে রওনা হলাম টাউন হলের দিকে। নীরবে সঙ্গে এলেন ভদ্রলোক।

ঘটনার বৃত্তান্ত আগেই কানে পৌঁচেছিল মঁসিয়ে স্টেপার্কের। আমাকে বললেন 'ক্ষেপে গেছে সারা শহর। ক্ষ্যাপামির শেষ কোথায় বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

চোদ্দই জুন দিনটা আগের দিনগুলোর মত তেমন শান্তভাবে কাটল না। গণ রোষ এমন তুঙ্গে পৌঁছেছিল সে দণ্ডমুণ্ডের কর্তারাও হালে পানি পাচ্ছিলেন না—ভীড় সামলাতে গিয়ে নিজেরাই বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন।

এগারোটা নাগাদ নদীতীর দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে কানে ভেসে এল:

'ফিরে এসেছে! ফিরে এসেছে!'

কে যে ফিরে এসেছে, তা অনুমান করতে কষ্ট হল না। জনৈক পথচারীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল:

'চিমনী থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে।'

'বুরুজের পর্দার আড়ালে ওর মুখ দেখা গেছে', বললে আর একজন।

কথাগুলো বিশ্বাস করি আর না করি, শোনামাত্র রওনা হলাম বুলেভার্ড টেকেলির দিকে।

উইলহেম স্টোরিজ কি এতই অবিবেচক যে ফের মুখ বাড়াবে বুরুজের জানলায়? এ অবস্থায় ধরা পড়লে পরিণামটা কি, তা তার জানা। তা সত্ত্বেও এ-ঝুঁকি নেওয়া কি সম্ভব? বাড়ীর জানলায় ফের দেখা দেওয়া কি সম্ভব?

সত্যি হোক মিথ্যে হোক, খবরটায় ফল যা হবার, তা চোখেই দেখা গেল। বুলেভার্ড টেকেলিতে পৌঁছে দেখি, হাজার কয়েক লোক বুলেভার্ড আর লাগোয়া রাস্তাগুলো বন্ধ করে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। পুলিশ বৃথাই রুখতে চেষ্টা করছে তাদের। সব দিক দিয়েই আসছে কাতারে কাতারে নরনারী। প্রচণ্ড উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছে প্রত্যেকেই—মুখে তাদের এক হুংকার—উইলহেম স্টোরিজের গর্দান চাই।

বাড়ীর মধ্যে একদল অদৃশ্য স্যাঙাৎ নিয়ে 'সে' ঢুকে আছে, বদ্ধমূল এই

ধারণার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি? অগণিত মানুষের ব্যূহকে রোখবার সাধ্য আছে কি পুলিশের? ওরা যেভাবে ঘেরাও করেছে বাড়ী, উইলহেমেরও সাধ্য নেই বেরিয়ে এসে চম্পট দেওয়ার। তার চাইতেও বড় কথা, জানলায় যদি তার মুখ দেখা গিয়ে থাকে, তবে সে মুখ রক্ত মাংসের। আবার অদৃশ্য হওয়ার আগেই ধরা পড়বে বাছাধন এবং এবার আর গণরোষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো সম্ভব হবে না।

পুলিশ কর্ডন যথাসাধ্য দেওয়া সত্ত্বেও, পুলিশ চীফের প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, টেনে উপড়ে আনা হল রেলিং, ঝাঁপিয়ে পড়া হল বাড়ীর ওপর, ভেঙে ফেলা হল দরজা, টুকরো টুকরো করা হল জানলা, আসবাবপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল বাগানে অথবা উঠোনে, ল্যাবারেটরীর সরঞ্জাম হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। তারপর নীচের তলা থেকে লকলক করে উঠল আগুনের শিখা, লেলিহান শিখায় ছাদ পুড়ল, শেষপর্যন্ত বুরুজ শুদ্ধ ভেঙে পড়ল নীচের চুল্লীতে।

উইলহেম স্টোরিজকে বৃথাই গরুখোঁজা করা হল বাড়ীতে, বাগানে, উঠোনে। নেই, কোথাও নেই সে। থাকলেও, তাকে দেখা গেল না।

আরও দশ জায়গায় জ্বলল আগুন! সারা বাড়ীকে গ্রাস করল অগ্নিদেবতা। ঘণ্টা তিনেক পরে খাড়া রইল শুধু চারটে দেওয়াল।

স্টোরিজ ভবন ধ্বংস করে হয়তো মোটের ওপর ভালই হল। অদৃশ্য হয়েও উইলহেম আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, এই বিশ্বাস শহরবাসীদের নিদারুণ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাবে না, তাই কে বলতে পারে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্টোরিজ-ভবন ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই রাগ শহরের অতিরিক্ত উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হল। শহরবাসীদের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। আমার অনুমানই ঠিক। অনেকেরই বিশ্বাস, বাড়ীতে আগুন লাগার সময়ে উইলহেম নাকি ভেতরেই ছিল এবং বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে জাদুকরও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তা তো নয়। ধ্বংসস্তূপ তোলপাড় করেও, ছাই ঘেঁটেও, এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে উইলহেমও পুড়ে মরেছে। আগুন লাগার সময়ে বাড়ীর মধ্যে থাকলেও এমন কোন নিরাপদ কোণে লুকিয়েছিল উইলহেম, আগুন যেখানে নাগাল পায়নি।

প্রেমবার্গ থেকে পাওয়া আরও অনেক চিঠিপত্র থেকে একটা বিষয়

জানা গেল। উইলহেম সেখানে আবির্ভূত হয়নি। চাকর হারম্যানকেও দেখা যায় নি। দুই মূর্তি আদৌ সেখানে ঘাপটি মেরে আছে কিনা, তাও কেউ জানে না।

শহরের অবস্থা আগের থেকে শান্ত হলে কি হবে, ডক্টর রোডরিথের বাড়ীর অবস্থা যা ছিল তাই রয়েছে। মায়রার মানসিক অবস্থা ভালর দিকে মোটেই যায় নি। চেতনা এখনো লুপ্ত। ঢালাও সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও সে এখনো স্বজন চিনতে অপারগ। ডাক্তারদের মনেও ক্ষীণতম আশার আলো নেই।

শরীর অত্যন্ত কাহিল হলেও, মায়রার প্রাণসংশয় আর ছিল না। মড়ার মতই অবশ্য চব্বিশঘণ্টা শুয়ে থাকত বিছানায়। মড়ার মতই নিথর, পাণ্ডুর। কেউ তুলতে গেলেই ওর বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত, আতঙ্ক থিরথির করে উঠত চোখের তারায়, দুহাত আছড়াতো বিছানায় এবং অসংলগ্ন শব্দ বেরিয়ে আসতো অসাড় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

ষোল তারিখে অপরাহ্নে আমি একা-একা রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটছি যেদিকে দুচোখ যায়। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হল ড্যানিউবের ডান পাড়ে যাই। এ-অভিযানের ইচ্ছে অনেকদিনের, কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে সুযোগ পাই নি, মনের অবস্থাও অভিযানের অনুকূলে ছিল না। তা সত্ত্বেও সেতু পেরোলাম, নদী মধ্যস্থ দ্বীপ পেরোলাম, পা দিলাম সার্বিয়ান তীরে!

ভেবেছিলাম যতক্ষণ, হাঁটলাম তার চাইতে বেশীক্ষণ। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজতে ফিরে এলাম সেতুতে। নদী তীরের একটা সার্বিয়ান সরাইখানায় পেট ঠেসে খেয়ে নিলাম রাতের খাওয়া। তারপর মাথায় কি-যে খেয়াল চাপল, সেতুটা সরাসরি না পেরিয়ে মাঝখান অবধি এসে নেমে পড়লাম মাঝ-নদীর দ্বীপটায়।

গজ দশেক যেতে না যেতেই মঁসিয়ে স্টেপার্ককে দেখতে পেলাম। একা আসছিলেন উনি। আমাকে দেখেই কাছে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে যা আমাদের এখন চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান জ্ঞান, তাই নিয়ে শুরু হল কথাবার্তা।

মিনিট বিশেক হেঁটে পৌঁছোলাম দ্বীপের উত্তর প্রান্তে। রাতের আঁধার তখন সবে দানা বাঁধছে। গাছের তলায় এবং জনহীন পথে ছায়া বিস্তৃত হচ্ছে। সুইস্ প্যাটার্নের স্যালেট কটেজগুলোর কপাট বন্ধ। জনপ্রাণীর ছায়াও দেখলাম না আশেপাশে।

ফেরার সময় হয়েছে রাগ শহরে। ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কয়েকটা টুকরো কথা কানে ভেসে এল।

থমকে দাঁড়ামাম তৎক্ষণাৎ। মঁসিয়ে স্টেপার্কের হাত খামচে তাঁকেও দাঁড়

করালাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—'শুনছেন! কে যেন কথা বলছে···গলাটা তার···উইলহেম স্টোরিজের···।'

'উইলহেম স্টোরিজ!' নীচু গলায় বললেন উনি।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের দেখেনি তো?'

'না। রাত্রে অনেক কিছুই দেখা যায় না। ওর মত আমারও এখন অদৃশ্য।'

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এবার আমাদের দিকে এগুচ্ছে। কণ্ঠস্বরগুলো বলাই সঙ্গত। কেননা—দুজনে কথা বলছে স্পষ্ট শোনা গেল।

'একা নয় দেখছি।' বিড়বিড় করলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

'না···চাকরটা আছে বোধহয়।'

গাছের আড়ালে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মাটির ওপর। অন্ধকারকে অজস্র ধন্যবাদ। ওদের অত কাছে থেকেও তাই অদৃশ্য রইলাম এবং সব কথা শুনলাম। অন্ধকারে গা ঢেকে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম গুঁড়ি মেরে।

এমন জায়গায় গেলাম, যেখান থেকে আর দশ পা গেলেই পাওয়া যায় উইলহেম স্টোরিজকে। কাউকেই অবশ্য দেখতে পেলাম না। আশাও করেছিলাম তাই। তাই হতাশ হলাম না।

শত্রু-ভবন অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর খোদ শত্রুর এত কাছে আসার এবং তার গোপন ফন্দিফিকির শোনার এমন সুযোগ আর পাই নি।

ও কল্পনাই করতে পারে নি এত কাছে রয়েছি আমরা, কান খাড়া করে শুনছি বিটলেমি অভিলাষ। গাছপালার ফাঁকে গুঁড়ি মেরে বসে, প্রায় শ্বাসরোধ করে, অবর্ণনীয় আবেগে কাঠ হয়ে শুনলাম প্রভু ভৃত্যের শলাপরামর্শ। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ওরা আসছিল আর কথা বলছিল।

প্রথম কথাটা শুনলাম উইলহেমের গলায়—'কালই ওখানে যাচ্ছি তো?'

'হ্যাঁ, কাল থেকেই যাচ্ছি,' এ-গলা নিশ্চয় চাকর হারম্যানের—'কেউ জানতেও পারবে না কোথায় আছি আমরা।'

'রাগ-য়ে ফিরবো কখন?'

'আজ সকালে।'

'বেশ···বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে তো?'

'ভুয়ো নামে।'

'ও বাড়ীতে খোলাখুলি থাকলেও আমাদের কেউ চিনতে পারবে না বলছো। ঠিক তো?'

মনটা দমে গেল শেষ নামটা শুনতে না পেরে। কোন শহরে উইলহেম গা-ঢাকা দিচ্ছে, তা ধরেও ধরতে পারলাম না। কিন্তু যা শুনলাম, তা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের শত্রুপক্ষ মানব-রূপ ধারণ করতে চলেছেন। হঠাৎ এ-ঝোঁক মাথায় চাপল কেন বুঝলাম না। ধরে নিলাম, অধিক দিন অদৃশ্য থাকা মানেই শরীরকে ধকল দেওয়া—তাই বেদম হয়ে পড়েছেন অদৃশ্য যাদুকর। কথাটা কতদূর সত্যি, তা যাচাই করা তো সম্ভব নয়। মনে হল, তাই বললাম।

কণ্ঠস্বর আবার এগিয়ে আসছে। হারম্যান কথা বলছে। গোড়াটা শুনতে পেলাম না, কানে ভেসে এল শেষের শব্দগুলো—'ও নামে আমাদের ছায়ার সন্ধানও পাবে না রাগ পুলিশ।'

রাগ পুলিশ ?··বটে! তাহলে হাঙ্গারীরই কোনো শহরে নাম ভাঁড়িয়ে থাকতে চলেছে উইলহেম!

পায়ের শব্দ আবার দূরে সরে গেল। সেই ফাঁকে মুসিয়ে স্টেপার্ক শুধোলেন—'কোন শহর ? ছদ্ম নামগুলোই বা কি ? যে-ভাবেই হোক বার করতেই হবে।'

আমি জবাব দেবার আগেই ফিরে এল ওরা। থামল কয়েক পা দূরে।

হারম্যান জিজ্ঞেস করল—'স্প্রেমবার্গে যেতেই হবে ? খুব দরকার ?'

'খুবই দরকার। ওখানকার ব্যাঙ্কে টাকা রয়েছে যে। এখানেও আছে। কিন্তু চেহারা দেখাতে পারছি কই। কিন্তু ওখানে

'রক্তমাংসের চেহারা ধরবেন নাকি ?'

'না ধরেই বা উপায় কি ? টাকা কে চাইছে, তার চেহারা না দেখলে টাকা কি কেউ দেয় ?'

যা ভেবেছিলাম, তাহলে তাই হয়েছে। অদৃশ্য হওয়ার অসুবিধে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে উইলহেম। টাকা দরকার। টাকার জন্যেই দৃশ্যমান হওয়া দরকার।

উইলহেম বলে চলেছে শুনলাম—'কি যে করব, তাই মাথায় আসছে না। গর্দভগুলো ল্যাবোরেটরী ধ্বংস করেছে·· দু'নম্বর সলিউশনও গেছে সেই সঙ্গে। কপাল ভাল আমার, বাগানের গোপন জায়গাটা ওদের নজরে আসেনি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই চাপা পড়েছে জায়গাটা। পরিষ্কার করার জন্যে তোমাকে দরকার।'

'যা হুকুম করবেন,' বলল হারম্যান।

'পরশু দশটার পর এসো। দিন রাত আমাদের কাছে সমান। দিনে অন্ততঃ পরিষ্কার দেখা যাবে সব কিছু।'

'কালকেই চলুন না?'

'কাল আমার কিছু কাজ আছে। আর একটা খেলা দেখানোর ফন্দি ভাঁজছি। এ-খেলা আমার জানাশুনো একজনের মনে ধরলে হয়।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে দূরে সরে গেল। ফিরে এল একটু পরে:

'না, রাগ ছেড়ে আমি নড়ছি না।' উইলহেমের রোষ কম্পিত কণ্ঠে এবার যেন মেঘের গজরানি। 'যদ্দিন মায়রার সঙ্গে ঐ ফরাসী থাকছে, তদ্দিন ঐ ফ্যামিলি আমার চোখের বালি…'

কথাটা শেষ করতে পারল না উইলহেম। তার বদলে খানিকটা শ্বাপদ-গর্জন বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। সেই মুহূর্তে খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। এত কাছ দিয়ে যে হাত বাড়ালেই ধরা যেত। কিন্তু মনটা চলে গেল হাঁরম্যানের একটা কথায়:

'রাগের কাকপক্ষীও এখন জেনে গেছে অদৃশ্য হবার ক্ষমতা আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে, তা কেউ জানে না।'

'কোনোদিনই জানবে না, খ্যাঁক করে উঠলেন উইলহেম স্টোরিজ।' হয়েছে কি রাগ-য়ের—এই তো কলির সন্ধ্যে! এত সহজে ছাড়ছি না আমি…ওরা ভেবেছে কি আমার বাড়ী পুড়িয়েছে বলে আমার গুপ্ত-রহস্যও ছাই হয়েছে?··গাধার দল!…আমার প্রতিহিংসার আগুন থেকে নিষ্কৃতি নেই রাগ-য়ের…শহরের সবকটা পাথর ওলোট-পালোট না করা পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না!'

শহরের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার মত হুমকিই বটে। কিন্তু হুমকিটা মুখ থেকে খসতে না খসতেই ভীষ ভাবে কেঁপে উঠল ঝোপঝাড়ের গাছপালা। উল্কাবেগে ছুটছেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক—ছুটছেন কণ্ঠস্বর যেদিকে শোনা গিয়েছে —সেইদিকে। সেইসঙ্গে চেঁচাচ্ছেন তারস্বরে—'একটাকে ধরেছি, ভাইডাল। আপনি ধরুন আর একটাকে!'

চোখে দেখা না গেলেও, সত্যি সত্যিই একটা দেহর ওপর হাত পড়েছিল মঁসিয়ে স্টেপার্কের। কিন্তু এমন জোরে তাঁকে ঠেলে ফেলা হল যে আমি না ধরলে উনি গড়াগড়ি যেতেন মাটিতে।

শত্রুকে চোখে দেখা যাচ্ছে না যে অবস্থায়, সে অবস্থায় আমাদের অবস্থা যে কতখানি অসহায়, তা না বললেও চলে। ভেবেছিলাম, এবার অদৃশ্য শত্রুর হামলা শুরু হবে আমাদের ওপর। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। বাঁদিক থেকে একটা বিদ্রূপতরল অট্টহাসি ভেসে এল। সেই সঙ্গে শুনলাম পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

'ফসকে গেল!' সে কি আপশোষ মঁসিয়ে স্টেপার্কের। 'তবে একটা জিনিস আর ধোঁকা রইল না। অদৃশ্য শরীর ঝাপটে ধরা যায়!'

কিন্তু ঝাপটে ধরার পরেও ফসকে গেছে ওরা। লুকিয়ে থাকার জায়গার সন্ধানও আমরা জানি না। তা সত্ত্বেও কিন্তু মঁসিয়ে স্টেপার্কের আনন্দে ভাঁটা পড়ল না।

ফেরবার পথে বললেন নীচু গলায়—'এবার ওদের বাগে পেয়েছি। ওদের দুর্বলতা কোথায় জেনেছি। পরশু ওদের আসতেই হবে পোড়াবাড়ীর ধ্বংস-স্তূপ ঘাঁটতে। দুটোকেই পাকড়াও করার সেই তো মোক্ষম সুযোগ। একজন ফসকালেও আরেকজন জালে পড়বেই।'

মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। দেখি, মায়রার বিছানার পাশে ঠায় বসে ম্যাডাম রোডরিখ আর মার্ক। ডাক্তারকে নিয়ে ঘর বন্ধ করে বসলাম খবর জানাতে। দ্বীপে যা ঘটল এইমাত্র, তা ওঁর জানা দরকার।

সবই বললাম। মঁসিয়ে স্টেপার্কের আশাবাদী মন যা ভাবছে তাও বললাম। তবে, উনি যে খুব বেশী আশা করে ফেলেছেন, তা বলতেও ছাড়লাম না।

রাগ শহরের প্রতি এবং রোডরিখ ফ্যামিলির ওপর উইলহেম স্টোরিজের প্রচণ্ড প্রতিহিংসা গ্রহণের সংকল্প এবং হুমকি শুনে ডক্টর রোডরিখ ঠিক করলেন রাগ শহর ছেড়ে সটকান দেওয়া এখন একান্তই দরকার। চুপিসারে যেতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে।

বললাম—'আপনার সঙ্গে আমি একমত। আপত্তি শুধু এক জায়গায়, শরীর-মনের এই অচলাবস্থায় পথকষ্ট সইতে পারবে কি মায়রা?'

'স্বাস্থ্যের কোনো পরিবর্তন তো নেই,' বললেন ডাক্তার। 'ভোগান্তি নেই। শারীরিক ব্যাধি নেই। চেতনাটা কেবল এখনো নিপাত্তা।'

'কিছুদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' জোর দিয়েই বললাম আমি। 'যে-শহরে গেলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সেখানে গেলে সেরে উঠবে আরো তাড়াতাড়ি।'

'হায়রে! এখান থেকে সরলেই কি বিপদ কাটছে, উইলহেম পীছু নিতেও তো পারে।'

'গোপনে গেলে এবং যাবার জায়গাটা গোপন রাখলে তাও পারবে না।'

'গোপন রাখব!' বিষণ্ন কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন ডাক্তার।

বুঝলাম, আমার ভায়ার মতই ওঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছে, সত্যিই উইলহেমের

কাছ থেকে কিছু গোপন রাখা যায় কিনা। সেই মুহূর্তে এই ঘরেই সে বসে বসে আমাদের শলাপরামর্শ শুনতে শুনতে নতুন ফন্দী আঁটছে কি না তা কে জানে।

সংক্ষেপে, যাওয়াই স্থির হল। ম্যাডাম রোডরিখ আপত্তি করলেন না। উনিও অনেকদিন ধরে চাইছিলেন মায়রাকে নতুন পরিবেশে নিয়ে যেতে।

মার্কও দ্বিমত করল না। দ্বীপের কাহিনী অবশ্য চেপে গেলাম—বলে কোনো লাভ নেই বলেই বললাম না। বললাম ক্যাপ্টেন হারালানকে। আমাদের পলায়নের প্ল্যান শুনে আপত্তি করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি সঙ্গে আসছেন নিশ্চয় ?'

'তাছাড়া আর কিছু করার আছে কি ? মার্কের কাছাকাছি থাকার আমার যতটা দরকার, আপনারও দরকার মায়রার··'

'আমি যাব না,' যে স্বরে কথাটা বললেন ক্যাপ্টেন সংকল্পে অটল থাকলে তবে সে-স্বরে কথা বলা যায়।

'যাবেন না ?'

'না · মানে···রাগ শহরেই আমি থাকতে চাই। সে যখন এখানেই, তখন আমাকেও থাকতে হবে এখানে।'

তর্ক করা মিছে। তাই তর্ক করলাম না। বললাম—'বেশ তো।'

'মাই ডিয়ার ভাইডাল, আমার ফ্যামিলি এখন আপনারও ফ্যামিলি। আমার জায়গায় আপনি রইলেন কিন্তু।'

'ভরসা রাখতে পারেন আমার ওপর।'

এরপর শুরু করলাম যাত্রার বন্দোবস্ত। সারাদিনে ভাড়া করলাম দুটো আরামপ্রদ গাড়ী। তারপর মঁসিয়ে স্টেপার্কের কাছে গিয়ে খুলে বললাম আমার প্ল্যান।

উনি বললেন—'ভালই করছেন। সারা শহর আপনাদের পদানুসরণ করতে পারছে না, এইটাই যা দুঃখ!'

দেখলাম উনি খুবই ব্যস্ত। গতরাতের ঘটনার পর ব্যস্ত থাকাটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

সাতটা নাগাদ শহরে ফিরে এলাম। সব ঠিকঠাক আছে কিনা, নিজে দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম।

আটটার সময়ে এল গাড়ী দুটো। একটাতে বসবেন সস্ত্রীক ডক্টর রোডরিখ এবং কন্যা। অপরটিতে মার্ক ও আমি। দুটো গাড়ীই শহর ছেড়ে বেরোবে দুটো ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাতে কেউ উৎসুক না হতে পারে।

ঠিক তখনই ঘটল এমন একটা ঘটনা, বল্গাহীন কল্পনা শক্তি দিয়েও যা কল্পনা করা যায় নি। নাটকীয় বহু আঘাতই পেয়েছি আজ পর্যন্ত—তাদের মধ্যে ভয়ংকরতম এই নাটকীয় চোট।

গাড়ীদুটো দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতীক্ষায়। প্রথম গাড়ীটা সামনের দরজায়, দ্বিতীয়টা বাগানের প্রান্তে ছোট দরজায়। ডাক্তার আমার ভায়াকে নিয়ে ওপরে গেলেন মায়রাকে বয়ে নিয়ে আসার জন্যে।

আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন চৌকাঠে। বিছানা শূন্য। মায়রা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

মায়রা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

খবরটা দেখতে দেখতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়ীতে। প্রথমবার শুনে খবরটার তাৎপর্য কেউ ধরতে পারেনি।· অদৃশ্য? কোন মানে হয় এ কথার? অসম্ভব!

মায়রা যে ঘরে বিছানায় শুয়েছিল, আধঘণ্টা আগে ম্যাডাম রোডরিখ এবং মার্ক সেই ঘরেই ছিলেন। বাইরে বেরোনোর পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে শুয়েছিল মায়রা। শান্ত মুখচ্ছবি। প্রশান্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। একটু আগেই সামন্য খেয়ে নিয়েছে মার্কের হাতে। বৌকে খাইয়ে মার্ক নীচে নেমে গিয়েছে রাতের খাওয়া খেতে। খাওয়া দাওয়া সেরে ডক্টরকে নিয়ে ফের গিয়েছিল মায়রার ঘরে ওকে গাড়ীতে নামানোর জন্যে।

নাটকীয় শকটা পেয়েছে ঠিক তখনি। গিয়ে দেখে বিছানায় নেই মায়রা। ঘর শূন্য।

'মায়রা!' আর্তচীৎকার করে উঠেছে মার্ক, তীরের মত ছিটকে গেছে জানালার সামনে। কিন্তু জানালা তো বন্ধ। ও-পথে তো গায়েব হয়নি মায়রা—আদৌ গায়েব হয়েছে কিনা তাই বা কে জানে।

ছুটতে ছুটতে এলেন ম্যাডাম রোডরিখ, পেছনে ক্যাপ্টেন হারালান। বাড়ীময় ছুটোছুটি আরম্ভ হল দুজনের। মুখে এক ডাক—'মায়রা! মায়রা!'

জবাব দিল না মায়রা। না দেওয়াটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ঘর থেকে সে উধাও হল কি করে? তবে কি নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠেছে মায়রা? মায়ের ঘর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে, অথচ কারও চোখে পড়েনি?

আমি তখন গাড়ীতে মালপত্র ওঠাচ্ছি, এমন সময় চমকে উঠলাম চেঁচামেচি শুনে। সঙ্গে সঙ্গে এলাম দোতলায়।

পাগলের মত ছুটছিলেন ডক্টর এবং মার্ক। মার্ক উন্মাদের মত ডেকে চলেছে স্ত্রীকে :

'মায়রা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কি বলতে চাস, মার্ক?'

জবাব দেবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল না ডক্টরের কণ্ঠে। তবুও তিনি বললেন কোনমতে—'আমার মেয়ে—অদৃশ্য!'

ম্যাডাম রোডরিখ জ্ঞান হারিয়েছেন। ডক্টর তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন হারালানের মুখটা তেউড়ে বেঁকে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছে। বিস্ফারিত চোখে আমাকে বললেন :

'সে ·আবার সে!'

আমি কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার চেষ্টা করলাম। ক্যাপ্টেন হারালানের মতবাদকে ফেলে দেওয়া মুস্কিল। বাইরের লোকের বাড়ীতে ঢোকা রোধ করার যে আয়োজন আমরা করেছি, তাকে কলা দেখিয়ে উইলহেম স্টোরিজ বাড়ী ঢুকেছে, এ-কথা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা যখন চম্পট দিতে ব্যস্ত, তখন হয়ত ঢিল পড়েছিল আমাদের বজ্র আঁটুনিতে। ফলে টুক করে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে উইলহেম। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওকে নিশ্চই অনেকদিন ধরে তক্কে তক্কে থাকতে হয়েছে, সমানে চোখ রাখতে হয়েছে আমাদেব ওপর। বাড়ীতে ঢোকার পর কাজ হাসিলও করতে হয়েছে ঝটিকা বেগে।

এ-রকম একটা ধারনা যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, কি করে যে মায়রা গায়েব হল—তা বোঝা যাচ্ছে না। যে দরজার সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আমি তো সেখান থেকে নড়িনি? আমি দেখলাম না, অথচ আমারই চোখের সামনে দিয়ে দরজা পেরিয়ে নেমে গেল মায়রা—তাও কি সম্ভব? উইলহেম স্টোরিজ না হয় অদৃশ্য। কিন্তু সে? · ·

গ্যালারীতে গিয়ে চাকরকে ডাক দিলাম। বুলেভার্ড টেকেলির দিকে বাগানের যে দরজা, তার কপাটে পড়ল তালা। চাবী রইল আমার কাছে। তারপর সারা বাড়ীর প্রতিটি ইঞ্চি ··· দেখলাম তন্ন তন্ন করে। চিলেকোঠা, পাতাল ঘর, টাওয়ার, ছাদ—কিছু বাদ দিলাম না। বাড়ীর পর গেলাম বাগানে···

কাউকে দেখলাম না।

ফিরে গেলাম মার্কের কাছে। বেচারা ভাইটি কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—বুক ভেঙে যায় সে কান্না শুনলে।

আমার মনে হল, আগে খবর দেওয়া দরকার পুলিশ-চীফকে। ক্যাপ্টেন হারালানকে বললাম—'আমি চললাম টাউন হলে। আপনিও আসুন।'

গাড়ী তখনো দাঁড়িয়ে। আমরা গিয়ে বসলাম ভেতরে। ফটক খুলতে না খুলতেই টগবগিয়ে ছুটল ঘোড়া। দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম টাউন হলে।

পড়ার ঘরে ছিলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। সব কথা বললাম আমি। অবাক হওয়াটা তাঁর ধাতে নেই যদিও, কিন্তু সেই প্রথম ভদ্রলোককে চোখ কপালে তুলতে দেখলাম।

সবিস্ময়ে বললেন—'সেকী! অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন ম্যাডমোয়াজেল রোডরিখ!'

'হ্যাঁ, বললাম আমি। অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি। গায়েব হয়েছে কি নিজেই গিয়েছে—তা জানি না। কিন্তু সে নেই!'

'এ তাহলে সেই স্টোরিজের কাজ,' তিনিও একমত হলেন ক্যাপ্টেন হারালানের সঙ্গে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—'আনন্দে আটখানা হয়ে সেদিন এই খেল্‌টার কথাই বলেছিল উইলহেম। চরম খেল্‌ বটে।'

ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। আগেভাগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল উইলহেম। আমরা এতই নিরেট মস্তিষ্ক যে তা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিনি।'

'আসবেন নাকি আমার সঙ্গে রোডরিখ ভবনে?' শুধোলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

'এক্ষুণি।' বললাম আমি।

'একটু দাঁড়ান। দু'চারটে অর্ডার দিয়ে নিই।'

সার্জেণ্টকে ডাক দিলেন পুলিশ-চীফ। এক স্কোয়াড পুলিশ নিয়ে সারারাত ডক্টর রোডরিখের বাড়ী ঘেরাও করে বসে থাকতে হুকুম দিলেন! তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিম্নকণ্ঠে কি-যেন আলোচনা করলেন সহকারীর সঙ্গে। এরপর গাড়ীতে চেপে তিনজনে এসে পৌছোলাম রোডরিখ ভবনে।

আর এক দফা খানাতল্লাসি হল সারা বাড়ী। পণ্ডশ্রমই হল। কিন্তু মায়রার ঘরে ঢুকেই মঁসিয়ে স্টেপার্ক বললেন—'মঁসিয়ে ভাইডাল, অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছেন? এ-গন্ধ এর আগেও কিন্তু আমাদের নাকে ধরা পড়েছে। কোথায় বলুন তো?'

সত্যিই তো। খুব ফিকে একটা গন্ধ যেন ভাসছে বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার। বললাম—'মঁসিয়ে স্টেপার্ক, স্টোরিজ ল্যাবোরেটরীতে

হাত বাড়িয়ে যে শিশি ভর্তি তরল পদার্থ ধরতে গিয়েও ধরতে পারেন নি—মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, এ-গন্ধ সেই তরল পদার্থের গন্ধ না ?'

'ঠিক ধরেছেন, মঁসিয়ে ভাইডাল। এখন অনেক কিছুই অনুমান করা যেতে পারে। এ-গন্ধ যদি সেই তরল পদার্থের গন্ধ হয় যা দিয়ে উইলহেম নিজে অদৃশ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় উইলহেম ম্যাডমোয়াজেল মায়রাকে একই আরক খাইয়ে অদৃশ্য করে দিয়েছে। তারপর কাঁধে করে নিয়ে পালিয়েছে।'

মাথায় বুঝি বাজ পড়ল আমাদের। ঠিকই তো, নিশ্চয় তাই ঘটেছে। সেদিন ল্যাবোরেটরী খানাতল্লাসির সময়ে উইলহেম স্বয়ং হাজির ছিল সেখানে। শিশি নিজেই ভেঙেছে সে। শিশির আরক দেখতে দেখতে উবে গিয়েছে। আমরা বাজেয়াপ্ত করতে পারিনি। ঠিক, ঠিক, বিচিত্র এই গন্ধ সেই আরকের গন্ধই তো বটে! গাড়ীতে জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে এতবার দরজা দিয়ে আনাগোনা করছি যে কোন্ এক ফাঁকে সুঁট করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে উইলহেম, মায়রার ঘরে ঢুকেছে, তাকে গায়েব করেছে।

রাতটা কাটল যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। মার্কের পাশে আমি, ম্যাডাম রোডরিখের পাশে ডক্টর! রাত ভোর হওয়ার অসহ্য প্রতীক্ষা!

দিনের আলোতেই কি সুরাহা হবে আমাদের সমস্যার?...উইলহেম স্টোরিজের কাছে দিনের আলো বলে কিছু আর আছে কি? সে কি জানে না নিরন্ধ্র রাত্রি ওকে ঘিরে রয়েছে প্রতিটি মুহূর্ত?

রেসিডেন্সীতে রিপোর্ট করার জন্যে মঁসিয়ে স্টেপার্কের যাওয়া দরকার। কিন্তু ভোরের আগে তিনি আমাদের কাছছাড়া হলেন না। যাওয়ার আগে উনি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে এমন কতকগুলো কথা বললেন, যার মানে বোঝা ভার। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে কথাগুলো যেন আরো বেশী দুর্বোধ্য। বললেন—'একটা কথা, মঁসিয়ে ভাইডাল, ভেঙে পড়বেন না। খুব একটা ভুল যদি না হয়ে থাকে আমার, তাহলে জানবেন আপনাদের দুর্গতি এইবার শেষ হতে চলল।'

কথাগুলো উৎসাহ ব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কোনো জবাব দিলাম না। জবাব দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম পুলিশ-চীফের দিকে। ভুল শুনলাম না তো? বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পেল বুঝি। শক্তি এবং উৎসাহের শেষ সীমায় পৌঁছেছি বলেই এর বেশী আর কিছু আমার কাছ থেকে পেলেন না মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

আটটা নাগাদ গভর্নর এলেন। ডক্টরকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, সর্ব

শক্তি দিয়ে উদ্ধার করা হবে তার মেয়েকে। শুনে আমি আর ডক্টর রোডরিখ অবিশ্বাসের তিক্ত হাসি হাসলাম। বাস্তবিকই, এ-ছাড়া আর কি বলার আছে গভর্নরের।

উষার আলো ফুটতে না ফুটতেই গায়েব সংবাদ রাগ শহরে ছড়াতে শুরু হয়েছিল। পরিণামটা যা দাঁড়ালো তার বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

নটার আগেই বাড়ীতে এলেন লেফটেন্যাণ্ট আর্মগার্ড। এসেই কমরেড বন্ধুর সাহায্যে লাগতে চাইলেন। কিন্তু, হায় ভগবান, কিসের সাহায্য?

যাই হোক, ক্যাপ্টেন হারালান দেখলাম আমার মত পোষণ করেন না। বন্ধুর ইচ্ছে একেবারেই যে নিরর্থক, একথা মানেন না বলেই ধন্যবাদ জানালেন লেফটেন্যাণ্টকে। খাপশুদ্ধ তরবারি বেল্ট কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বললেন:

'এসো।'

দুই অফিসার এগোলেন দরজার দিকে। অদম্য বাসনা হল ওদের পিছু নেওয়ার। মার্ককে সঙ্গে নিতে চাইলাম। মার্ক বুঝতে পারল কি না বুঝলাম না। কোনো জবাব দিল না।

বাইরে বেরিয়ে দেখি দুই অফিসার নদীতীর ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কয়েকজন পথচারী আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বাড়ীর দিকে। আতঙ্কর নাগপাশে দেখছি গোটা শহরটা মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে।

দুই অফিসারের নাগাল ধরবার পর ক্যাপ্টেন হারালান কিন্তু আমার পানে ফিরেও তাকালেন না। আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ভদ্রলোক সজাগ ছিলেন না সেই মুহূর্তে, একথা কেউ তখন আমায় বললেও কিন্তু অবিশ্বাস করতাম না।

'আসছেন আমাদের সঙ্গে? শুধোলেন লেফটেন্যাণ্ট আর্মগার্ড।

'হ্যা। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

লেফটেন্যাণ্ট এমনভাবে হাত নাড়লেন যার কোনো স্পষ্ট মানে মাথায় এল না। কোথায় চলেছেন দুই বন্ধু?···যেদিকে খুশী বলেই মনে হল। বাস্তবিকই এ-পরিস্থিতিতে যেদিকে দু'চোখ যায় যাওয়া ছাড়া গতিই বা কি?

কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন হারালান। শুধোলেন কাটা-কাটা স্বরে:

'কটা বাজে?'

'সওয়া ন'টা।' ঘড়ি দেখে বললেন লেফটেন্যাণ্ট।

আবার শুরু হল পথ চলা।

কিছুটা অনিশ্চিতভাবে হাঁটলাম তিনজনে—কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। মাঝে মাঝে এমনিভাবে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন হারালান যেন মাটির

সঙ্গে পাদুটো কেউ পেরেক ঠুকে আটকে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করছেন কটা বাজে। কমরেড জবাব দিচ্ছেন—"ন'টা পঁচিশ·· সাড়ে ন'টা···দশটা বাজতে কুড়ি···" জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরম্ভ হচ্ছে পথ পরিক্রমা। গন্তব্যস্থান কিন্তু তখনও অনিশ্চিত।

বাঁদিকে ফিরতেই এসে পড়লাম উপাসনা-মন্দিরের সামনে।

রাগ-শহরের অভিজাত অঞ্চল এ-দিকটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন তা মৃতের অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। দ্রুতপদে হাঁটছে দু'চারজন পথচারী। অধিকাংশ জানলা বন্ধ। দিনটা যেন শোকের দিন হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

রাস্তার শেষে দেখা যাচ্ছে বুলেভার্ড টেকেলি। যতদূর দেখা যায়, খাঁ-খাঁ করছে। আগুন দেওয়ার পর থেকে এদিক আর কেউ মাড়ায় না!

'কোন দিকে যাবেন ক্যাপ্টেন? কেল্লাবাড়ীর দিকে না, নদীর দিকে?'

আবার থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। কোনদিকে যাবেন, ঠিক করতে পারছেন না যেন। শুধোলেন সেই একঘেয়ে প্রশ্ন:

'কটা বাজে আর্মগার্ড?'

'দশটা বাজতে দশ,' জবাব দিলেন লেফটেন্যান্ট।

'এবার সময় হয়েছে।' বললেন হারালান। বলেই হন হন করে এগোলেন বুলেভার্ডের দিকে।

উইলহেম স্টোরিজের বাড়ীর সামনের রেলিং বরাবর শুরু হল হাঁটা। ক্যাপ্টেন ফিরেও তাকালেন না। চলার গতি একটুও না কমিয়ে ঘুরে এলেন বাড়ীটা এবং পেছন দিককার রাস্তায় না পৌঁছানো পর্যন্ত গতিবেগ শ্লথ করলেন না। বাগান আর রাস্তার মাঝে সাতফুট উঁচু একটা পাঁচিলের মাথা দেখিয়ে বললেন:

'তুলে ধরো।'

ঐ দুটি শব্দের মধ্যেই এতক্ষণের অদ্ভুত আচরণের অর্থটা স্পষ্ট হল। মায়রার দুভাগা ভাইয়ের ফন্দী ধরতে আর দেরী হল না।

দশটা—এই সময়টাই না উইলহেম স্টোরিজের মুখে শুনেছি মাত্র দু'দিন আগে আড়ি পেতে? দশটার সময়ে আসতে চেয়েছিল সে এখানে। ক্যাপ্টেন হারালানকে আমি নিজেই সে-কথা বলেছি না?

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে এইখানে, পাঁচিলের আড়ালে, হাজির হয়েছে রাক্ষসটা। যে বস্তুর সাহায্যে সে এত অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে, অজ্ঞাত সেই গোপন ভাণ্ডারের গুপ্ত পথ উন্মোচন করতে উপস্থিত হয়েছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ভাঁড়ার খুঁজতে সে যখন তন্ময়, ঠিক তখনি তাকে ভড়কে দেব একযোগে হানা দিয়ে?

সত্যিকথা বলতে কি, আদৌ তা সম্ভব নয়। কিন্তু এতবড় সুযোগ তো ছাড়া যায় না। যা হয় হোক, সুযোগ নষ্ট করতে রাজী নই।

পরস্পরকে ধরাধরি করে পাঁচিল টপকালাম তিনজনে। মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে পড়লাম সরু একটা রাস্তার ওপর। রাস্তার পাশে ঘন ঝোপ। এখানে ওৎ পেতে থাকলে স্টোরিজ কেন, কারোরই নজরে পড়া সম্ভব নয়।

'দাঁড়া এখানে,' বললেন ক্যাপ্টেন হারালান। বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে গেলেন বাড়ীর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আর ওঁকে দেখতে পেলাম না।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর বাঁধভাঙা কৌতূহলের তোড়ে ভেসে গেলাম দু'জনে। গুটি গুটি এগোলাম সামনের দিকে। বুনো-ঝোপের পাতায় গা-ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম বাড়ীর দিকে।

অচিরে পুরো বাড়ী ভেসে উঠল চোখের সামনে। গাছপালার কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, প্রায় বিশ গজ চওড়া একটা খোলা জমি। তারপর বাড়ীটা।

জমির সঙ্গে প্রায় লেপটে গিয়ে প্রায় দমবন্ধ করে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইলাম খোলা জমিটার দিকে।

আগুনে পোড়া কালো দেওয়াল ছাড়া কিছুই আর ছিল না সেখানে। দেওয়ালের গোড়া ঘেঁসে পড়ে আছে পাথর, পোড়া কাঠের টুকরো. দোমড়ানো লোহা, রাশি রাশি ছাই এবং আসবাবের ধ্বংসাবশেষ।

বিপুল সেই ভগ্নস্তূপের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম আমরা। হায়রে, এমনিভাবে বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান জার্মানটাকে পুড়িয়ে মারলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। সেই সঙ্গে ওর পিলে চমকানো গুপ্ত আবিষ্কারও যেত নিশ্চিহ্ন হয়ে।

খোলা জমিটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে লাগলাম চোখ দিয়ে আমি আর লেফটেন্যান্ট। তারপরেই আচমকা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম দুজনে। প্রায় তিরিশ পা দূরে ঠিক আমাদের মতই ঝোপের আড়ালে গা মিলিয়ে ওৎপেতে বসে রয়েছেন ক্যাপ্টেন হারালান। ঘন ঝোপটা ওঁর কাছ থেকেই আস্তে আস্তে বাঁক নিয়ে পৌঁছেছে বাড়ীর এক কোণে। বাড়ী আর ঝোপের মাঝখানে ছ-গজ চওড়া একটা রাস্তা। ক্যাপ্টেন হারালানের চোখ এই কোনটার দিকেই। একদম নড়ছিলেন না ভদ্রলোক। গুঁড়ি মেরে মাংশপেশী এমন টান-টান করেছিলেন যেন একটা বুনো পশু—লাফ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

যে দিকে উনি তাকিয়ে, আমরাও তাকালাম সেইদিকে। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম কেন উনি অমন তন্ময় হয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে ঐ দিকে।

বাস্তবিকই ভারী অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটছিল সেখানে। কাউকে দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু অবর্ণনীয়ভাবে নড়ছিল রাবিশস্তূপ। খুব আস্তে আস্তে কে যেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে রাবিশ সরাচ্ছে। পাছে কারও চোখ পড়ে যায়, তাই অত্যন্ত ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে সরাচ্ছে পাথর, ধাতুর টুকরো, হাজার হাজার ভাঙাচোরা অংশের স্তূপ। সরিয়ে রাখছে পাশে। জমা করছে স্তূপাকারে।

রহস্যজনক বিভীষিকা দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তাকিয়েই ছিলাম। চোখগুলো মনে হচ্ছিল যেন অক্ষি-কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আসল ব্যাপারটা বিদ্যুৎ চমকের মতই ধাঁধিয়ে দিয়েছিল মস্তিষ্কের কোষগুলো। উইলহেম স্টোরিজ এসেছে। সশরীরে উপস্থিত হয়েছে। কারিগররা অদৃশ্য বটে, কিন্তু দৃশ্যমান তাদের হাতের কাজ।

আচম্বিতে একটা চীৎকারে খান্ খান্ হয়ে গেল শ্বাসরোধী স্তব্ধতা···ভয়ানক কণ্ঠে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছে বিকটভাবে·· ঝোপের মধ্যে গা-ঢেকে দেখলাম জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন হারালান· পাঁই পাঁই করে দৌড়োচ্ছেন রাস্তা বেয়ে। ভগ্নস্তূপের ধারে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই এমনভাবে আছাড় খেলেন ভদ্রলোক যেন অদৃশ্য একটা বাধায় ধাক্কা লেগেছে·· আবার দৌড়োলেন সামনে·· দুহাত বাড়িয়ে কি যেন ঝাপটে ধরবার চেষ্টা করলেন এবং পরক্ষণেই মল্লবীরের মত আঙুলে আঙুল মিলিয়ে সাপটে ধরলেন অদৃশ্য কাউকে

চেঁচিয়ে উঠলেন তারস্বরে—'ধরেছি, বদমাসটাকে ধরেছি! ভাইভাল হাত লাগান! আর্মগার্ড, দৌড়ে এস।'

কাছে যেতেই কে যেন পেছনে ঠেলে দিল আমাকে। হাত না দেখা গেলেও হাতের ধাক্কা মালুম হল সর্বাঙ্গ দিয়ে, সেইসঙ্গে মুখের ওপর আছড়ে পড়ল দমকা নিঃশ্বাস।

হ্যাঁ, হাতাহাতিই বটে। উইলহেম স্টোরিজ হোক, কি যেই হোক—অদৃশ্য মানবের সে এক আশ্চর্য হাতাহাতি! লোকটা যখন ধরা পড়েছে আমাদের হাতে, তখন ওর মুখ দিয়ে বার করে ছাড়ব মায়রা এখন কোথায়।

মঁসিয়ে স্টেপার্ক ঠিকই বলেছিলেন। অদৃশ্য হতে পারে উইলহেম, কিন্তু শরীরের কাঠামোটা যাবে কোথায়। ভূতের সঙ্গে তো লড়ছি না—ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে একটা রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে। অনেক মেহনৎ করে যাকে পাকড়াও করা গিয়েছে এখন চেষ্টা চলছে তাকে কব্জায় আনার। তাকে শক্তিশূন্য করার।

শেষ পর্যন্ত সার্থক হল আমাদের প্রচেষ্টা। অদৃশ্য শত্রুর এক হাত চেপে ধরলাম আমি, আর্মগার্ড ধরলেন আর একটা হাত।

'মায়রা কোথায়? কোথায় মায়রা?' ক্ষিপ্তের মত প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন হারালান।

জবাব নেই। তখনও ধ্বস্তাধ্বস্তি করে চলেছে বদমাস উইলহেম—হাত ফসকে সটকান দেবার সে কি চেষ্টা। লোকটা শক্তিমান। বলিষ্ঠ শত্রুকে বাগে রাখার জন্যে আমাদেরও চেষ্টার বিরাম নেই। একবার যদি হাত ফসকায় সঙ্গে সঙ্গে বাগানে বা ভগ্নস্তূপের কোথাও ঘাপটি মেরে ফের উধাও হবে উইলহেম, যাবে বুলেভার্ড এবং আর ধরা যাবে না তাকে। ছাই পড়বে বাড়া ভাতে।

'মায়রা কোথায় বলবেন কিনা বলুন?' ক্যাপ্টেন হারালান প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

অবশেষে শুনলাম এই কটি কথা:

'না, বলব না! জীবনেও বলব না!'

হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বলা হলেও স্বরের মালিক যে উইলহেম, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই!

বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না জাপটা-জাপটি। গায়ে যত জোরই থাকুক না কেন উইলহেমের, একা মানুষ তিনজনের সঙ্গে কাঁহাতক টক্কর দিতে পারে। কাজেই সে এলিয়ে পড়ল অচিরে।

ঠিক তখনি আচমকা মাটিতে ঠিকরে পড়লেন লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কে যেন খামচে ধরল আমার পা এবং সত্যি সত্যিই আমাকে উল্টে নিয়ে ছুঁড়ে দিল শূন্যপথে। হাত সরে গেল উইলহেমের গা থেকে। ক্যাপ্টেন হারালানের মুখের ওপর সপেটা আঘাত পড়ল। টলে উঠলেন ভদ্রলোক। শূন্য মুঠি দিয়ে বাতাস খামচে ধরলেন।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!' চীৎকার তো নয়—যেন সিংহগর্জন।

অপ্রত্যাশিতভাবে হারমান আবির্ভূত হয়েছে মনিবকে উদ্ধার করতে। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহই নেই তাতে।

আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। লেফটেন্যাণ্টের জ্ঞান নেই বললেই চলে—চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে রাস্তার ওপর। দৌড়ে গেলাম ক্যাপ্টেনের পাশে। দুজনে মিলে বৃথাই বাতাস হাতড়ালাম। উইলহেম স্টোরিজ পালিয়েছে।

পরক্ষণেই আচম্বিতে ঝোপের যেখানে শেষ, সেখানে আবির্ভাব ঘটল সারি-সারি মানুষের। রেলিং টপকেও লোক আসছে, আসছে পাঁচিল ডিঙিয়ে, ভাঙা বাড়ীর ভেতর থেকে। চারিদিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে ওরা পঙ্গপালের মত এদিকেই আসছে। শ'য়ে শ'য়ে আসছে। গায়ে গা লাগিয়ে, কনুইতে

কম্বুই ভিড়িয়ে আসছে সারি বেঁধে। পর পর তিনটে সারি। প্রথম সারিতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। পরের দুটি সারিতে পদাতিক সৈন্য। দেখতে দেখতে বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে ফেলল ওরা। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসতে লাগল সেই বৃত্ত……

এতক্ষণে বুঝলাম। এতক্ষণে মাথায় ঢুকল মঁসিয়ে স্টেপার্কের আশাব্যঞ্জক কথাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য। স্টোরিজের প্ল্যান স্টোরিজের মুখেই স্বকর্ণে শুনেছিলেন উনি। শুনে হুবহু সেইভাবে ব্যূহ রচনা করেছেন। এমন কৌশলে করেছেন যে আমি শুদ্ধু চমৎকৃত হচ্ছি। এই যে কয়েক 'শ লোক ঘিরে ধরেছে আমাদের, এদের একজনকেও তো বাগানে ঢুকতে দেখিনি।

বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আমরা·· ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে বৃত্ত···অসম্ভব! এ ব্যূহ ভেদ করে চম্পট দেওয়ার সাধ্য উইলহেমের নাই! ফাঁদে পড়েছে স্টোরিজ!

উইলহেম নিজেও তা বুঝেছিল নিশ্চয়। তাই খুব কাছেই ক্রোধকম্পিত চীৎকার শুনলাম। লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড দু'পায়ে সবে ভর দিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ফস করে কে যেন টেনে বার করে আনল তাঁর তরবারি কোমরের খাপ থেকে। অদৃশ্য হাতে তরোয়াল ধরে কে যেন ঘোরাচ্ছে মাথার ওপর।

উইলহেম স্টোরিজ। পলায়নের সব পথ বন্ধ। সুতরাং প্রতিহিংসা সে নেবেই। খুন করবে ক্যাপ্টেন হারালানকে·

শত্রুর তরবারি আস্ফালন দেখেই নিজের তরবারি কোষমুক্ত করছিলেন ক্যাপ্টেন হারালান। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন দুজনে—অসি যুদ্ধে দুই যোদ্ধা যেন মরণ-পনে সম্মুখীন হয়েছেন পরস্পরে· একজনকে দেখা যাচ্ছে·· আর একজনকে যাচ্ছে না!·· টক্কর লেগেছে তরোয়ালে তরোয়ালে···ঝনৎকার আরম্ভ হয়েছে দুই অসিতে· একজনের হাত দৃশ্যমান—অপরজনের অদৃশ্য!···

বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে গেল যে বাধা দেবার সময় পেলাম না আমরা।

একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল। উইলহেম স্টোরিজ জানে কি করে তরোয়াল চালাতে হয়। ক্যাপ্টেন হারালান আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে আঘাত হানছিলেন বেধড়ক। কব্জির এক মোচড়ে তরোয়াল নেমে এল কাঁধের ওপর—সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শত্রুর তরোয়ালে আটকে গেল তাঁর হাতিয়ার।···তা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর তরোয়াল ঝলসে উঠে এগিয়ে গেল সামনে।· অতীব্র যন্ত্রণায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, সবুজ লনের ঘাস চেপটে গেল তৎক্ষণাৎ

নিশ্চয় বাতাসে মাটির সঙ্গে মিশে যায়নি জমির ঘাস। দুমড়েছে মানুষের দেহভারে…গুরুভার দেহ…উইলহেম স্টোরিজের দেহ… বুক এফোঁড়-ওফোঁর হয়ে গিয়েছে তরবারির যুদ্ধে… ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ছে ঘাসে…দেহ প্রাণশূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে তার নশ্বর দেহ…যন্ত্রণার শেষ কাতরানির সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে তার মূর্তি।

উইলহেম স্টোরিজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন হারালান। চীৎকার করছে আকুল কণ্ঠে - 'মায়রা কোথায়? কোথায় মায়রা?'

কেউ জবাব দিল না। ঘাসে শুয়ে রইল কেবল একটা লাস। বিকৃত মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসা বিস্ফারিত চক্ষু, মরে গিয়েও রক্ত হিম করে দেওয়া মুখচ্ছবি। নিস্প্রাণ এ দেহ যার, অদ্ভুত সেই মানুষটিই একদা পরিচিত ছিল উইলহেম স্টোরিজ নামে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কি করুণ পরিণতি! কি ট্র্যাজেডী! ফুরিয়ে গেল উইলহেম স্টোরিজের বিচিত্র জীবন! ফুরোলো বটে, কিন্তু বড্ড দেরীতে। উইলহেম স্টোরিজকে এখন আর ভয় না করলেও চলবে রোডরিখ পরিবারের, কিন্তু তার মৃত্যুতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটা দূরের কথা, বরং আরো জটিল হল। সে বেঁচে থাকতে মায়রাকে উদ্ধার করার যেটুকু আশা ছিল, এখন তাও গেল।

গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হেঁট মুখে মৃত শত্রুর পানে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন হারালান। সুখ নেই, সুখ নেই তাঁর মনে। কিন্তু করারও কিছু নেই। ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। নিঃসীম নিরাশায় দু'কাঁধ ঝাকিয়ে অগত্যা ক্যাপ্টেন গুটিগুটি এগোলেন রোডরিখ পরিবারের ভবন অভিমুখে। মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ পেশ করতে হবে পরিবারের সবাইকে।

পক্ষান্তরে, আমি আর লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম। সঙ্গে রইলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। ভদ্রলোক যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন আচম্বিতে। চারিদিকে ছুঁচ পড়ার শব্দ শোনা যায়, এমনি স্তব্ধতা। শ'য়ে শ'য়ে লোক হুমড়ি খেয়ে দেখতে আসছে। ঠেলাঠেলি করে আরো ভালভাবে দেখে কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চাইছে, অথচ কোনো শব্দ নেই। সকলেই যেন সীমাহীন বেদনায় বোবা হয়ে গিয়েছে।

সকলেরই চোখ নিবদ্ধ নিস্প্রাণ দেহটির ওপর। বাঁদিকে ঈষৎ কাত হয়ে

শুয়ে উইলহেম, রক্তে মাখামাখি পোশাক, মুখ রক্তশূন্য, এক হাতে তখনও ধরা লেফটেন্যাণ্টের তরবারি, বাম বাহু দুমড়ে চাপা পড়েছে দেহের নীচে। সমাধিস্থ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে উইলহেম—যে সমাধির অশুভ শক্তিও তাকে রক্ষে করতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

'সেই বটে!' অনেকক্ষণ লাসের দিকে তাকিয়ে থাকার পর স্বগতোক্তি করলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

পুলিশের লোকরা এগিয়ে এসেছিল কাছে। ভয়ে ভয়ে এসেছিল, তারাও চিনতে পারল উইলহেমকে। শুধু চোখে দেখে সন্দেহ ঘোচেনি বোধহয় মঁসিয়ে স্টেপার্কের। তাই ভদ্রলোক প্রাণপিঞ্জরশূন্য উইলহেমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরখ করলেন।

দাঁড়িয়ে উঠে জানালেন—'মরে গেছে। মরে কাঠ হয়ে গেছে।'

হুকুম করলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। সঙ্গে সঙ্গে ডজন খানেক লোক দৌড়ে গিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরাতে আরম্ভ করল। একটু আগেই সেখানে ইঁট-কাঠ-পাথর-লোহা নড়েছে রহস্যজনকভাবে—অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখা গেছে স্টোরিজ-নিধনের কিছু পূর্বে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম উদ্দেশ্যটা কি? উনি জবাব দিলেন—'আমি সে-রাতে যা শুনেছিলাম, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ঐ সেই জায়গা যেখানে গুপ্ত-গহ্বরে আরক লুকিয়ে রেখেছে বদমাসটা। এই আরক খেয়েই বারংবার কলা দেখিয়েছে আমাদের। গুপ্ত-গহ্বর না পাওয়া পর্যন্ত এবং পাওয়ার পর সেখানে লুকোনো সবকিছু ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমি নড়ছি না। স্টোরিজ মৃত। বিজ্ঞান মুণ্ডপাত করে করুন, কিন্তু তবুও আমি চাইব স্টোরিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আবিষ্কারেরও মৃত্যু ঘটুক।

কথাটা যে বিলকুল খাঁটি, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করলাম। আমার মত ইঞ্জিনীয়ারের মনে কৌতূহল সঞ্চার করার উপযুক্ত আবিষ্কারই করেছেন অটো স্টোরিজ। কিন্তু বাস্তব লাভ কিছু আছে কি তাতে? বরং এ-আবিষ্কারকে মনুষ্য সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া মানেই মানুষের জঘন্যতম প্রবৃত্তিগুলোকে খুঁচিয়ে জাগ্রত করা।

অচিরে চোখ পড়ল একটা ছোটখাট ধাতুর পাত। পাতটা তুলে ফেলতেই আলোয় দেখা গেল একসার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির ওপরের ধাপ কটা।

ঠিক তখনি কে যেন আমার হাত আঁকড়ে ধরল। কানে ভেসে এল কাকুতি মিনতি:

'দয়া করুন! কৃপা করুন!'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। কাউকে দেখতে পেলাম না। অথচ সে আমার হাতে তখনও বন্দী। অপরের মুঠোয় এবং কানে কানে শুনতে পাচ্ছি আকুল কণ্ঠস্বর।

কাজ মাথায় উঠেছিল পুলিশের লোকের। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার পানে। আমার তখনকার উদ্বেগ আঁচ করা এমন কিছু কঠিন হবে না। একটা হাত মুক্ত হয়েছে বুঝলাম। চারপাশ হাতড়াতে লাগলাম সেই হাত দিয়ে।

আমার কোমরের কাছে হঠাৎ গিয়ে ঠেকলো কার মাথার চুল। একটু নীচে হাতের ছোঁয়ায় অনুভব করলাম চোখের জলে ভেজা একটা মুখ। মানুষ, নিঃসন্দেহে একজন মানুষ বসে আছে সেখানে! তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু। সে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে এবং ঝর ঝর করে কাঁদছে।

গলা দিয়ে সহজে স্বর বেরুলো না আমার—কেনন। আবেগে আমার নিজের কণ্ঠই তখন প্রায় বুজে এসেছে। তোৎলাতে তোৎলাতে বললাম—'কে তুমি?

'হারম্যান।' কে যেন জবাব দিল।

'কি চাও তুমি?'

ছাড়া-ছাড়া কথায় স্টোরিজের অদৃশ্য ভৃত্য যা জানালো তা এই: মঁসিয়ে স্টেপার্কের সঙ্কল্প সে শুনেছে। ভূগর্ভ-কক্ষের সবকিছু তিনি ধ্বংস করবেন। সঙ্কল্প মত কাজ করলে পুনরায় মানব-দেহ ফিরে পাওয়ার সব আশা ধূলিস্যাৎ হবে বেচারা হারম্যানের।

লোকালয়ে থেকেও নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে হারম্যানকে। অভিশপ্ত দিনগুলো কাটবে কি? তাই পুলিশ-চীফকে হাতে পায়ে ধরে মিনতি করল হারম্যান—গুপ্ত-গহ্বরে লুকোনো সব শিশি ধ্বংস করার আগে উনি যেন হারম্যানকে একটা শিশির আরক খাওয়ার সুযোগ দেন।

রাজী হলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। তবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যে কসুর করবেন না সে কথাও জানিয়ে দিলেন। কেননা, দেশের বিচার-ব্যবস্থার সঙ্গে হারম্যানের ফয়সালা আগে হওয়া দরকার। ওঁর হুকুমে চারজন গাঁট্টাগোট্টা পুলিশ চেপে ধরল হারম্যানকে। ফের যেন উধাও না হয় অদৃশ্য-ভৃত্য।

চারজনের হাতে বন্দী অবস্থায় হারম্যান সিঁড়ি বেয়ে নামল আমার আর

মসিয়ে স্টেপার্কের পিছু পিছু। সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা পাতলা ঘরে। চোরা দরজা দিয়ে সামান্য আলো নামছে সে-ঘরে। সরু একটা তাকের ওপর সারি দিয়ে সাজানো বি লেবেল লাগানো শিশি। কিছু লেবেলের ওপর লেখা "১ নম্বর"। কিছুর ওপর লেখা "২নম্বর"।

অস্থির কণ্ঠে একটা শিশি চাইল হারম্যান পুলিস-চীফ বাড়িয়ে দিলেন শিশিটা। তারপরেই দেখলাম অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য। চোখ কপালে তোলার মত কাণ্ড। শিশিটা শূন্যপথে অর্ধবৃত্ত রচনা করে উল্টে গেল; কে যেন মুখের ওপর উপুড় করে ধরেছে শিশি এবং ঢক ঢক করে তৃষিত চাতকের মত পান করছে শিশির আরক।

অতীব আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল তারপরেই। সত্যিই বিচিত্র। আরকের ধারা যতই নামল মুখের মধ্যে, ততই যেন শূন্যের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল হারম্যান। একেবারে নয়—আস্তে আস্তে। প্রথমে পাতালঘরের আধো অন্ধকারে দেখা গেল কুয়াশার মত আবছা একটা বস্তু, তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল হারম্যানের দেহ রেখা, সর্বশেষে দেখলাম সামনে আবির্ভূত হল সেই লোক যে আমার পেছনে ফেউয়ের মত লেগেছিল রাগ শহরে আমি পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

মঁসিয়ে স্টেপার্ক ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হল বাকী শিশিগুলো। আরক ছড়িয়ে পড়ল ঘরময় এবং উবে গেল দেখতে দেখতে। ধ্বংসপর্ব সমাধা হওয়ার পর ফিরে এলাম বাইরের আলোয়।

'মঁসিয়ে স্টেপার্ক, এখন কি করবেন বলুন' শুধোলেন লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড।

'টাউন হলে নিয়ে যাব লাস', জবাব দিলেন পুলিস-চীফ।

'খোলাখুলিভাবে?' শুধোলাম আমি।

'হ্যাঁ, খোলাখুলিভাবে। বাগ শহর জানুক উইলহেম স্টোরিজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না।'

'কবরে না শোয়ানো পর্যন্ত।' জুড়ে দিলাম আমি।

'আদৌ যদি কবরে শোয়ানো হয়।' জবাব দিলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক।

'আদৌ যদি শোয়ানো হয় মানে?'

'আমার মনে হয় মধ্যযুগে জাদুকরদের যেভাবে টিট করা হত, এ ক্ষেত্রেও তাই করা উচিত। অর্থাৎ লাসটাকে পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

স্ট্রেচার আনতে লোক পাঠালেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক। তারপর বেশীর ভাগ

লোককে নিয়ে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন বন্দী হারম্যানকে। অদৃশ্য অবস্থা থেকে ফের দৃশ্যমান হওয়ায় তাকে আর পাঁচটা মানুষের মতই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সেই অবসরে আমি লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ডকে নিয়ে গেলাম ডক্টর রোডরিখের বাড়ী।

ক্যাপ্টেন হারালান আগেই বাড়ী ফিরেছিলেন। বাবাকে সব খুলে বলেছিলেন। বলেন নি কেবল ম্যাডাম রোডরিখকে। ঐরকম মানসিক অবস্থায় এ-কথা তাঁর না শোনাই মঙ্গল। উইলহেম স্টোরিজ মরেছে, কিন্তু তাঁর কন্যা তো ফিরে আসে নি।

আমার ভায়াকেও তখনো পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। জানাতে অবশ্য হবে। সেই উদ্দেশ্যে ওকে পাঠালাম ডক্টরের পড়ার ঘরে।

খবর শুনে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তিতে টলমলিয়ে উঠল না মার্ক, কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল, তা হাহাকারের সামিল ঃ

'মারা গেছে!...মেরে ফেললে ওকে!...মরার সময়েও মুখ খোলেনি!... মায়রা!...আমার মায়রা!...আর তো ওকে দেখতে পাবনা!'

কি বলব এই শোকোচ্ছ্বাসের জবাবে?

তবুও আমি চেষ্টা করলাম। হাল ছাড়লে চলবে না। 'মায়রা কোথায় আমার না জানলেও এক জন জানে—উইলহেম স্টোরিজের ভৃত্য। লোকটাকে খাঁচায় পুরতে পেরেছে যখন তখন জেরায় জেরায় তাকে নাস্তানাবুদ করবে। প্রভুর মন জুগিয়ে এখন আর তার বোবা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই—প্রভু তো পরলোকে। সুতরাং প্রশ্নের জবাবে মুখ তাকে খুলতেই হবে—মুখ খুলতে বাধ্য করব তাকে...টাকার লোভ দেখাব...তাতেও কাজ না হলে উৎপীড়নের আয়োজন করব...মায়রাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে...স্বামীর কাছে... ফ্যামিলির সবাইয়ের কাছে, প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে তাকে নিয়ে আসতেই হবে.....'

মার্ক এ সবের কিছু শোনে নি। শুনতেও চায়নি। একমাত্র যার কথা শুনলে তার মন নেচে উঠত, সে মৃত। গুপ্ত সংবাদটা তার পেট থেকে উদ্ধার করার আগে তাকে হত্যা করে আমরা ভাল করি নি।

কি করে যে ভাইকে শান্ত করব ভেবে পেলাম না। হঠাৎ কথাবার্তায় বাধা পড়ল তুমুল সোরগোলে। দৌড়ে গেলাম জানলার সামনে। জানলা খুললেই চোখে পড়ে বুলেভার্ডের কোণটা।

কি দেখলাম?...আমাদের মনের তখন যা অবস্থা, কোনো কিছুতেই আর অবাক হতাম না। এমন কি উইলহেম স্টোরিজের ধড়ে প্রাণ ফিরে এলেও নয়

মিছিল চলছে শবাগারের দিকে। উইলহেম স্টোরিজের শবসহ মিছিল। স্ট্রেচারের ওপর শোয়ানো শবদেহ বইছে পুলিশের লোক। আগে আগে চলেছে আরও পুলিশ। যাক, রাগ শহর এবার তাহলে জানছে, উইলহেম অক্কা পেয়েছে এবং অবসান ঘটেছে আতঙ্কভরা একটি অধ্যায়ের।

মঁসিয়ে স্টেপার্কের ইচ্ছে, শহরের সর্বত্র ঘোরাবেন এবং প্রদর্শন করাবেন শবদেহকে। বুলেভার্ডে নিয়ে যাবেন, সব কটা প্রধান রাস্তায় নিয়ে যাবেন, সং চাইতে ঘিঞ্জি অঞ্চলে নিয়ে যাবেন, মিছিলের শেষ হবে টাউন হলে।

আমার মনে হল, এ-মিছিল রোডরিখ ভবনের সামনে দিয়ে না নিয়ে গেলেই বুঝি ভাল ছিল।

আমার পাশে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল আমার ভাইটি। রক্তমাখা শবদেহ দেখে সেকি হাহাকার তার। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও যদি পারত, জীবনদান করত ঐ মৃতদেহে।

দারুণ রকমের বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বিরত রইল জনতা। জ্যান্ত উইলহেম স্টোরিজকে পেলে ওরা ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করত। কিন্তু মৃত উইলহেমের লাশ নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, মঁসিয়ে স্টেপার্ক ভেবেছিলেন, দেখা গেল ওদেরও ইচ্ছে তাই। অর্থাৎ আর পাঁচ জনের মত মরার পর যেন তার সমাধি না হয়। তারা চায়, পাবলিক স্কোয়ারে পুড়িয়ে ছাই করা হোক উইলহেমকে। নয়তো শবদেহ নিক্ষেপ করা হোক ড্যানিউবে—ঢেউয়ের টানে লাশ গিয়ে পড়ুক বহু দূরের 'ব্ল্যাক-সী'তে।

প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে হট্টগোল চলল বাড়ার সামনে। তারপর নেমে এল নীরবতা।

ক্যাপ্টেন হারালান জানালেন উনি টাউন হল যাবেন। ওখানে গিয়ে উনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে ঐখানেই জেবা করা হয় হারম্যানকে। রাজী হলাম আমরা। উনি লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

আমি রইলাম ভায়ার পাশে। ঘন্টা কয়েক ছিলাম। নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন থেকেছে প্রতিটি মুহূর্ত!...কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না ওকে। ওর ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা বড়ই ভাবিয়ে তুলল আমাকে। বেশ বুঝলাম, আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে মার্ক—এমন একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করছে যা দুর্বারোগ্য। আমার কোনো কথাতেই কান নেই ওর। কথা কাটাকাটির মধ্যেও নেই। মাথায় শুধু একটা গোঁ · জবরদস্ত গোঁ...বেরিয়ে পড়া যাক, যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করা যাক মায়রাকে।

'তুমিও চল আমার সঙ্গে।' ওর শেষ বক্তব্য।

শুধু একটা ব্যাপারেই ওর মুখ খোলানো গিয়েছিল। তা'হল, ক্যাপ্টেন· হারালান ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সবুর করব। এ ব্যাপারে একমত মার্ক। কিন্তু বেলা চারটের আগে ফিরলেন না ক্যাপ্টেন। সঙ্গে এলেন বন্ধু। এসে যে খবর দিলেন, তার চাইতে খারাপ খবর আমরা আর আশা করিনি। হারম্যানকে জেরা করা হয়েছে বটে, কিন্তু বৃথাই। তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে কাহিল করেছেন ক্যাপ্টেন, মঁসিয়ে স্টেপার্ক এবং স্বয়ং গভর্ণর। ভয় দেখিয়েছেন, মিনতি করেছেন, এমন কি দয়া ভিক্ষাও করেছেন। বৃথাই তাকে বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। মুখ না খুললে চরমতম শাস্তির হুমকিও খামোকা দেওয়া হয়েছে। পেট থেকে তার কোনো কথাই বার করা যায়নি। একটা সেকেণ্ডের জন্যেও বক্তব্য পাল্টায়নি হারম্যান। মায়রা কোথায় সে জানে না। এমন কি তাকে যে গায়েব করা হয়েছে, তাও সে জানে না। মনিব ভদ্রলোক এ-ব্যাপারে ফন্দী-ফিকিরের বিন্দুবিসর্গ ভাঙেনি চাকরের কাছে।

ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা ধরে হিমসিম খাওয়ার পর, প্রশ্নকর্তারা হাতে-পাওয়' প্রমাণের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন! হারম্যানকে অবিশ্বাস করা যায় না। সে যা বলছে, তা সত্য। নির্জলা খাঁটি ওঁর অজ্ঞতা। সুতরাং এখন হতে অভাগী মায়রাকে ফিরে পাওয়ার আশা আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

কি বিষণ্নভাবেই শেষ হল সেই দিনটি! যে-যার চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম আমরা। অপরিসীম দুর্দৈব যেন শক্তিহীন করে দিয়ে গেল আমাদের। একটি কথাও বলতে পারলাম না—সময় কাটতে লাগল হু-হু করে। বলবই বা কি? শ'খানেকবার যা বলা হয়ে গেছে, তা ছাড়া আর বলারই ব আছে কি?

আটটার একটু আগে বাতি নিয়ে এল চাকর। ডক্টর রোডরিখ তখন স্ত্রীর কাছে বসে। কাছেই ড্রইংরুমে ছিলাম, আমি, ভায়া মার্ক আর দুই অফিসার। কাজ সেরে চাকরটি অন্তর্হিত হতেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল রাত আটটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল গ্যালারীর কপাট। নিশ্চয় বাগান থেকে আসা দমকা হাওয়ায় দুহাট হয়েছে দরজা। কারণ কাউকে তো চোখে পড়েনি। কিন্তু তার চাইতে আশ্চর্য কাণ্ড হল, ফের দরজার কপাট দুটো নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল··

আর তারপরেই—না, সে ঘটনা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না।—শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর। কর্কশ কণ্ঠস্বর নয়·· আরেক রাতে যে স্বর ঘৃণার স্তুতি গেয়ে অপমান করে গিয়েছিল আমাদের—এ গলা সে গলা নয়। ফুলের মত

টাটকা, খুশীতে টলমল স্বর—আমাদের প্রত্যেকের অতি প্রিয় স্বর…মাইডিয়ার মায়রার কণ্ঠস্বর…

'মার্ক,' বলল মায়রার স্বর। 'আর আপনি মঁসিয়ে হেনরী, হারালান তোমাকেও বলি, করছ কি এখানে? ডিনারের সময় হয়ে গেল যে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল আমার!'

মায়রা, মায়রাই বটে! জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মায়রা! সেরে উঠেছে মায়রা!…এ-গলা যে শুনবে, সেই বলবে নিজের ঘর ছেড়ে রোজকার মতই যেন বেরিয়ে এসেছে মায়রা। আমাদের সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না!… মায়রা অদৃশ্য! অদৃশ্য মায়রা!…

এত সরল কথার এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া বুঝি কখনো দেখা যায় নি। ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমরা যেন পেরেক-আঁটা হয়ে বসে রইলাম যে-যার চেয়ারে। নড়া তো দূরের কথা, মুখ দিয়ে আওয়াজ বার করার সাহসও হল না কারো। কণ্ঠস্বর যে দিকে শোনা গিয়েছে, সেদিকেও যেতে পারলাম না। অথচ মায়রা আছে সেখানে, জীবন্ত মায়রা, কথা যখন বলেছে তখন সে অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়·

কিন্তু ও এল কোত্থেকে?· গায়েব করে যে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে?·· সেই বাড়ী থেকেই কি সটকান দিয়ে, শহর পরিক্রমা করে, সে ফিরে এসেছে স্বগৃহে?· ·ফিরে এল, অথচ দরজা বন্ধই রইল—কেউ খুলতেও গেল না?

না—আসল ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে খুব দেরী হল না। মায়রা এসেছে ওর নিজের ঘর থেকেই—যে ঘরে উইলহেম স্টোরিজ তাকে অদৃশ্য করে ফেলে গিয়েছিল। আমরা যখন ভেবেছি বাড়ীর বাইরে পাচার হয়ে গেছে মায়রা, সে তখন বাড়ীর ভেতরেই ছিল, নিজের বিছানাতেই শুয়েছিল। ঝাড়া চব্বিশঘণ্টা নট্ নড়ন নট্ কিচ্ছু হয়ে থেকেছে বেচারা · নড়েনি, চড়েনি, শব্দ করেনি। জ্ঞান ফিরে পায় নি—টান টান হয়ে শুয়ে থেকেছে অসাড়ে—অথচ আমাদের কারোরই মাথায় ঢোকেনি যে সে বিছানায় আছে। তাছাড়া, এমন কথা ভাবতেই বা যাবে কেন কেউ?

সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিডন্যাপ করতে পারেনি উইলহেম। কিন্তু দুষ্কর্মের শেষ পর্যন্ত সে সমাধা করত। কিন্তু বাগড়া পড়ল আজ সকালে ক্যাপ্টেন হারালানের তরবারিতে, প্রাণবিয়োগ ঘটল তার।

সেই মায়রাই এখন এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। শুধু দাঁড়ায়নি পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়েছে। উইলহেম তাকে যে আরকটা গিলিয়েছিল, হয়ত

তার প্রতিক্রিয়াতেই সম্বিত ফিরে পেয়েছে মায়রা। উপাসনা মন্দিরের পর থেকে কি-কি ঘটেছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য একেবারেই অজ্ঞ মায়রা। সে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মাঝে, কথা বলছে, কিন্তু আধো অন্ধকারে বুঝতেও পারছে না—নিজের গা নিজেই এখন সে দেখতে পাবে না।

উঠে দাঁড়িয়েছে মার্ক, দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে তাকে বুকে টেনে নিতে—

মায়রা বলে চলেছে—'কি হয়েছে তোমাদের? কথা বলছি, জবাব দিচ্ছ না কেন? ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ভীষণ অবাক হচ্ছ আমাকে দেখে। হল কি?—মা কোথায়? শরীর খারাপ নাকি?—'

আবার খুলল কপাট। প্রবেশ করলেন ডক্টর রোডরিখ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ছিটকে গেল মায়রা—অন্ততঃ আমরা তাই ভাবলাম—কেননা পরক্ষণেই বলে উঠল পরম বিস্ময়ে—'বাবা, ও বাবা,—কি হয়েছে?—আমার দাদা, আমার স্বামী অমন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে কেন?'

চৌকাঠের ওপর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর। রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে বিদ্যুৎ চমকের মত।

মায়রা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওঁর কাছে। গণ্ড চুম্বন করে বারংবার শুধোচ্ছে, 'কি ব্যাপার? কোথায় মা? মা কোথায়?'

'মা ভালই আছে রে,' বললেন ডাক্তার। 'এখুনি আসবে নীচে। কিন্তু তোর যে এখন বিশ্রামের দরকার।'

এই সময়ে মায়রার একটা হাত ধরে ফেলল মার্ক। অতি সন্তর্পণে কাছে টেনে নিল তাকে। দেখে মনে হল যেন কোনো অন্ধকে কাছে টানছে। কিন্তু মায়রা তো অন্ধ নয়। আমরা তাকে দেখতে না পেলে কি হবে। মার্ক ওকে টেনে নিয়ে বসালো পাশের চেয়ারে···

ঘূর্ণির মত একটি চিন্তাই কেবল আবর্ত রচনা করে চলল মাথার মধ্যে—মায়রাকে দৃশ্যমান করে তোলার ক্ষমতা ছিল শুধু একজনেরই। গুপ্ত ক্ষমতা সঙ্গে নিয়েই বিদায় নিয়েছে সে চিরতরে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মুঠোর বাইরে চলে যায় যে পরিস্থিতি, তার পরিণাম কি সুখের হয়? বর্তমান পরিস্থিতির শেষেও কি সুখ আছে? বিশ্বাস করা মুশকিল। মায়রা যে ইহ জন্মের মত দৃশ্যমান জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি, এমন কথাও কি কেউ বুক ঠুকে বলতে পারে? কাজেই মায়রাকে ফিরে পাওয়ার তীব্র আনন্দের মাঝেও নিঃসীম নৈরাশ্যে ফাঁকা হয়ে রইল মনটা। এত রূপ, এত লাবণ্য নিয়ে ওকে চোখের জগতে দেখা যাবে না।

শহরের রাস্তায় পায়ে হাঁটা বন্ধ করে দিয়েছিল মায়রা। বন্ধ গাড়িছাড়া পথে বেরুতো না। সঙ্গে থাকত ফ্যামিলির কেউ না কেউ। সব চাইতে পছন্দ করত প্রিয়জনদের নিয়ে বাগানে বসে থাকতে। নৈতিক দিক দিয়ে প্রিয়জনদের কাছে অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছিল মায়রা।

ইতিমধ্যে মঁসিয়ে স্টেপার্ক, গুন্তর এবং আমি সমানে প্রশ্নে প্রশ্নে নাজেহাল করে চলেছি বদ্ধ হারম্যানকে। প্রশ্নেরও শেষ নেই, পণ্ডশ্রমেরও শেষ নেই। কি করে যে এই বিষম পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায়, সেই সম্পর্কিত একটা শব্দও বার করা গেল না লোকটার পেট থেকে।

হারম্যান যে অন্তর থেকেই কথা বলছে, মায়রার কিডন্যাপিং প্রহসন থেকেই তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু মৃত মনিব কি তার গুপ্ত রহস্যের কিছুই রেখে যায়নি তার কাছে? অটো স্টোরিজের ফরমূলাটিও কি নেই ওর হেফাজতে?

পাতালঘর আবিষ্কার করার পর আমি আর মঁসিয়ে স্টেপার্ক যে চরম হঠকারিতা দেখিয়েছি, তার জন্যে পরিতাপের আর সীমা-পরিসীমা নেই! হারম্যানের ক্ষেত্রে যা করেছিলাম, মায়রার ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটত যদি না রাগ করে সব চুরমার করে না বসতাম। একটা শিশি, রহস্যজনক আরকভরা শুধু একটা শিশি পেলেই—শূন্যে বিলীন হত আমাদের দুঃখ-দুর্দশা বিষাদের মেঘ।

অনিচ্ছাকৃত এই যে একটা অপরাধ করে বসলেন মঁসিয়ে স্টেপার্ক, যে আমিও তাঁর জুড়িদার—তার জন্যে দুজনের কেউই গর্বিত নয়। মনে মনে দুজনেই যেন একটা চুক্তি সই করে ফেলেছিলাম। এ-বিষয় নিয়ে ভুলেও কেউ কথা বলতাম না।

দুজনেই অবশ্য বরাত মন্দ হারম্যানকে সহস্র পন্থায় নিপীড়ন করে চলেছিলাম। উদ্দেশ্য একটাই। একদিন না একদিন পেট থেকে গুপ্ত রহস্য

উদ্ধার করবই। আশাটা নেহাৎই কাল্পনিক। কেননা, গুপ্ত রহস্য হারম্যানের কাছে যে নেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাকরের কাছে কেউ অতি প্রাকৃত কেমেষ্ট্রির গুহ্যতত্ত্ব ব্যক্ত করে? বিশেষ করে যে চাকরের সামান্যতম শিক্ষা নেই। ব্যক্ত করা হলেও হারম্যান তার মাথামুণ্ডু বুঝত কি?

শেষে এমন একটা দিন এল যেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম যে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। পণ্ডশ্রমই সার, হারম্যানের পেটে গুপ্ত রহস্য জমা থকলে তবে তো তাকে অপরাধী সাবাস্ত করব এবং কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো। তা যখন সম্ভব নয়, তখন তাকে মানে মানে খালাস করে দেওয়াই মঙ্গল।

কিন্তু খালাস হওয়া কপালে লেখা নেই বেচারা হারম্যানের। যেদিন তার শ্রীঘরের বাইরে যাওয়ার কথা, সেদিন কারাধ্যক্ষ মশায় সকালবেলা এলেন তাকে মুক্তি দিতে। কি দেখলেন? না কয়েদ-ঘরে মরে পড়ে রয়েছে হারম্যান। ময়না তদন্তে পরে প্রকাশ পেয়েছিল শিরার মধ্যে রক্তের চাপ অকস্মাৎ দলা পাকিয়ে যাওয়ায় ইহলীলা ত্যাগ করেছে হারম্যান।

কাজেই আমার শেষ আশাটুকুও খতম হল। উইলহেম স্টোবিজের গুপ্ত রহস্য যে চিরকালের মত গুপ্ত রয়ে গেল আমাদের কাছে, তাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল অবশেষে।

বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ী থেকে কাগজপত্র যা কিছু বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়েছিল টাউন হলে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে-সবের মধ্যে থেকে কাজের কিছু পাওয়া গেল না। ফরমূলা যা পাওয়া গেল, তা ধোঁয়াটে। রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত টীকাগুলো তো একেবারেই দুর্বোধ্য।

সুতরাং যে তিমিরে ছিলাম, রইলাম সেই তিমিরেই। ফরমূলা আর বৈজ্ঞানিক টীকাটিপ্পনীর গোলকধাঁধা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হল না। পৈশাচিক যে বস্তুর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে উইলহেম স্টোবিজ দুষ্কর্মের পর দুষ্কর্ম করে চলেছে, নতুন করে তা বানানোর সূত্রও পাওয়া গেল না।

হারালানের তরোয়াল বুকে বেঁধার পর শূন্য হতে যেমন আবির্ভূত হয়েছিল উইলহেম, অভাগী মায়রাকেও তেমনিভাবে আবির্ভূত হতে দেখা যাবে তার মৃত্যুশয্যায়—তার আগে নয়—কখনো নয়।

২০শে জুন সকালে আমাকে খুঁজতে এল ভায়া। দেখলাম, আগের চাইতে সে অনেক প্রশান্ত।

বলল—হেনরী,

আমার সুযুক্তি আর প্রেমের খানিকটা হল আমার স্ত্রী। আমাদের

বিয়েতে ধর্মীয় অনুশাসনের ফাঁকটা এখনো রয়ে গেছে। শাস্ত্রীয় বচন আওড়ানো হয়নি এখনো। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চাই আমি—চাই মায়রার মুখ চেয়ে, ওর পরিবারের সকলের মুখ চেয়ে।'

ভাইয়ের হাত ধরে আমি বললাম—'বুঝেছি কি বলতে চাস। তোর এই সাধ পূর্ণ হওয়ার পথে কোনো বাধা আছে বলে তো মনে হয় না আমার—'

'পুরুৎমশায় মায়রাকে দেখতে না পেলেও ওর কথা তো শুনতে পাবেন। আমার তো মনে হয় না গির্জের কর্তারা ফ্যাকড়া তুলবেন এতে—'

'নারে মার্ক, না। ব্যবস্থা যা করবার, আমি করব।'

প্রথমেই ধর্না দিলাম উপাসনা মন্দিরের পুরুৎমশায়ের কাছে। তারপর ধরলাম বড় পুরুৎকে। ইনিই সেদিনকার অনুষ্ঠানে পুরুৎগিরি করেছিলেন এবং এঁর সামনেই অভাবনীয় কীর্তির ফলে আসর ভেঙে গিয়েছিল। সৌম্য মূর্তি বৃদ্ধ জানালেন, এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। রাগ-শহরের আর্চবিশপ অনুকূলে রায় দিয়েছেন। অদৃশ্য হোক না কেন, কনে তো জীবিত, সুতরাং বিয়ের মন্ত্র পড়তে বাধা নেই।

বিয়ের বার্তা আগেই ছেপে বেরিয়ে গিয়েছিল গির্জেতে; সুতরাং শুভকাজের তারিখটা দোসরা জুলাইতে ফেলতে আর বাধা রইল না।

প্রথমবারের মত এবারেও সাধু মাইকেলের উপাসনা-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বিবাহ-পর্ব।

ক্যাথিড্র্যালের ঘেরাও করা জায়গায় বসে আছে ওরা যুগলে। মায়রার চেয়ার যেন খালি। তা সত্ত্বেও কিন্তু চেয়ারেই আসীন রয়েছে মায়রা।

মায়রার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মার্ক। চোখে না দেখতে পেলেও মায়রার উপস্থিতি টের পাচ্ছিল মার্ক। দেবীর পাশে ওর উপস্থিতি লোকের সামনে জাহির করার জন্যেই যেন মায়রার হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল মার্ক।

সহযোগী সাগরেদকে নিয়ে হাজির হলেন বড় পুরুৎমশায়। শুরু হল বন্দনা-গীতি—সেই সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান। বেদীমূলে দেখা গেল মায়রার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মার্ক। বেদীর প্রথম ধাপ থেকে ফের হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। যাজকের ভিক্ষার থলিতে ঝনঝন করে টাকা ফেলছে মায়রা।

মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম শেষ। বৃদ্ধ পুরুৎ ফিরে দাঁড়ালেন জনসমাবেশের দিকে। শুধোলেন—'মায়রা রোডরিখ, হাজির আছো ?'

'আছি,' জবাব দিল মায়রা।

পুরুৎঠাকুর এবার ফিরলেন মার্কের দিকে।

'মার্ক ভাইডাল, মায়রা রোডরিখ হাজির এখানে। তুমি তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে রাজী আছো?'

'আছি,' জবাব দিল আমার ভায়া।

'মায়রা বোডরিখ, মার্ক ভাইডাল হাজির এখানে। তুমি তাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে রাজী আছো?'

'আছি,' যে-স্বরে জবাব দিল মায়রা, তা পৌছালো উপস্থিত প্রত্যেকের কানে।

'মার্ক ভাইডাল, মায়রা বোডরিখ,' বললেন বড় পুরুৎ-ঠাকুর—'শুভ বিবাহের পবিত্র বিধি অনুযায়ী আজ থেকে তোমরা মিলিত হলে স্বামী-স্ত্রীরূপে।'

শেষ হল বিয়ে। নবদম্পতি যে-পথ দিয়ে যাবে, জনতা তাড়াতাড়ি গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়ালো তার দু'পাশে। এ-রকম পরিস্থিতিতে যে রকম হট্টগোল চেঁচামেচি শোনা যায়, এক্ষেত্রে তার তিলমাত্র শোনা গেল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই সারসপাখীর মত গলা বাড়িয়ে অবাস্তব কি যেন দেখবার চেষ্টায় উদগ্রীব হল। কেউ কারো জায়গা ছাড়ল না—সামনে যেতেও ব্যগ্র হল না। কৌতূহলে ফেটে পড়লেও সবারই মনের কোণে দেখা গেল রহস্যজনক আতঙ্ক।

অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভরপুর দু'সারি লোকের মাঝ দিয়ে স্বামী স্ত্রী বন্ধুবান্ধব সাক্ষীদের নিয়ে গেল রেজিস্টারে সই করতে। মার্ক ভাইডালের নামের পাশে লেখা হল আর একটি নাম—মায়রা রোডরিখ, নামটা লেখা হল যে-হাতে, তা কারও চোখে পড়ল না—কোনদিনই আর পড়বে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের পর কয়েক সপ্তাহ ছিলাম রাগ-শহরে।

এল জানুয়ারী মাস। মাসের প্রথম দিকে এই নিয়ে একশ'বার স্মৃতিপটে ফিরিয়ে আনলাম সেই ভয়ানক দৃশ্য—যে দৃশ্যের অন্তে মৃত্যু গ্রাস করেছিল উইলহেম স্টোরিজকে। তখনই একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। আইডিয়াটা এতই সরল, সহজ এবং সুস্পষ্ট যে আগে কেন মাথায় আসেনি ভেবে বিস্মিত হলাম। যুক্তি বুদ্ধির প্রতি আমার এই অন্ধতার জন্যে অবশ্যই

আমি তিরস্কারের পাত্র। কি আশ্চর্য! বিয়োগান্তক এই কাহিনীর হু'দুটো বিচিত্র ঘটনাকে একসূত্রে গাঁথার ভাবনা আগে কেন মাথায় আসেনি বুঝলাম না।

সেইদিনই বুঝলাম, মৃত্যুর পথে পা বাড়াতেই কেন আমাদের পরম শত্রু অদৃশ্যত্ব হারিয়েছিল; কারণ, আর কিছুই নয়—হারালানের তরবারি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত পথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য করণের আরকও বেরিয়ে গিয়েছে। রক্তের সঙ্গে মিশেছিল আরক, বেরিয়ে গিয়েছে শরীর থেকে—ফলে দৃশ্যমান হয়েছে উইলহেম।

তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত আপনা থেকেই মাথায় এসে গেল। হারালানের তরোয়াল যা করেছে, শল্য-চিকিৎসকের ছুরিতেও তা হতে পারে। বেশী কিছু তো নয়—একটা অপারেশনের দরকার। সহজ অপারেশন। দরকার হলে তা ফের করা যেতে পারে। খানিকটা রক্ত মায়রার শরীর থেকে বার করে দিতে হবে। নতুন রক্ত এক সময়ে ঘাটতি পূরণ করে নেবে। বার কয়েক রক্ত বার করার পর এমন একদিন আসবে যেদিন মায়রার রক্তপ্রবাহে অভিশপ্ত আরকের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। মার্ক তাকে ফের দেখতে পাবে।

তৎক্ষণাৎ এই প্রসঙ্গ ভায়াকে লিখে জানাবো বলে মনস্থির করলাম। চিঠি যখন পাঠাতে যাচ্ছি, ঠিক তখনি ভায়ার তরফ থেকে একটা চিঠি পৌছালো আমার হাতে। পড়ার পর ঠিক করলাম, আমার চিঠি একটু দেরীতে পাঠালেও চলবে। তার চিঠিতে যে-প্রসঙ্গ লেখা হয়েছে, তা জানার পর অন্ততঃ সেই মুহূর্তের জন্যে মনে হল আমার প্রস্তাব নেহাৎই নিরর্থক। মায়রা মা হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এক ফোঁটা রক্ত নষ্ট করাও সমীচীন নয়। সন্তান প্রসবের কষ্ট সওয়ার জন্যে এখন থেকেই তার সর্বশক্তি সঞ্চয় করা দরকার।

ভাইপো ভাইঝির জন্মের সময় নির্ধারিত হয়েছিল মে মাসের শেষাশেষি। পাঠক যখন জেনেই ফেলেছেন ভায়ার প্রতি আমার স্নেহের দুর্বলতা, তখন আর না বললেও চলবে যে সন্তান প্রসবের সময়ে আমিও হাজির থাকবো। ১৫ই মে হাজির হলাম রাগ-শহরে। যে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রসব মুহূর্তর প্রতীক্ষায় রইলাম, ভাবী পিতার চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়।

ঘটনাটা ঘটল ২৭শে মে। তারিখটা কোনোদিন মুছবে না স্মৃতি থেকে! দৈব ঘটনা নাকি আজকাল আর ঘটে না। কিন্তু সেদিন যা ঘটল, তা দৈব ঘটনা—এমনই অত্যাশ্চয দৈব ঘটনা যার চাক্ষুষ সাক্ষী আমি স্বয়ং।

সত্যিই সে ঘটনা দৈব ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার বিদ্যেবুদ্ধি

দিয়ে আমি যা পেতে চাইছিলাম, প্রকৃতি নিজেই তা এনে দিলেন আমাদের সামনে। ল্যাজারাসের মত যেন সমাধি ফুঁড়ে উঠে এল মায়রা। হতভম্ব মার্ক, আনন্দে পাগল মার্ক, বিস্ফারিত চক্ষু মার্ক দেখল কিভাবে ধীরে ধীরে যেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হচ্ছে মায়রা। চোখের সামনে দেখল দু'টি জন্ম—সন্তানের এবং স্ত্রীর। দীর্ঘদিন চোখের সামনে অদৃশ্য থাকার দরুণ স্ত্রীকে মনে হল আরো বেশী সুন্দর।

শেষ